আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-২

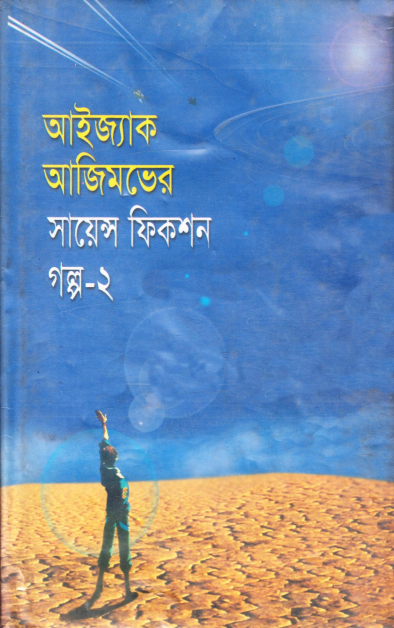

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-২

মূল

আইজ্যাক আজিমভ

সঙ্কলন সম্পাদনা

হাসান খুরশীদ রুমী

ভূমিকা

একুশে বইমেলা ২০০২-এ ঐতিহ্য থেকে "আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-১" প্রকাশ হওয়ার পর পাঠকদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল একে একে আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-২, ৩, ৪ প্রকাশ করে যাব। কিন্তু মেলাতে সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের দীর্ঘ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন থেকে নিয়মিত আজিমভের সকল সায়েন্স ফিকশন গল্প সিরিজ আকারে প্রকাশ হতে থাকবে।

গত বছর যখন "আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-১" প্রকাশ হয় তখন বইটির সম্পাদক হিসেবে আমাকে এবং প্রকাশক হিসেবে মোঃ আরিফুর রহমান নাইমকে পাঠকদের একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। "আসিমভ"-এর নাম "আজিমভ" হল কেন ? এ প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক। এতদিন আমরা তার নামের বাংলা উচ্চারণ লিখতাম "আসিমভ" অর্থাৎ "স" দিয়ে। হঠাৎ করে "স"-র জায়গায় "জ" হল কেন ? এর জবাব আমরা সরাসরি আজিমভের কাছেই শুনি :

'রাশান ভাষায় আমার শেষ নামটি উচ্চারণ হয় ইংরেজি "জেড"-এর মতো। কিন্তু এলিস আইল্যান্ডে নামের উচ্চারণ বিকৃত হয়ে "জেড"-এর জায়গায় "এস" বসেছে অর্থাৎ "আসিমভ" হয়েছে। তবে "এস"-এর উচ্চারণ হচ্ছে "জেড"-এর মতো।

'ব্যাপারটা যখন এমন চলছিল তখন আমায় বন্ধু লেরি'শ একদিন আমাকে ডেকে বললেন, "আপনি এ বিষয়টা নিয়ে একটা সায়েন্স ফিকশন লিখছেন না কেন, যার শিরোনাম হবে—'Spell my Name with an S'। তারপর আমি তাঁর দেওয়া শিরোনামেএকটি সায়েন্স ফিকশন লিখে ফেলি।"

পাঠক "Spell my name with an S" গল্পটি এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধন্যবাদ।

২৭.১.২০০৩
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

হাসান খুরশীদ রুমী

সূচিপত্র

হাফ-ব্লীড-৯
গুডবাই আর্থ-৩৫
লেট'স নট-৪২
এ লয়েন্ট অব প'-৪৬
টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এন্ড থার্টি এ. ডি.-৪৮
দ্য উইননাউইং-৫৯
স্পেল মাই নেম উইথ "এস"-৭০
দ্য ইম্‌মোর্টাল বার্ড-৮২
ফ্রানশাইজ-৮৬
দ্য সিক্রেট সেন্স-১০৭
ড্রিমওয়ার্ল্ড-১১৬
ইট'স সাচ আ বিউটিফুল ডে-১১৮
দ্য উইপন টু ড্রেডফুল টু ইউজ-১৩৫
আ পারফেক্ট ফিট-১৫৪
ব্যাটল হাইম্‌-১৬৪
ডেথ অব এ ফয়-১৬৯
হোয়াট ইফ-১৭২
ট্রেন্ডস-১৮২
দ্য গ্রেটেস্ট এসেট-১৯৭
দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট প্যাসেশন-২০৭
হোয়াট ইজ দিস থিং কলড লাভ ?-২২৫
ফাউন্ডিং ফাদার-২৩৬

হাফ-ব্রীড

ভ্রূর ঘাম মুছে লম্বা একটা শ্বাস টানলেন জেফারসন স্ক্যানলন। কাঁপা কাঁপা হাতে সুইচটা টিপতে গেলেন তিনি, তারপর কী ভেবে আবার মত পরিবর্তন করলেন। তিন মাসেরও বেশির কঠোর শ্রমের ফসল তাঁর এই লেটেস্ট মডেল, তাঁর শেষ আশা। তাঁর ধার করা পনেরো হাজার ডলারের প্রায় সবটুকুই ব্যয় হয়ে গেছে এটার পেছনে। এখন এই সুইচ টিপলেই বোঝা যাবে, এত কাঠখড় পোড়ানর পর তিনি জয়ী হয়েছেন নাকি পরাজিত।

কাপুরুষতার জন্যে মনে মনে নিজেকে গালি দিলেন স্ক্যানলন, তারপর দ্রুত হাতে টিপে দিলেন সুইচটা। কিছুই ঘটল না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল তাঁর, কিন্তু আলোর কোনো ঝিলিকই ধরা পড়ল না দৃষ্টিতে। হিংস্রভাবে সুইচটা অফ করে দিলেন তিনি। আবার ব্যর্থ হল মেশিনটা।

ঘুরতে থাকা মাথাটা দু'হাতে ঢেকে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, 'হায় ঈশ্বর! এটা কাজ করা উচিত। আমার অঙ্ক ঠিক আছে, ফিল্ডও তৈরি করেছি যথাযথ। বিজ্ঞানের প্রতিটি সূত্র অনুসারে ওই ফিল্ডগুলোর পরমাণুকে ভেঙে ফেলার কথা।' উঠে পড়ে, মেঝের ওপর পায়চারি করতে লাগলেন তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে।

তাঁর থিয়োরি ঠিক আছে। তাঁর যন্ত্রপাতিও ইক্যুয়েশন অনুসারে তৈরি করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। যদি তাঁর থিয়োরি নির্ভুল হয়, তাহলে ভুল রয়েছে নিশ্চয় যন্ত্রপাতিতে। কিন্তু যন্ত্রপাতি ঠিক আছে, তাহলে থিয়োরিতে নিশ্চিয়...'না, একটু বাইরে না গেলে আমি পাগল হয়ে যাব,' ঘরের চার দেয়ালের উদ্দেশেই যেন বললেন তিনি কথাগুলো।

দরজার পেছনে ঝোলান হ্যাট আর কোটটা হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিয়ে দড়াম করে বন্ধ করলেন তিনি দরজাটা, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ঝড়ের গতিতে।

পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক শক্তি! পারমাণবিক শক্তি!

শব্দ দু'টো তাঁর মগজ কুরে খেতে লাগল একঘেয়ে এক সঙ্গীতের মতো আর এই সঙ্গীত ধ্বংসের সঙ্গীত! এটা তাঁর মনে আশা জাগিয়ে ডেকে এনেছে ধ্বংসের পথে। আশার এই হাতছানিতে এম. আই. টি.-র নিরাপদ অধ্যাপনাটা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। এই আশায় আশায় থেকেই মাত্র তিরিশ বছরেই তিনি পরিণত হয়েছেন মাঝবয়েসী এক মানুষে—আর, যৌবনের প্রথম ভাগটা তো কাটল কেবল ব্যর্থতা আর ব্যর্থতায়।

এখন অবশিষ্ট টাকা ক'টাও খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। টাকার প্রতি টান যদি সব অনর্থের মূল হয়ে থাকে, তাহলে টাকার অভাব অবশ্যই সব হতাশার মূল। এই ভাবনাটা মাথায় আসতে মৃদু একটা হাসি ফুটল স্ক্যানলনের মুখে।

সম্ভাবনার কত দুয়ারই না খুলেছিল তাঁর সামনে। থিয়োরি আর প্র্যাকটিসের ফাঁকটুকু জুড়ে দিতে পারলে সারা পৃথিবী আসত তাঁর হাতের মুঠোয়, এমনকি মঙ্গলসহ অন্যান্য গ্রহগুলোও। অঙ্কের ভুলটা কেবল বের করতে হত তাঁর—না, তিনি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, ভুল থাকলে তা রয়েছে যন্ত্রপাতিতে। যদিও—সশব্দে আরেক বার গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

তাঁর বিষণ্ণ চিন্তার রাশি ছিন্ন হয়ে গেল কিছু বালকের চিৎকারে। ভ্রূ কুঁচকে গেল স্ক্যানলনের, বিশেষ করে বিপর্যয়ের সময়ে গোলমাল তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়।

চিৎকার আরো বাড়তে ভেসে এল টুকরো কিছু কথা, 'জনি, ধর ব্যাটাকে!' 'দৌড়ানোর সাইজ দেখ, হি হি হি।'

দু'শ গজ মতো দূরের বড় একটা বিল্ডিংয়ের পেছন থেকে জনা বারো ছেলে বেরিয়ে, ছুটে আসতে লাগল স্ক্যানলনের দিকেই।

খানিকটা অবাক হয়ে তাদের দেখতে লাগলেন স্ক্যানলন। বালকসুলভ নিষ্ঠুর আনন্দে কি যেন একটাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে তারা। আলো কমে

আসায় তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করতে দেখলেন, হঠাৎ একজন দল থেকে আলাদা হয়ে দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে।

হাত থেকে স্ক্যানলনের পাইপটা প্রায় পড়ে যাবার জোগাড়, কারণ, ছেলেগুলো ধাওয়া করে আসছে একটা টুইনিকে—পৃথিবী আর মঙ্গলের একটা দো-আঁশলাকে। ভুলের কোনো অবকাশ নেই, ওই তো মাথার চারপাশে ধপ্‌ধপে শাদা চুলগুলো তার খাড়া হয়ে আছে শজারুর কাঁটার মতো। অবাক হয়ে স্ক্যানলন ভাবলেন, টুইনিটা অ্যাসাইলাম থেকে বাইরে এল কীভাবে?

ছেলেগুলো আবার ধরে ফেলেছে টুইনিটাকে। তাদের উল্লসিত চিৎকারে চমকে উঠলেন স্ক্যানলন। একটা অসহায় প্রাণীর এই অবস্থা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা সম্ভব নয়, ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে গেলেন তিনি ছেলেগুলোর দিকে।

'ভাগ, শয়তানের দল, দূর হ! তাছাড়া তোদের আমি —' তাঁর লাথি আছড়ে পড়ল সামনের ছেলেটার পাছায়, তারপর দুই ঘুসি খেয়ে টলতে লাগল আরো দুইজন।

নতুন এক শক্তির আগমনে সম্পূর্ণ পাল্টে গেল পরিস্থিতি। মিলিতভাবে ছেলেগুলো বেশি শক্তিশালী হলেও বড়দের প্রতি তাদের মনে রয়েছে সহজাত এক ভয়। ফলে পালিয়ে গেল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে, কেবল টুইনিটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাকিয়ে রইল তার রক্ষাকর্তার দিকে, দৃষ্টিতে মিশে রয়েছে ভয় আর সন্দেহ।

'আঘাত পেয়েছ?' জানতে চাইলেন স্ক্যানলন।

'না, স্যার।' দুলতে লাগল টুইনির চুলগুলো। 'পায়ের গোড়ালিটা বোধ হয় একটু মচকে গেছে, তবে হাঁটতে পারব। আমি যাই। সাহায্য করার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'থামো।' নরম স্বরে বললেন স্ক্যানলন। তিনি লক্ষ করেছেন, প্রায় পূর্ণবয়স্ক হলেও টুইনিটা খুবই হালকা-পাতলা, পরনের পোশাকগুলো একরকম ন্যাকড়া হয়ে গেছে, চোখে-মুখের বেদনার্ত ভাব দেখলে হৃদয়টা মোচড় দিয়ে ওঠে।

'শোনো,' টুইনিটা তাঁর দিকে ঘুরতে বললেন তিনি আবার, 'তোমার খিদে পেয়েছে?'

কাঁপতে লাগল টুইনির মুখটা, যেন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে সে। শেষমেষ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ—একটু।'

'তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমার বাড়ি চল,' আঙ্গুল নির্দেশ করলেন তিনি কাঁধের ওপর দিয়ে। 'তোমার কিছু খাওয়া দরকার। গোসল করে নতুন কাপড় পরলে তোমার চেহারার এই ভাবও আর থাকবে না।' পথ দেখিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি।

বাড়ির সদর দরজা খুলে হলঘরে ঢোকার আগ পর্যন্ত আর কোনো কথা বললেন না স্ক্যানলন। 'আগে গোসল করে নাও। ওই যে বাথরুম। বিউলা তোমাকে দেখার আগেই চট করে ওটার ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দাও দরজা।'

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পেছনে একটা শ্বাস টানার শব্দে ঘুরলেন স্ক্যানলন পাঁই করে, টুইনিটা লুকাবার চেষ্টা করল একটা হ্যাট-র‍্যাকের আড়ালে।

বিউলা, স্ক্যানলনের হাউজকিপার, ছুটে আসছে এদিকে। বেঁটে, মোটাসোটা শরীরটা গলদঘর্ম, ঘৃণায় থমথমে গোলগাল মুখ।

'জেফারসন স্ক্যানলন! জোফারসন!' জ্বলন্ত চোখে সে তাকাল টুইনিটার দিকে। 'এ রকম একটা জিনিসকে তুমি বাড়িতে নিয়ে এলে কীভাবে? বুদ্ধি বিবেচনা সবই কি গুলিয়ে গেছে তোমার?'

ভয়ে কুঁকড়ে গেল টুইনিটা, কিন্তু ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন স্ক্যানলন। 'বিউলা, শান্ত হও। তুমি তো এরকম করো না। বেচারি খিদেয় অস্থির, মার খেয়েছে একদল ছেলের হাতে, আর তাকে দেখে কোনো মায়া হচ্ছে না তোমার। না, বিউলা, তোমার আচরণে আমি একেবারেই হতাশ।'

'হতাশ!' নাক সিটকাল হাউসকিপার, যদিও মনটা নরম হয়েছে তার। 'এই বিশ্রী জিনিসটার জন্যে? এই ভূতের বাচ্চাগুলোকে যেখানে রাখা হয়, এদের সেখানেই থাকা উচিত।'

'বেশ, এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে। এই ছেলে, তুমি গোসল সেরে নাও তো। আর, বিউলা, তুমি দেখ, আমার পুরনো কাপড়-চোপড় কিছু পাও কি না।'

শেষ একটা কড়া দৃষ্টি হেনে, থপথপ করে চলে গেল বিউলা

'ওর কথায় কিছু মনে করো না, ছেলে,' সে চলে যাবার পর বললেন

স্ক্যানলন। 'একসময় সে আমার নার্স ছিল তো, তাই এখনো সুযোগ পেলে খবরদারি করতে ছাড়ে না। ও কোনো ক্ষতি করবে না তোমার। যাও, গোসলটা সেরে নাও।'

গোসল করার পর ডাইনং-রুমে এসে বসতে একেবারে অন্যরকম মনে হল টুইনিটাকে। শরীরের সমস্ত নোংরা দূর হয়ে যাওয়ায় পাতলা মুখটায় যেন এখন ভর করেছে সৌন্দর্য, উঁচু কপালে বুদ্ধির দীপ্তি। ভেজা সত্ত্বেও তার ফুটখানেক লম্বা চুলগুলো এখনো খাড়া হয়ে আছে শজারুর কাঁটার মতো, তবে চুলের ওই উজ্জ্বল শাদা রঙ যেন তার চেহারায় যোগ করেছে বাড়তি এক মর্যাদা। স্ক্যানলন ভাবলেন, কুৎসিত কিছুই আর নেই ছেলেটার মধ্যে।

'তুমি কোল্ড চিকেন পছন্দ করো?' জানতে চাইলেন স্ক্যানলন।

'হ্যাঁ, খুব,' খুশি ছড়িয়ে পড়ল ছেলেটার গলায়।

'তাহলে শুরু করে দাও। ওটা শেষ করার পর আরো নিতে পার। টেবিলে যা কিছু আছে সবই তোমার।'

খেতে খেতে চোখ চকচক করে উঠল টুইনিটার, কয়েক মিনিটের মধ্যে টেবিল শূন্য হয়ে গেল।'

'এবার আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও,' খাবারের পালা শেষ হতে বললেন স্ক্যানলন। 'তোমার নাম কি?'

'তারা আমাকে ম্যাক্স বলে ডাকে।'

'তোমার পুরো নাম কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল টুইনি। 'তারা তো আমার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না— যখন বলে, ম্যাক্স ছাড়া আর কোনো নামে তো কখনোই ডাকেনি। একজন দো-আঁশলার নামের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আমার।' গলায় তিক্ততা ঝরে পড়ল ওর।

'কিন্তু যেখানে তোমার থাকার কথা, সেখানে না থেকে বাইরে এসে অমন দৌড়াদৌড়ি করছিলে কেন?'

'আমি একটা অ্যাসাইলামে ছিলাম, যার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। পৃথিবীর বাইরের কোনো জায়গা আমি দেখিনি, কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকাও নিশ্চয় অ্যাসাইলামে থাকার চেয়ে ভালো। বিশেষ করে, টম মারা যাবার পর।'

'টম কে, ম্যাক্স ?' নরম সুরে বললেন স্ক্যানলন।

'ওই একজনই মাত্র ছিল আমার মতো। মাত্র পনেরো বছর বয়সে মারা গেল সে।' মাথা তুলল ম্যাক্স, রাগে দু'চোখ জ্বলছে তার। 'তারা টমকে হত্যা করেছে, মিস্টার স্ক্যানলন। এত কম বয়েস ছিল ওর, এত বন্ধুভাবাপন্ন। আমার মতোও একা থাকতে পারত না। সবসময় হাসি-আনন্দে মেতে থাকতে চাইত টম, কিন্তু একমাত্র আমিই সঙ্গ দিতাম ওকে। দো-আঁশলা বলে কেউ ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না। তাই ও মারা যাবার পর আমারো আর সহ্য হল না ওই জায়গা। পালিয়ে এলাম।'

'পালিয়ে আসা তোমার উচিত হয়নি, ম্যাক্স। তুমি তো অন্যান্যদের মতো নও, তাই তারা তোমাকে ঠিক বুঝতে পারে না। তারা তোমার জন্যে কিছু তো অবশ্যই করেছে। তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, কিছুটা পড়াশোনা করেছ তুমি।'

'আমি ক্লাসে যেতে পারি,' বিষন্ন মনে স্বীকার করল ম্যাক্স। 'কিন্তু সবার থেকে আলাদা হয়ে আমাকে বসে থাকতে হয় এককোণে। অবশ্য পড়ার সুযোগ দেয়ায় তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'এই তো বুঝতে পেরেছ, ম্যাক্স। তাহলে খুব খারাপ তুমি নেই, তাই না ?'

মাথা তুলে ম্যাক্স তাকাল সন্দেহের চোখে। 'আপনি নিশ্চয় আমাকে ফেরত পাঠাবেন না ?' খানিকটা উঠে পড়ল ও, যেন এই মুহূর্তে পালাবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কাশলেন স্ক্যানলন অস্বস্তির সঙ্গে। 'অবশ্য যেতে না চাইলে আমি তোমাকে জোর করব না। কিন্তু যাওয়াটাই তোমার জন্যে সবচেয়ে ভালো হবে।'

'না, ভালো হবে না!' ভীষণ প্রতিবাদ করল ম্যাক্স।

'বেশ, তুমি যা মনে করো। যাক গে, এখন তোমার শুয়ে পড়া উচিত। তোমার ঘুম দরকার। কাল সকালে কথা হবে।'

এখনো সন্দেহের দোলায় দোলা টুইনিটাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা বেডরুম দেখিয়ে দিলেন স্ক্যানলন। 'আজ রাতের মতো এখানেই থাক। আমি তোমার পাশে ঘরেই শোবো, কোনো দরকার হলে ডাকবে

আমাকে।' যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে, আবার কি ভেবে ঘুরলেন তিনি। 'রাতে পালাবার চেষ্টা করবে না।'

'না, না। কথা দিলাম।'

চিন্তামগ্ন স্ক্যানলন এলেন তাঁর স্টাডিতে, স্বল্প আলোর একটা বাতি জ্বালিয়ে বসলেন পুরনো একটা আর্মচেয়ারে। পুরো দশ মিনিট একদম স্থির হয়ে রইলেন তিনি, আর ছ'বছরের মধ্যে এই প্রথম পারমাণবিক শক্তির স্বপ্ন দেখা ছাড়া মাথা ঘামালেন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। দরজায় টোকা দিয়ে, তার অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকল বিউলা। ভ্রূ কুঁচকে আছে তার, ঠোঁট বাঁকান।

'ওহ্, জেফারসন! তুমি এরকম একটা কাজ করবে, আমি ভাবতেও পারছি না! তোমার বেহেস্তবাসিনী মা জানতে পারলে...'

'বসো, বিউলা,' আরেকটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন স্ক্যানলন, 'আর অত দুঃশ্চিন্তা করো না। কিছুই মনে করত না মা।'

'খুব সরল মানুষ ছিল তোমার বাবা। তুমি ঠিক তোমার বাবার মতো হয়েছ। প্রথমে তুমি এমন কিছু যন্ত্রপাতির পেছনে টাকা ব্যয় করলে, যেটা যে-কোনো দিন এই বাড়ি উড়িয়ে দিতে পারে—তারপর আজ এই অদ্ভুত জীবটাকে তুমি নিয়ে এলে রাস্তা থেকে...সত্যি করে বল, জেফারসন, তুমি কি ওটাকে রেখে দিতে চাও?'

হাসলেন স্ক্যানলন। 'তাই তো মনে হচ্ছে, বিউলা। কোনো কাজই ভালোভাবে করতে পারি না আমি।'

এক সপ্তাহ পর স্ক্যানলন বসেছিলেন তাঁর ওয়র্কশপে। ম্যাক্সের আগমনে একঘেয়েমি থেকে যেন কিছুটা মুক্তি পেয়েছেন তিনি। তাঁর মেশিনের ব্যর্থতার সম্ভাব্য একটা সমাধানও যেন উঁকি দিচ্ছে মাথায়। হয়তো কিছু যন্ত্রাংশে দোষ আছে, ভাবলেন তিনি। যন্ত্রাংশের অতি সূক্ষ্ম কোনো গোলযোগও মেশিনটাকে অচল করে রাখতে পারে।

প্রবল উৎসাহে আবার তিনি লেগে পড়লেন কাজে। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল, তাঁর মেশিন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে ওয়র্কবেঞ্চের ওপর, আর সান্ত্বনার অতীত এক চেহারা নিয়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে, উঁচু একটা টুলে বসে আছেন স্ক্যানলন।

দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে যাবার শব্দটা তিনি প্রায় শুনতেই পেলেন না, কেবল কাশির শব্দে বুঝতে পারলেন ওয়র্কশপে অন্য আর একজনের উপস্থিতি।

'ও, ম্যাক্স ?' মুখ তুললেন তিনি। 'কিছু বলতে চাও ?'

'আপনি ব্যস্ত থাকলে না হয় পরে বলব, মিস্টার স্ক্যানলন।' এক সপ্তাহেও তার লজ্জা দূর হয়নি। 'মানে, বলছিলাম কি, অনেক বই আছে আমার ঘরটায়...'

'বই ? ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে, তোমার না লাগলে ওগুলো আমি সরিয়ে নেব। মনে হয় তোমার লাগবে না—বেশির ভাগই টেক্সট বই, তোমার পক্ষে একটু কঠিন।'

'তেমন কঠিন নয়।' হাতে ধরা একটা বই দেখাল ম্যাক্স। 'আমি চাইছিলাম এটার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সামান্য ব্যাখ্যা। ইন্টেগ্রাল ক্যালকুলাসের কিছু কিছু অঙ্ক আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি না। ওগুলো বেশ ঝামেলা করে। একটু দাঁড়ান, অঙ্কটা দেখাচ্ছি আপনাকে।'

পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগল ম্যাক্স, তারপর হঠাৎ থেমে গেল চারপাশটা লক্ষ করে। 'ওহ্, আপনি কি আপনার মডেলটা ভেঙে ফেলছেন ?'

প্রশ্নটা স্ক্যানলনকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। তিক্ত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। 'না, এখনই ভাঙব না। আমার ধারনা, ইনসুলেশন কিংবা কানেকশনের কোনো ভুলের জন্যে কাজ করছে না মেশিনটা। কোথাও একটা ভুল করেছি আমি।'

'এটা তো খুবই খারাপ কথা, মিস্টার স্ক্যানলন।' কুঁচকে গেল টুইনির মসৃণ ভ্রূজোড়া।

'সবচেয়ে খারাপ হল, ভুলটা আমি ধরতে পারছি না। থিয়োরি নিঃসন্দেহে নিখুঁত—যতভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব, পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। বার বার অঙ্ক কষে দেখেছি, সবসময় একই ফল এসেছে। এই তীব্রতার স্পেস-ডিসটরশন ফিল্ডের পরমাণুকে টুকরো টুকরো করে ফেলার কথা। কেবল ঘটনাটা ঘটছে না।'

'ইক্যুয়েশনগুলো একটু দেখতে পারি ?'

ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্ক্যানলন, কিন্তু গভীর আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না সেখানে। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'ওই যে—ডেস্কের হলুদ কাগজগুলোর নিচে। অবশ্য পড়তে পারবে কি না জানি না। আলসেমি করে টাইপ করা হয়নি, আর আমার হাতের লেখা হলো জঘণ্য।'

গভীর মনোযোগে পাতাগুলো ওল্টাল ম্যাক্স। 'আমার পক্ষে একটু কঠিন মনে হচ্ছে।'

হাসলেন স্ক্যানলন। 'আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম, ম্যাক্স।'

অগোছাল ঘরটায় চোখ বুলিয়ে হঠাৎ ভীষণ রাগ লাগল তাঁর। কেন মেশিনটা কাজ করবে না? ঝট করে উঠে কোটটা তুলে নিলেন তিনি। বললেন, 'বিউলাকে বল, লাঞ্চে আমার জন্যে যেন কোনো গরম খাবার তৈরি না করে। ফিরতে অনেক দেরি হবে।'

ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল তাঁর। খিদেয় জ্বলা পেট নিয়ে সদর দরজাটা খুলতেই বুঝতে পারলেন তিনি, কেউ একজন কাজ করছে ল্যাবরেটরিতে। তীক্ষ্ন একটা গুঞ্জন কানে এল তাঁর, এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর আবার গুঞ্জন।

বিদ্যুত গতিতে হলঘরটা পেরিয়ে, ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ফেললেন তিনি। যে-দৃশ্য চোখে ধরা পড়ল, তাতে সম্পূর্ণ শরীর একেবারে পাথর হয়ে গেল তাঁর।

অতি মূল্যবান অ্যাটমিক মোটরটা নতুন করে এমনভাবে জোড়া হয়েছে যে সেটার চেহারাই একেবারে বদলে গেছে।

এটা দুঃস্বপ্ন নাকি বাস্তব কোনো রসিকতা, ভাবছিলেন তিনি হতবাক হয়ে, তারপরেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। ঘরের অপর প্রান্তে যে কাজ করছে, সে আড়ালে থাকলেও বেঞ্চের পাশ দিয়ে খাড়া হয়ে আছে ধপ্‌ধপে শাদা একগোছা চুল।

'ম্যাক্স!' চিৎকার ছাড়লেন তিনি। বোকা ছেলেটা প্রলোভন এড়াতে পারেনি, কিন্তু সে জানেও না যে এই পরীক্ষা কত ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ফ্যাকাসে মুখ তুলে তাকাল ম্যাক্স, অতি ধীর পায়ে এগিয়ে এল স্ক্যানলনের দিকে।

'কী করেছ তুমি ?' আবার চিৎকার ছাড়লেন স্ক্যানলন। 'এই আগুন নিয়ে খেলার অর্থ জান ? এটার ভেতরে যে তরল আছে, সেটুকুই তোমাকে খতম করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট।'

'আমি দুঃখিত, মিস্টার স্ক্যানলন। আপনার ইকুয়েশনগুলো দেখতে দেখতে একটা ধারণা দোলা দিয়েছিল আমার মাথায়, কিন্তু আপনি এত বেশি জানেন যে বলার সাহস পাইনি। আপনি চলে যাবার পর প্রলোভন আর সামলাতে পারিনি আমি। অবশ্য এতকিছু করার ইচ্ছে ছিল না আমার। ভেবেছিলাম, আপনি আসার আগেই সব আবার আলাদা আলাদা করে ফেলব।'

দীর্ঘক্ষণ বিরাজ করল নীরবতা। তারপর স্ক্যানলন যখন আবার কথা বললেন, তাঁর স্বর শোনাল আশ্চর্যরকমের শান্ত, 'বেশ, কি করেছ তুমি ?'

'শুনলে আপনি রাগ করবেন না তো ?'

'এখন রাগ করে আর কোনো লাভ নেই। মেশিনটার এর চেয়ে খারাপ অবস্থা তুমি আর করতে পারবে না।'

'এই ইকুয়েশনগুলোতে আমি লক্ষ করলাম,' পর পর দু'টো পাতা টেনে দেখাল ম্যাক্স, 'স্পেস-ডিসটরশন ফিল্ডের প্রশ্নে সবসময়ই x^2 যোগ x^2 যোগ z^2-এর ফাংশন দেখান হয়েছে। ফিল্ডগুলোকে যেহেতু সবসময় অপরিবর্তনীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে আমরা একটা গোলকের ইকুয়েশন পাই।'

মাথা ঝাঁকালেন স্ক্যানলন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমিও লক্ষ করেছি, কিন্তু সমস্যার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আমি ভেবেছি, এটার মধ্যে ইনডিভিজ্যুয়াল ফিল্ড সাজানর একটা ইঙ্গিত থাকতে পারে। তাই ডিসটর্টারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে আবার সংযুক্ত করলাম একটা গোলকের আকারে।'

হ্যাঁ হয়ে গেল স্ক্যানলনের মুখ। মেশিনের রহস্যময় পুনঃসংযোগের কারণটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—তার চেয়ে বড় হল, ছেলেটার কথাগুলোকে আর প্রলাপ মনে হচ্ছে না।

'এটা কাজ করে ?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আমি নিশ্চিত নই। এটা একটা সাধারণ সেট-আপ। তাছাড়াও একের পর এক সেই ভুলের ব্যাপারটা...'

'কিন্তু এটা কাজ করে কি না?' উদ্যমে আবার জ্বলে উঠেছেন স্ক্যানলন, অস্থিরতায় ছটফট করছে ভেতরটা।

'বেশ, পেছনে সরে দাঁড়ান। আউটপুট যেন আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে না যায়, সেজন্যে স্বাভাবিকের চেয়ে শক্তি এক-দশমাংশ কমিয়ে দিয়েছি।'

আস্তে করে সুইচটা নামিয়ে দিল ম্যাক্স। সংযোগ স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রাল কোয়ার্জ চেম্বারের খাঁজ থেকে দপ্ করে লাফিয়ে উঠল নীল-শাদা একটা শিখা। আপনা আপনি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল স্ক্যানলনের, তাকালেন তিনি আউটপুট গজের দিকে। সাঁ সাঁ করে কাঁটা উঠে গেল প্রায় সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি। ওদিকে জ্বলতে থাকল ম্যাগনেসিয়াম ফ্লেয়ারের চেয়ে উজ্জ্বল শিখাটা, আপাত কোনো তাপ অনুভূত না হলেও তার পাশে রীতিমত ঝাপসা দেখাল বৈদ্যুতিক বাতিগুলো।

ম্যাক্স সুইচ অফ করতে লাল হয়ে শেষমেষ নিবে গেল শিখাটা, ঘরের মাঝে ছড়িয়ে রইল লালচে একটা আভা। আউটপুট গজ নেমে এল শূন্যে, পায়ে আর কোনো শক্তি না পেয়ে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন স্ক্যানলন।

এবার তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল টুইনিটার ওপর, সে-দৃষ্টিতে মিশে আছে শ্রদ্ধা, বিস্ময়, এমনকি খানিকটা আতঙ্ক।

'পারমাণবিক শক্তি!' বললেন তিনি কর্কশ গলায়। 'আর তার সমাধান দিল বিশ বছরেরও কম বয়সের এক বালক।'

নত মুখে ম্যাক্স বলল, 'বছরের পর বছর ধরে আসল কাজ প্রায় সব আপনিই করেছেন, মিস্টার স্ক্যানলন। সামান্য একটা জিনিস কেবল লক্ষ করেছি আমি, যা হয়তো পরদিনই ধরা পড়ত আপনার চোখে।' স্ক্যানলনের অপলক দৃষ্টির সামনে কথা হারিয়ে গেল ওর।

'পারমাণবিক শক্তি—মানুষের এ-যাবৎ সবচেয়ে বড় কীর্তি, আসলে গড়েছি আমরা দু'জনে।'

নিজেদের অর্জনে দু'জনকেই মনে হল বিস্ময়ে অভিভূত।

আর সেই মুহূর্তেই বৈদ্যুতিক যুগ পেরিয়ে পৃথিবী প্রবেশ করল পারমাণবিক যুগে।

আরাম করে পাইপ টানছেন জেফারসন স্ক্যানলন। বাইরে বরফ পড়ছে ঝুর ঝুর করে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তীব্র শীত। ঘরের ভেতরে ধুমপান করতে করতে হাসছেন স্ক্যানলন আপনমনে। অন্য পাশে মাঝে মাঝে গুনগুন করছে আর উল বুনছে বিউলা। এক কোণে জানালার পাশে বসে বই পড়ছে ম্যাক্স। অবসরে বই পড়তে ও খুব ভালোবাসে, কিন্তু কিছু দিন যাবৎ স্ক্যানলন বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করছেন যে ছেলেটা ইদানীং হালকা উপন্যাস পড়ছে।

একবছর আগের সেই স্মরণীয় দিনটার পর অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। স্ক্যানলন এখন সর্বজনশ্রদ্ধেয়, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। পাশাপাশি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, পারমাণবিক শক্তিই এখন পৃথিবীকে চালিত করছে নতুনভাবে।

বড় বড় শক্তিধর দেশগুলোকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালেন স্ক্যানলন, কারণ, পারমাণবিক শক্তিকে তারা ব্যবহার করছে মানব কল্যাণে। তারা পরস্পর শক্তির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে অনিবার্যভাবে ধ্বংস হত মানব সভ্যতা।

আন্তঃগ্রহ ভ্রমণে ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আগের এক-তৃতীয়াংশ সময়ে মঙ্গল আর শুক্রগ্রহে যাওয়াটা এখন পরিণত হয়েছে প্রমোদ-ভ্রমণে। বাইরের গ্রহগুলোতে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে অবশেষে।

একটামাত্র ব্যাপারই কেবল এখনো খচখচ করে স্ক্যানলনের বুকে। অনেক বলা সত্ত্বেও এই আবিষ্কারের বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নিতে রাজি হয়নি। ম্যাক্স।

জোর একটা শব্দে চিন্তার সূত্রটা কেটে যেতে ঘুরলেন তিনি ম্যাক্সের দিকে, হঠাৎ বইটা বন্ধ করেছে ও।

'কি হয়েছে তোমার?' বললেন স্ক্যানলন।

বইটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স। 'আমি নিঃসঙ্গ, ব্যস।'

মুখটা ঝুলে পড়ল স্ক্যানলনের, হঠাৎ করেই যেন কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। 'ব্যাপারটা আমি বুঝি, ম্যাক্স,' খুব নরম গলায় বললেন তিনি অবশেষে। 'তোমার জন্যে খারাপও লাগে আমার, কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে—'

চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাক্সের, একটা হাত রাখল ও স্ক্যানলনের কাঁধের ওপর, 'আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি, মানে হল, বুঝতেই তো পারছেন, কথা বলার জন্যে সবাই তার আপন বয়সের, আপন জাতের কাউকে চায়।'

তীক্ষ্ণ চোখে বিউলা তাকাল টুইনিটার দিকে, কিন্তু কিছু না বলে আবার নামিয়ে নিল মাথা।

স্ক্যানলন বললেন, 'একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছ তুমি। মানুষের কাছে বন্ধু বা সঙ্গীর প্রয়োজন অনেক, কিন্তু আমি বা বিউলা তার কোনোটাই নই। তোমার আপন জাতের কেউ হলে সমস্যার চমৎকার সমাধান হত, কিন্তু ব্যাপারটা সহজ নয়।'

কিছু বলার জন্যে মুখটা খুলেও শেষ পর্যন্ত বলল না ম্যাক্স, তারপরেই কেন যেন চেহারাটা গোলাপী হয়ে গেল ওর। ঘর থেকে বেরিয়ে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল ও দরজাটা।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্ক্যানলন বললেন, 'ছেলেটার কি হয়েছে বল তো ?'

বেশ আগেই উল বোনা বন্ধ করেছে বিউলা। 'জন্ম থেকেই পুরুষেরা বোকা আর অন্ধ।'

'তাই না ? তুমি বলতে পারবে, কি অসুবিধে হচ্ছে ওর ?'

'নিশ্চয় পারব। ব্যাপারটা তোমার পরা বিশ্রী টাইটার মতোই সোজা। গত একমাস তুমি ওটা বদলাওনি। বেচারা ম্যাক্স!'

মাথা ঝাঁকালেন স্ক্যানলন, 'তোমার কথা বোঝা খুবই কঠিন, বিউলা।'

উল বোনার সরঞ্জামগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল হাউসকিপার। 'মোটেই নয়। ছেলেটার বয়স বিশ। ওর একজন সঙ্গী দরকার।'

'শেষমেষ এই বুঝলে তুমি ? আরে এই কথাটা তো ছেলেটা নিজেই বলল।'

'জেফারসন, তুমি কি বিশ বছর বয়স অনেক আগে পেরিয়ে এসেছ ? সত্যি করে বল তো, তুমি কি এই বুঝেছ যে ছেলেটা পুরুষ সঙ্গী চাইছে ?'

'ও,' মুহূর্তে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্ক্যানলনের, 'ওহ্!' হাসলেন তিনি আজব এক ঢংয়ে।

'তাহলে কি ব্যবস্থা নেবে এখন তুমি ?'

'কিছুই না। এ-ব্যাপারে কি করার আছে ?'

'বেসমেন্ট থেকে ছাদ পর্যন্ত পাঁচশো অরফ্যান অ্যাসাইলাম কেনার মতো টাকা আছে তোমার। ছেলেটাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে একটা টুইনি মেয়ে জোগাড় করা তোমার পক্ষে খুবই সহজ।'

আতঙ্ক ফুটল এবার স্যানলনের চেহারায়। 'ম্যাক্সের জন্যে একটা টুইনি মেয়ে জোগাড় করতে বেরব আমি? মেয়েদের সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না আমি, বিশেষ করে টুইনি মেয়ে। তাছাড়া ওর পছন্দ সম্বন্ধেও জানা নেই আমার। হয়তো এমন একজনকে নিয়ে আসব, যার দিকে ও মুখ তুলেও তাকাবে না।'

'আজেবাজে কথা বল না, জেফারসন। সুন্দরী একটা টুইনি ঠিকই জোগাড় করতে পারবে তুমি।'

'না, পারব না। যতসব বিশ্রী চিন্তাভাবনা...'

'জেফারসন! তুমি ওর গার্ডিয়ান। ওর জন্যে এটা তোমার কর্তব্য এবং দায়িত্ব।'

কথাটা যেন রীতিমত ধাক্কা দিল বিজ্ঞানীকে। 'হ্যাঁ, কর্তব্য এবং দায়িত্ব,' বললেন তিনি। 'ঠিকই বলেছ তুমি বিউলা। কাজটা করতেই হবে আমার।'

ভিনিগার-মুখো মহিলাটির কড়া দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিবোধ করলেন স্যানলন। নেম-বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা আছে—মিস মার্টিন, সুপারিনটেনডেন্ট।

'বসুন, স্যার,' বলল সে রসকসহীন গলায়। 'কি চান ?'

অসংখ্য অ্যাসাইলাম ঘুরে এসেছেন স্যানলন, কাজটা ক্রমেই কঠিন মনে হচ্ছে। এখানেও যদি পছন্দসই কোনো টুইনি মেয়ে না মেলে, খোঁজাখুঁজির ইতি টানবেন তিনি।

'আমি দেখতে এসেছি,' তোতলাতে লাগলেন তিনি, 'আপনাদের অ্যাসাইলামে কোনো টুই—মা-মানে, মঙ্গলগ্রহের দো-আঁশলা আছে কি না।'

'তিনজন আছে,' বলল সুপারিনটেনডেন্ট।

'কোনো মেয়ে?' আগ্রহী হয়ে উঠলেন স্ক্যানলন।

'সবগুলোই মেয়ে,' জবাব দিল সে, চোখে তার এখন ভর করেছে সন্দেহ।

'বেশ। ওদের একটু দেখতে পারি?'

মিস মার্টিনের ঠাণ্ডা দৃষ্টির কোনো হেরফের হল না, 'প্রথমে আমাদের জানা দরকার, আপনি কোনো হাফ-ব্রীডকে পোষ্য নেয়ার কথা ভাবছেন কি না।'

'পছন্দ হলে আমি গার্ডিয়ানশীপ পেপারস নিতে চাই। ওদের পোষ্য নেয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক?'

'নিশ্চয়ই,' তৎক্ষণাৎ জবাব ভেসে এল। 'এরকম কেসে আমাদের অবশ্যই আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। সরকারের মতে, এদের রাষ্ট্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধান করাটাই বেশি ভালো।'

'জানি, ম্যাডাম, আমি জানি। মাস পনেরো আগে এ-ব্যাপারে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। তবে আমার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান আপনাকে সন্তুষ্ট করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমার নাম জেফারসন স্ক্যানলন—'

'জেফারসন স্ক্যানলন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। মুহূর্তে তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বশ্যতার একটা হাসি, 'আপনাকে অনেক আগেই চেনা উচিত ছিল, কত ছবি দেখেছি আপনার। কী বোকা আমি! আর কোনো পরিচয় দেয়ার দরকার নেই। আমি নিশ্চিত যে আপনার এই ব্যাপারে সরকারও কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না।'

জোরে একটা ডেস্ক-বেল বাজাল সে। একজন পরিচারিকা আসতে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল তার উদ্দেশে, 'এক্ষুনি মেডেলিন আর ছোট্ট দু'জনকে নিয়ে এস। গোসল করিয়ে আনবে আর তাদের সাবধান করে দেবে, কোনোরকম উল্টো-পাল্টা যেন না করে।'

পরিচারিকা চলে যেতে আবার ঘুরল মহিলা স্ক্যানলনের দিকে, 'বেশি সময় লাগবে না, মিস্টার স্ক্যানলন। আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে খুব সম্মানিত বোধ করছি, আর আপনার প্রতি আগের ব্যবহারের জন্যে আমি

খুবই লজ্জিত। প্রথমে আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, তবে বুঝতে বেশি দেরি হয়নি যে আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।'

সুপারিনটেনডেন্টের উদ্ধত ব্যবহারে মেজাজ খারাপ হয়েছিল স্ক্যানলনের, এখন তার অমায়িক আচরণে তিনি একদম অসহায় বোধ করলেন। বার বার কপালের ঘাম মুছলেন তিনি, আর তার হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিলেন সংক্ষিপ্ত, কাটা কাটা জবাব। যখন কেবল তিনি পালাবার পরিকল্পনা আঁটছেন এই মাদি ড্রাগনের কবল থেকে, ঠিক সেই সময় পরিচারিকা এসে উপস্থিত হল তিন টুইনিকে নিয়ে।

সাগ্রহে দো-আঁশলা তিনটেকে দেখলেন স্ক্যানলন। দু'জন একেবারে শিশু, সম্ভবত বছর দশেক করে বয়স, তৃতীয়জনের বয়স আঠারোর মতো, মনে হল সবদিক থেকে মানানসই।

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন স্ক্যানলন। মেয়েটির গভীর নীল, লাজুক চোখজোড়া এখন মেঝের দিকে নিবদ্ধ। ওর অদ্ভুত চুলগুলো পর্যন্ত সুন্দর লাগছে। মাঝারি উচ্চতার চুল, ম্যাক্সের মতো অত লম্বা নয়, রূপালী-শাদা রঙে সূর্যের আলো পড়ে রীতিমত ঝিকমিক করছে।

ছোট্ট দু'জন শক্ত করে চেপে ধরে আছে বড় মেয়েটির স্কার্ট, আর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দু'জনকে দেখছে আতঙ্কিত চোখে।

'মিস মার্টিন, ঠিক এরকম একটি মেয়েই আমি খুঁজছিলাম,' মন্তব্য করলেন স্ক্যানলন। 'গার্ডিয়ানশীপ পেপারগুলো পেতে কতক্ষণ লাগবে বলুন তো?'

'আমি আগামীকালই সব তৈরি করে ফেলব, মিস্টার স্ক্যানলন। আপনার মতো বিশেষ ধরনের কেসে আমি খুব সহজেই বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারব।'

'ধন্যবাদ। তাহলে আগামীকাল আবার—' কথা শেষ করার আগেই ছোট্ট টুইনি দু'জনের একজন ভেঙে পড়ল কান্নায়, তার পরপরই অন্যজন।

'মেডেলিন,' ধমকে উঠল মিস মার্টিন, 'এক্ষুনি রোজ আর ব্লানশিকে থামাও। এসব কী জঘণ্য আচরণ!'

হস্তক্ষেপ করলেন স্ক্যানলন। তাঁর মনে হল, ছোট্ট দু'জনকে হাসিমুখে সান্ত্বনা দিলেও মেডেলিনের চোখজোড়া যেন ছলছল করছে।

'হয়তো,' বললেন তিনি, 'মেয়েটির এই অ্যাসাইলাম ছেড়ে যাবার ইচ্ছে নেই। ও স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে কিছুতেই নিয়ে যাব না আমি।'

উন্নাসিক ভঙ্গিতে হাসল মিস মার্টিন, 'সে কোনো ঝামেলা করবে না।' ঘুরল সে মেয়েটির দিকে, 'তুমি মহান জেফারসন স্ক্যানলনের নাম শুনেছ, শোননি?'

'শুনেছি, মিস মার্টিন,' আস্তে করে জবাব দিল মেয়েটি।

'ব্যাপারটা আমাকে দেখতে দিন, মিস মার্টিন,' বললেন স্ক্যানলন। 'এই মেয়ে, তুমি কি এখানেই থাকতে চাও?'

'না, না,' ভেসে এল আন্তরিক জবাব, 'যেতে পারলেই খুশি হব আমি, যদিও,' আতঙ্কিত চোখে তাকাল মেয়েটি মিস মার্টিনের দিকে, 'এখানে আমি বেশ ভালোই আছি। কিন্তু আমি চলে গেলে এই দু'জনের কি হবে? আমি ছাড়া ওদের আর কেউ নেই। আমি চলে গেলে ওরা—ওরা—'

একেবারে ভেঙে পড়ে দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটি, 'আমি ওদের ছেড়ে যেতে চাই না, স্যার!' দু'জনকেই চুমু খেল ও, 'কেঁদো না, আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না। তারা আমাকে নিয়ে যাবে না এখান থেকে।'

দৃশ্যটা স্ক্যানলনের মন খুব খারাপ করে দিল। মিস মার্টিন তাকিয়ে রইল ভ্রূ কুঁচকে।

'এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, মিস্টার স্ক্যানলন,' বলল সে। 'আগামীকাল দুপুরের মধ্যে সব তৈরি হয়ে যাবে আশা করি।'

'তিনজনেরই গার্ডিয়ানশীপ পেপারস তৈরি রাখবেন,' ভেসে এল গম্ভীর জবাব।

'কী? তিনজনই? আপনি ভেবে বলছেন তো?'

'নিশ্চয়। ইচ্ছে করলে আমি তিনজনকেই পোষ্য নিতে পারি, পারি না?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'হ্যাঁ, তা নিশ্চয় পারেন, কিন্তু—'

দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেলেন স্ক্যানলন, পেছনে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল মেডেলিন আর মিস মার্টিন, সুপারিনটেনডেন্ট সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে, আর টুইনি মেয়েটি হঠাৎ উথলে ওঠা এক সুখের আবেশে। এমন কী দশ

বছরের দু'জনও বুঝতে পেরেছে পরিস্থিতির পরিবর্তন, কান্না থামিয়ে এখন ওরা কেবল ফুঁপিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।

এয়ারপোর্টে একজনের জায়গায় তিনজন টুইনি দেখে একেবারে হাঁ হয়ে গেল বিউলা। তবে ছোট্ট রোজ আর ব্লানশি প্রথমেই তার মন কেড়ে নিল। বিউলার কুঞ্চিত গাল চুমুয় চুমুয় ভড়িয়ে দিল ওরা, আনন্দে বিগলিত হয়ে বয়স্কা হাউসকিপারও চুমু দিল শিশু দু'টোকে।

আর মেডেলিনকে দেখে তার চোখের পলক আর পড়ে না। স্ক্যানলনের কানে কানে সে ফিসফিস করে বলল যে মেয়ে চেনেন না বলে তিনি এতদিন ভান ধরেছিলেন।

'যদি ওর চুলগুলো কেবল ভালো হত', স্ক্যানলনও জবাব দিলেন ফিসফিস করে, 'তাহলে ওকে আমিই বিয়ে করতাম।'

দুপুরের পর বাড়ি পৌঁছে ম্যাক্সকে নিয়ে বনে হাঁটতে গেলেন স্ক্যানলন। এদিকে তিন টুইনিকে গোটা বাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল বিউলা। হাসি-আনন্দে ওদের এমন মাতিয়ে রাখল সে তিনজনেরই সমস্ত লজ্জা ভুলে প্রথম দিনেই তার একেবারে আপন হয়ে গেল।

তারপর শীতের বিকেল গড়িয়ে যেতেই মেডেলিনকে বিউলা বলল, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। নিচতলায় গিয়ে পুরুষগুলোর খাবার তৈরির ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

অবাক হল মেডেলিন, 'পুরুষগুলো? মিস্টার স্ক্যানলন ছাড়া এখানে আর কেউ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। ম্যাক্স আছে। তুমি তাকে এখনো দেখনি।'

'ম্যাক্স কী তোমার আত্মীয়?'

'না, বাছা। ও মিস্টার স্ক্যানলনের আরেকজন পোষ্য।'

'ও, বুঝতে পেরেছি।' মুখ লাল হয়ে গেল ওর, অজান্তেই হাত উঠে গেল চুলে।

মুহূর্তে ওর চিন্তার ধরণটা বুঝতে পেরে, নরম গলায় বিউলা বলল, 'ভেব না। তুমি টুইনি বলে কিছু মনে করবে না ম্যাক্স। তোমাকে দেখে ও বরং খুশিই হবে।'

তবে মেডেলিনকে দেখে ম্যাক্সের যে-অবস্থা হয়েছিল, সেটাকে কেবল 'খুশি' বললে খুব কমই বলা হয়।

স্ক্যানলনের সামনে সামনে বাড়িতে ঢুকে ওভারকোটটা খুলে ফেলল ম্যাক্স, তারপর পা ঠুকে ঠুকে ঝেড়ে ফেলতে লাগল জুতোর বরফ।

'উহ্,' বলল ও পেছনে পেছনে আসা বিজ্ঞানীর উদ্দেশে, 'এই হাড়কাঁপান শীতের দিনে কেন যে আপনার বেড়ানর ইচ্ছে হল জানি না।' বাতাস শুঁকে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর, 'ল্যাম্ব চপ মনে হচ্ছে,' দ্বিগুণ গতিতে ও রওনা দিল ডাইনিংরুমের দিকে।

দরজার মুখে এসে চমকে থেমে গেল ও, টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগল হাঁপানি রোগীর মতো। পাশ দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে বসে পড়লেন স্ক্যানলন।

'এস,' বললেন বিজ্ঞানী ওর ইটের মতো লাল-হয়ে-যাওয়া মুখটা উপভোগ করতে করতে। 'বসো। সবার পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল মেডেলিন, এই দু'জন রোজ আর ব্লানশি। আর ওটা হল,' মেডেলিনের গোলাপী মুখটি প্লেটের দিকে নামান দেখে খুবই খুশি হলেন তিনি, 'আমার পোষ্য ম্যাক্স।'

'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম,' বলল ম্যাক্স পিরিচের মতো গোল গোল চোখ করে।

হইহই করে অভ্যর্থনার জবাব দিল রোজ আর ব্লানশি, কিন্তু চোখটা তুলেই আবার নামিয়ে নিল মেডেলিন।

খাবারের পালা এগিয়ে চলল প্রায় নিঃশব্দে। সারা বিকেল খিদে খিদে করলেও ঠাণ্ডা হয়ে গেল ম্যাক্সের চপ, আর এমনভাবে খাবার নাড়াচাড়া করল মেডেলিন, যেন খাবার আবার কোনো কাজে লাগে সেটা ওর জানা নেই। চুপচাপ খেলেন স্ক্যানলন আর বিউলা, আর খাবারের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে তাকালেন একে অপরের দিকে।

খাবার শেষ হতেই চলে এলেন স্ক্যানলন স্টাডিতে, কারণ, এই ধরণের পরিস্থিতি মেয়েরাই ভালো সামাল দিতে পারে। ঘণ্টা খানেক পর বিউলা আসতেই একনজরে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর ধারণা সঠিক।

'ওদের লজ্জা ভেঙে দিয়ে এসেছি,' সুখ ছড়িয়ে পড়ল তার গলায়, 'এখন ওরা একজন আরেকজনকে নিজ নিজ জীবনের ইতিহাস শোনাচ্ছে। অবশ্য

পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি এখনো, দু'জন কথা বলছে ঘরের দুই প্রান্তে বসে, তবে ওই দূরত্ব খুব শিগগিরই ঘুচে যাবে আশা করি।'

'জোড়াটা সুন্দর মিলেছে, তাই না, বিউলা ?'

'এর চেয়ে সুন্দর জোড়া আমি আর দেখিনি। ছোট্ট রোজ আর ব্লানশি তো স্বর্গের ফুল। ওদের ঘুম পাড়িয়ে এসেছি এইমাত্র।'

সামান্য নীরবতার পর ধীরে ধীরে বিউলা আবার বলতে লাগল, 'এই প্রথম তুমি ছিলে ঠিক আর আমি ভুল—সেই যে প্রথম যেদিন ম্যাক্সকে তুমি বাড়ি নিয়ে এলে আর আমি আপত্তি করলাম—সেদিন থেকেই তো সবকিছুর শুরু। তুমি তোমার বেহেস্তবাসিনী মা-র মুখ উজ্জ্বল করেছ, জেফারসন।'

স্ক্যানলন মাথা নাড়ালেন খুব ধীরে ধীরে, 'পৃথিবীর সব টুইনিকে যদি আমি এরকম সুখী করতে পারতাম! ব্যাপারটা খুব সহজ। আমরা যদি কেবল ওদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করি, ওদের জন্যে গড়ে দিই আলাদা বাসস্থান, ভাবি ওদের সুখের কথা—'

'কাজটা তুমি নিজেই করছ না কেন ?' বলে উঠল বিউলা।

গভীর চোখে স্ক্যানলন তাকালেন বৃদ্ধা হাউসকিপারের দিকে। 'ঠিক এই কথাটাই আমি ভাবছিলাম।' স্বর তাঁর একেবারে নেমে গেল স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো, 'ভেবে দেখ। টুইনিদের জন্যে আলাদা একটা শহর—যার রক্ষণাবেক্ষণ ওরা নিজেরাই করবে—সেখানে থাকবে ওদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজনীয় সব ধরণের জিনিস। পৃথিবীর মাঝেই আরেক খুদে পৃথিবী, যেখানে টুইনিরা বাস করতে পারবে স্বাধীনভাবে, দিনে-রাতে যখন-তখন খাঁটি-রক্তধারীদের তাড়া খেয়ে ওদের পালিয়ে বেড়াতে হবে না জন্তুর মতো।'

হাত বাড়িয়ে পাইপটা নিয়ে তামাক ভরলেন তিনি ধীরে ধীরে, 'একজন টুইনির ঋণ পৃথিবী শোধ করতে পারবে না, ওর কাছে আমিও ঋণী। কাজটা আমি করব। আমি তৈরি করব টুইনিটাউন।'

সেই রাতে ঘুমালেন না তিনি। প্রকাণ্ড বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে ফিকে হয়ে গেল নক্ষত্ররাজি। এল ধূসর উষা, স্ক্যানলন তখনো বসে আছেন স্থির হয়ে—স্বপ্ন দেখছেন আর পরিকল্পনা করছেন, পরিকল্পনা আঁটছেন আর বিভোর হচ্ছেন স্বপ্নে।

বয়স স্বাভাবিকভাবেই তার ছাপ ফেলেছে আশি বছরের জেফারসন স্ক্যানলনের ওপর। মাথার চুল তাঁর এখন টুইনিদের মতোই শাদা, তবে আজও তিনি কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর।

বৃদ্ধজীবন সুখের জীবন নয়। গত চল্লিশ বছর ধরে টুইনিটাউন গড়ে ওঠা দেখছেন স্ক্যানলন, আর এই দেখার মাঝেই খুঁজে পাচ্ছেন সুখ।

জানালা দিয়ে শহরটাকে তাঁর মনে হচ্ছে অপূর্ব, বিশাল এক চিত্রকর্ম। উর্বরা ওহাইয়োর তিনশো বর্গমাইল জুড়ে এই শহর, অধিবাসী এক হাজারের কিছু বেশি।

চমৎকার সব বাড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তা, পার্ক, থিয়েটার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট সমৃদ্ধ এই মডেল টাউন কয়েক দশকের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপ্রচেষ্টা আর সহযোগিতার সাক্ষ্য বহন করছে।

পেছনের দরজাটা খুলে, নরম একটা পদশব্দ এগিয়ে আসতেই তিনি বললেন, 'কে, মেডেলিন?'

'হ্যাঁ, বাবা,' টুইনিটাউনের সব অধিবাসী তাঁকে 'বাবা' বলেই সম্বোধন করে। 'ম্যাক্স মিস্টার জোহানসনকে নিয়ে আসছে।'

'বেশ,' সস্নেহে তাকালেন তিনি মেডেলিনের দিকে। 'সেই কবে থেকে আমরা টুইনিটাউনকে আমাদের চোখের সামনে তিলে তিলে গড়ে উঠতে দেখেছি, তাই না?'

সায় দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেডেলিন।

'দীর্ঘশ্বাস ফেল না। আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে। আজ এটা দেখার জন্যে যদি কেবল বিউলা বেঁচে থাকত।'

পঁচিশ বছর আগে মারা যাওয়া হাউসকিপারের কথা ভেবে মাথা নাড়াতে লাগলেন তিনি।

'এসব দুঃখের চিন্তা করবেন না,' বলল মেডেলিন। 'এই যে মিস্টার জোহানসন এসে পড়েছেন। আজ টুইনিটাউনের চল্লিশতম বার্ষিকী; আনন্দের দিন, দুঃখের নয়।'

চার্লস বি. জোহানসন একজন ধূর্ত মানুষ। বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, বিজ্ঞানের মোটামুটি দক্ষ, কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার খাতিরে তিনি তাঁর এই গুণগুলোকে কাজে লাগান না। ফলে রাজনীতিতে তিনি এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। বর্তমানে তিনি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সেক্রেটারি।

নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম কাজ হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং উদ্ভাবক জেফারসন স্ক্যানলনের সঙ্গে সাক্ষাত, আবিষ্কারের প্রশ্নে এই বৃদ্ধ বয়সেও যিনি তুলনাহীন। টুইনিটাউন তাঁর কাছে বেশ বড় ধরণের এক বিস্ময়। তিনি এটার মাঝে খুঁজে পাচ্ছেন অশুভর গূঢ় লক্ষণ, অথচ বাইরের পৃথিবী কেবল ভাসাভাসাভাবে এটার কথা জানে, তাদের কাছে বিশ্বশ্রেষ্ঠ এক বিজ্ঞানীর এটা একটা নির্দোষ খেয়ালমাত্র।

মনে তাঁর যা-ই থাক, ম্যাক্সসহ স্ক্যানলনের কাছে এলেন তিনি অমায়িক চেহারা নিয়ে।

'এস, এস, জোহানসন,' অভ্যর্থনা জানালেন স্ক্যানলন। 'কেমন মনে হচ্ছে এসব?'

'অপূর্ব,' বললেন জোহানসন।

তৃপ্তির হাসি ফুলে উঠল স্ক্যানলনের মুখে, 'শুনে খুশি হলাম। এখানকার বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা ১১৫৪, আর ক্রমেই তা বাড়ছে। এ-যাবৎ আমাদের উন্নতি তুমি দেখেছ, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা যা করতে যাচ্ছি, তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। আমার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকবে এই উন্নতি। তবে একটা জিনিস আমি আমার জীবদ্দশাতেই দেখে যেতে চাই, আর সেজন্যে তোমার সাহায্য আমার দরকার।'

'কী ধরণের সাহায্য?' জানতে চাইলেন জোহানসন।

'খুব সহজ। মানুষ আর মঙ্গলবাসীদের পাশাপাশি এই টুইনিদের, দীর্ঘকালের অবহেলিত দো-আঁশলাদের, সমঅধিকার দানের ব্যবস্থা নেবে তুমি—রাজনৈতিক, আইনী, অর্থনৈতিক, সামাজিক—সবদিক থেকে।'

ইতস্তত করলেন জোহানসন, 'কাজটা সহজ হবে না। তাদের বিরুদ্ধে এখনো বেশ, সম্ভবত বোধগম্য সংস্কার কাজ করছে, তাই যতদিন পর্যন্ত না মানুষকে আমি বোঝাতে পারছি যে টুইনিরা সমঅধিকার লাভের যোগ্য—' মাথা দোলাতে লাগলেন তিনি সন্দেহভরে।

'সমঅধিকার লাভের যোগ্য!' স্বর চড়ে গেল স্ক্যানলনের, 'বেশি অধিকার লাভের যোগ্য ওরা। আমি পরিমিত দাবিই করেছি।' এই কথা শুনে ঘরের এককোণে বসে থাকা ম্যাক্স মুখ তুলে ঠোঁট কামড়াল, কিন্তু স্ক্যানলন আবার কথা শুরু করায় কিছু বলল না, 'তুমি টুইনিদের সত্যিকারের যোগ্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নও। ওরা পৃথিবী আর মঙ্গলের সম্মিলিত গুণের

আধার। ওদের মাঝে রয়েছে মঙ্গলের বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর পৃথিবী সীমাহীন কর্মচাঞ্চল্য। বুদ্ধির বিচারে ওদের প্রত্যেকেই তোমার আমার ওপারে। সেখানে আমি কেবল সমঅধিকার চেয়েছি।'

মধুর হাসি হেসে সেক্রেটারি বললেন, 'আবেগ হয়তো আপনাকে ভুল বোঝাচ্ছে, মাই ডিয়ার স্ক্যানলন।'

'মোটেই না। আমার এতসব আবিষ্কার কী এই টুইনি সহকারীদের ছাড়া সম্ভব ছিল বলে তুমি মনে কর? এই ম্যাক্সের কথাই ধর,' সেক্রেটারির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে চোখ নামিয়ে নিল ম্যাক্স, 'ও-ই আমার পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারে চূড়ান্ত সাহায্যটি করেছে।'

এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন স্ক্যানলন, 'স্ট্যানফোর্ডের প্রোফেসর হুইটসানকে জিজ্ঞেস কর, তিনি তোমাকে সব খুলে বলবেন। হুইটসান বিশ্বসেরা মনোবিজ্ঞানী, যা বলেন বুঝেসুঝেই বলেন। তিনি টুইনিদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর কাছে গেলে জানতে পারবে, টুইনিরাই সৌরজগতের ভবিষ্যত। আমাদের, খাঁটি-রক্তধারীদের হাত থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে কর্তৃত্ব চলে যাবে ওদের হাতে। এখন বল, ওরা কী সমঅধিকার লাভের যোগ্য নয়?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় যোগ্য,' জবাব দিলেন জোহানসন। অদ্ভুত এক আলো খেলা করতে লাগল তাঁর চোখে, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এত গুরুত্বপূর্ণ যে এক্ষুণি একটা ব্যবস্থা নেয়া দরকার, আর তাই ২ঃ১২ মিনিটের স্ট্র্যাটেকারটা ধরতে হবে আমাকে।'

জোহানসন চলে যেতে না যেতেই ম্যাক্স সোজা এসে দাঁড়াল স্ক্যানলনের সামনে। 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই, বাবা, যেটার কথা আপনি জানেন না।'

অবাক চোখে তাকালেন স্ক্যানলন, 'তার মানে?'

'আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ, বাবা। আমি সব বুঝিয়ে বলছি।' ওর গম্ভীর ভাবভঙ্গি প্রায় ভীতিকর। দরজার কাছে মেডেলিনকে দেখে একটা ইশারা করল ম্যাক্স, আর সেই ইশারা অর্থ বুঝেই যেন মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল ওর।

একদম চুপচাপ তিনজন উঠে বসল অপেক্ষমান রকোকারে, তারপর ছুটল হিল অভ দ্য উডস অভিমুখে। ক্লেয়ার হ্রদের অনেক ওপরে উঠে, কার আবার নেমে এল পাহাড়ের পাদদেশের বনভূমিতে।

স্ক্যানলনকে দেখে লাফিয়ে উঠল লম্বা-চওড়া একজন টুইনি। 'গুড আফটারনুন ফাদার,' বলল ও ফিসফিস করে, তারপর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ম্যাক্সের দিকে।

'গুড আফটারনুন, ইমানুয়েল,' উদাসভাবে জবাব দিলেন স্ক্যানলন। হঠাৎ কৌশলে লুকিয়ে রাখা একটা ফাটল চোখে পড়ল তাঁর, যেটা সোজা চলে গেছে পাহাড়ের ভেতরে।

পথ দেখিয়ে সেই ফাটলের ভেতরে তাঁকে নিয়ে গেল ম্যাক্স, একশো গজ এগোবার পর পাওয়া গেল মানুষের তৈরি প্রকাণ্ড একটা গুহা। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন স্ক্যানলন, কারণ, তাঁর সামনেই রূপালী-শাদা তিনটে বিশাল বিশাল স্পেসশিপ, প্রত্যেকটাই সর্বাধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত।

'আমি দুঃখিত, বাবা,' বলল ম্যাক্স, 'আপনাকে না জানিয়েই করা হয়েছে এসব। টুইনিটাউনের ইতিহাস এই একটামাত্র ঘটনাই আপনার অজানা।' স্ক্যানলন যেন কথাগুলো প্রায় না শুনে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘোর-লাগা মানুষের মতো, আর আবার বলতে লাগল ম্যাক্স, 'মাঝেরটা ফ্ল্যাগশিপ—জেফারসন স্ক্যানলন, ডানপাশেরটা—বিউলা গুডকিন, আর বামেরটা—মেডেলিন।'

নিজেকে যেন ফিরে পেয়ে ধমকে উঠলেন স্ক্যানলন, 'কিন্তু এসবের মানে কী, আর এত গোপনীয়তাই বা কেন?'

'গত পাঁচ বছর ধরে শিপগুলোকে এমনভাবে তৈরি রাখা হয়েছে, যেন মুহূর্তের মধ্যে টেক-অফ করতে পারে। আজ রাতে পাহাড়ের একটা পাশ উড়িয়ে দিয়ে, আমরা রওনা দেব শুক্রগ্রহের উদ্দেশে। আজরাতেই। কথাটা এতদিন আপনাকে জানাইনি আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট হবে বলে। আমরা অনেক আগে থেকেই জানতাম যে এমন একটা দিন আসবেই আসবে, যেদিন আমাদের হতে হবে সত্যের মুখোমুখি।'

'বল,' চেঁচিয়ে উঠলেন স্ক্যানলন, 'আমাকে সব জানতে হবে। যখন আমি তোমাদের জন্যে সমঅধিকার আদায় করতে পারব ভাবছি, তখনই তোমরা চলে যেতে চাইছ কেন?'

'আসলে,' করুণ স্বরে বলল ম্যাক্স, 'আপনার সঙ্গে জোহানসনের কথোপকথনের পর বোঝার আর কিছুই বাকি রইল না আমার। যতদিন

পর্যন্ত মানুষ আর মঙ্গলবাসীরা আমাদের তাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব বলে ভাবা ছাড়বে না, ততদিন তারা আমাদের অবহেলা আর ঘৃণা করবেই। আপনি জোহানসনকে বলেছেন যে শেষমেষ মানুষের হাত থেকে কর্তৃত্ব আসবে আমাদের হাতে। এরপর তাদের পক্ষে আমাদের সহ্য করা আর সম্ভব নয়। তাই, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার আগেই আমরা চলে যেতে চাই।'

ম্যাক্সের কথার সত্যতা বুড়ো মানুষটিকে যেন ধাক্কা দিল রীতিমত। 'না, না, এক্ষুণি জোহানসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আমার। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকলে আমরা দু'জনে মিলে হয়তো তা রোধ করতে পারব।'

'ওহ্ ম্যাক্স,' ছলছল চোখে বলে উঠল মেডেলিন, 'সরাসরি না বলে তুমি কথা এত প্যাঁচাচ্ছ কেন? আমরা আপনাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, ফাদার। শুক্রগ্রহে একটা জায়গা বেছে নিয়ে, অফুরন্ত সময় ব্যয় করে, নিজেদের উন্নতি করতে পারব আমরা। গড়ে তুলতে পারব আপন জাতি, কেউ যার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সেখানে কেউ আমাদের দিকে তাকাবে না বাঁকা চোখে, আমরা হব স্বাধীন, কারো ওপরে আর নির্ভরশীল—'

হঠাৎ স্ক্যানলনের দিকে তাকিয়ে কথা হারিয়ে গেল ওর, মুখ ঝুলে পড়েছে, একেবারে যেন ভেঙে পড়েছেন বুড়ো মানুষটি। 'না,' বললেন তিনি ফিসফিস করে, 'না! এটাই আমার জায়গা, আমার আপন জাতির জায়গা। যাও, বাছারা, গড়ে তোল নিজেদের জাতি। তোমাদের বংশধরেরাই একদিন সৌরজগত শাসন করবে। কিন্তু আমি কিছুতেই যাব না, আমি এখানেই থাকব।'

'তাহলে আমিও থাকব,' বলল ম্যাক্স। 'আপনার বয়স হয়েছে, আপনার দেখাশোনার জন্যে কাউকে দরকার। জীবন দিয়েও যে আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না।'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ালেন স্ক্যানলন, 'আমার কাউকে দরকার নেই। ডেটন এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানে যাই কিংবা অন্য কোথাও, যত্নের অভাব হবে না আমার। কিন্তু, ম্যাক্স, তোমার জাতির তোমাকে ভীষণ দরকার। তুমিই যে ওদের নেতা। যাও!'

টুইনিটাউনের নির্জন রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করছেন স্ক্যানলন। ঘটনাটা মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে তাঁর পক্ষে। মাত্র গতকালই উন্নতির শিখরে ওঠা শহরটির চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হল, আর আজই তা পরিণত হয়েছে একটা ভুতুড়ে শহরে।

তবুও, আশ্চর্যজনকভাবে, কীসের যেন একটা উল্লাস অনুভব করছেন। স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তাঁর, কিন্তু সেটাই যেন খুলে দিয়েছে তিনি, তাই একদিন অবশ্যই স্মরণীয় হবেন একটি সুপার-রেস-এর উদ্ভাবক হিসেবে।

আর এই সুপার-রেসই একদিন সৌরজগত শাসন করবে। অ্যাটমিক পাওয়ার, গ্র্যাভিটি নালিফায়ার—অকিঞ্চিৎকর সব আবিষ্কার তাঁর। উন্নততর এই জাতিই মহাবিশ্বকে দেয়া তাঁর একমাত্র খাঁটি উপহার।

অনুবাদ : খসরু চৌধুরী

গুডবাই আর্থ

এই বিশেষ বার্তাটা আমি পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি তাদের সতর্ক করার প্রচেষ্টা হিসাবে। যে কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, আমার ধারণা যেটা অবশ্যই ঘটবে, তারই বর্ণনা পাঠাচ্ছি। ভাবতেও দুঃখ লাগছে যে আমাদের সামনে কী অপেক্ষা করছে। কেউই সেটা নিয়ে আলোচনা করছে না অথচ তা নিয়ে কার না কার চিন্তা করা উচিৎ, যাতে পৃথিবীর মানুষ সব রকম ভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

একুশ শতকের শেষ অর্ধে এসে কক্ষপথে উপনিবেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বারোটি যা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এর প্রত্যেকটাই এক একটা ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী। সবচেয়ে ছোটটার অধিবাসীর সংখ্যা দশ হাজারের মতো আর বড়টাতে বাস করে প্রায় পঁচিশ হাজার বাসিন্দা। আমি নিশ্চিত পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এসব জানে। কিন্তু তোমরা পৃথিবীবাসী নিজেদের বিশাল পৃথিবী নিয়ে এতই মশগুল যে মহাকাশে আমাদের মতো ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ের কথা কদাচিৎ মনে পড়ে।

প্রত্যেকটা উপনিবেশই পৃথিবীকে যথাসম্ভব অনুকরণ করে চলেছে। কৃত্রিম মহাকর্ষ তৈরি করার জন্য ঘুরে চলেছে নিজের অক্ষের উপর, দিন-রাত্রি নির্ধারণের জন্য সূর্যের আলোকে নির্দিষ্ট সময় প্রবেশ করতে দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রত্যেকটাতে খামার বা কারখানা বসানর জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে। এমন একটা আবহাওয়ামণ্ডলী তৈরি করা হয়েছে যাতে মেঘ প্রস্তুত হয়। সেখানে আরো আছে শহর, স্কুল আর অ্যাথলেটিকের মাঠ।

আমাদের এমন কিছু আছে যা পৃথিবীর নেই। প্রত্যেক উপনিবেশেই কৃত্রিম মহাকর্ষ বলের তীব্রতা এক এক জায়গায় এক এক রকম। এখানে খুব কম তীব্রতার মহাকর্ষ বল এমন কি কোনো কোনো জায়গা আছে যেখানে

মহাকর্ষ বলই নাই। সেখানে আমরা নিজেদের মতো ডানা লাগিয়ে উড়তেও পারি। আবার সেখানে খেলতে পারি ত্রিমাত্রিক টেনিস। এছাড়াও সেখানে প্রচলিত জিমন্যাসটিকও অনুশীলন হয়ে যায়।

এখানে আমরা একটা প্রকৃত মহাশূন্য সভ্যতায় অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছি। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে একাধারে আমাদের উপনিবেশটাকে সুদক্ষভাবে পরিচালিত করা আর সেই সাথে পৃথিবী আর আমাদের নিজেদের জন্য মহাশূন্যে কাঠাম প্রস্তুত করা। আমরা মহাশূন্যে কাজ করতে করতে এমন হয়েছে যে মহাকাশযান বা স্পেসস্যুট আমাদের দ্বিতীয় সত্তা বলা চলে। শূন্য মহাকর্ষে কাজ করার অভ্যেস আমাদের সেই ছোটবেলা থেকে।

আবার অন্যদিকে পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যা আমাদের নেই। পৃথিবীর মতো আমাদের এখানে আবহাওয়ার তীব্র রূপ নেই। আমাদের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত, প্রচণ্ড শীতও যেমন পড়ে না আবার অসহ্য গরমের কষ্টও নেই। এখানে নেই ঝড়ের তাণ্ডব, বৃষ্টি পড়ে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলিতভাবে যা আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রিত।

এমনকি আমাদের পৃথিবীর মতো বিপদসঙ্কুল ভূখণ্ড নেই। নেই পাহাড়, নেই খাড়াই, জলাভূমিও যেমন নেই সেরকম নেই মরুভূমি। আমাদের এখানে বিপজ্জনক গাছপালা নেই, নেই ভয়ানক প্রাণী বা ক্ষতিকর পরগাছা। কেউ কেউ যেটা অভিযোগ করে সেটা হল এখানে জীবন এত নিরাপদ যে কোনো অ্যাডভেঞ্চারই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তারপরও আমরা নিয়ত মহাকাশে যাতায়াত করি, সেই সুদুর মঙ্গল গ্রহ থেকে শুরু করে এস্টেরয়েড পর্যন্ত। যেটার জন্য পৃথিবীবাসীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত না। আসল কথা হচ্ছে কিছু উপনিবেশবাসী মঙ্গল গ্রহে বসবাসের জায়গা আর এস্টেরয়েড গ্রহাণুগুলোতে খনি খোঁজার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু তা কোনোদিনই সফল হবে না, কেন সেটাই আমি বর্ণনা করছি।

এই উপনিবেশগুলোর উৎপত্তি মানবসভ্যতার অজান্তে হঠাৎ করে হয়নি। এমনকি মাত্র এক শতাব্দি আগে প্রিন্সটনের জরার্ড ওনীল আর তার ছাত্ররা প্রথম মানব জাতির জন্য নতুন বসতি স্থাপনের এই পরিকল্পনা করে। তবে বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর লেখকরা বেশ আগেই এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিল।

যদিও শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগছে কিন্তু উপনিবেশে যেসব সমস্যা হতে পারে বলে সবাই মনে করেছিল তার সমাধান হয়ে গেছে অথচ নেমে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন এক বিপর্যয়। এসব তৈরি করার খরচ, স্থাপনের সমস্যা, পৃথিবীর মতো আবহাওয়া পরিমণ্ডল, শক্তি সঞ্চয় করা, কসমিক রে থেকে রক্ষা করার বিষয় সবই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো খুব সহজে করা যায়নি যদিও, তবে করা সম্ভব হয়েছে।

সূর্য থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা পাচ্ছি, এমন কি অতিরিক্ত শক্তি আমরা পৃথিবীতেও পাঠাতে পারছি। আমরা আমাদের প্রয়োজনের বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারি, সেভাবেই উদ্বৃত্ত যেটা সেটা পাঠিয়ে দেই পৃথিবীতে। মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের এখানে আছে খরগোশ আর মুরগির মতো ছোট ছোট প্রাণী। আমাদের ধাতু আমরা যোগাড় করি মহাশূন্য থেকে। শুধু চাঁদই এর উৎস না, উল্কা এবং ধূমকেতু থেকেও কায়দা করে এ সব সংগ্রহ করা হয়। আর একবার যখন আমরা এস্টেরয়েডে পৌঁছে যাব (অবশ্য যদি পৌঁছাতে পারি) তখন বাস্তবিকই আমাদের কোনো কিছুর আর অভাব হবে না।

অথচ কেউ কেউ আশংকা করছে এমন এক দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার বিষয় যা সত্যিই আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা দাঁড়িয়েছে টিকে থাকার মতো পরিবেশ বজায় রাখা। প্রত্যেক উপনিবেশ নিজেই নিজে খেয়াল রাখছে। এখানে রয়েছে মানুষ, গাছ, প্রাণী। এ ছাড়াও এতে রয়েছে বাতাস, পানি আর মাটি। প্রতিটা জীবিত জিনিসের সংখ্যাই গুণিতক হারে বেড়ে চলেছে এবং অবশ্যই পরিসংখ্যান রেখে। কিন্তু এই সংখ্যা কোনোমতেই উপনিবেশের ধারণ ক্ষমতার বাইরে যায় না।

আচ্ছা উদ্ভিদ আর প্রাণী না হয় আমরা নিয়ন্ত্রণ করলাম। আমরা না হয় তদারকী করে তাদের জন্মের হার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখলাম। কিন্তু মানুষের বেলায় সেটা কোনো ভাবে সম্ভব না। মানুষের জন্মের হার কখনই মৃত্যুর হারকে ছাড়িয়ে যেতে দেয়া যাবে না। সেই সাথে মৃত্যুর হার যত কম রাখা যায় সব সময় আমরা সেই চেষ্টাই করে যাই। আর এটাই এখানে পৃথিবীর তুলনায় যৌবনহীন একটা সমাজ তৈরি করেছে। এখানে খুব কম সংখ্যক যুবকের দেখা পাওয়া যায়। বেশিরভাগই বয়স্ক বা প্রায় বয়স্ক মানুষ। এটা

এখানে এক ধরনের মানসিক চাপের সৃষ্টি করছে। কিন্তু উপনিবেশবাসীদের ধারণা এই চাপের ফলে তারা সমৃদ্ধ হয়েছে। কেননা এখানে যেমন রয়েছে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা সেই সাথে নেই কোনো গৃহহীন, দারিদ্র বা অসহায় মানুষ।

আবার পানি, বাতাস এবং খাদ্য খুব সাবধানতার সাথে রিসাইকেল করা হচ্ছে। আমাদের প্রযুক্তির বেশিরভাগ একান্তভাবে নিয়োজিত ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহার উপযোগী করার জন্য আর শরীর নিসৃত বর্জ্য পদার্থ থেকে পরিষ্কার সার তৈরি করার জন্য। রিসাইকেল প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত এমন কথা বলা যাবে না। এমন কি সব কিছু ঠিকঠাক মতো চললেও আমরা যখন কিছু খাই বা পান করি সেগুলো কিছুটা অরুচিকর লাগেই। পৃথিবীতেও সবকিছু রিসাইকেল হচ্ছে, কিন্তু সেখানে এত বিশাল জায়গা, তাছাড়া প্রাকৃতিক রিসাইকেল পৃথিবীর জন্য এতই অনুল্লেখযোগ্য যে তা মানুষের অলক্ষেই হয়ে যায়।

এ ছাড়াও একটা বড়সড় উল্কা যে কোনো মুহূর্তে উপনিবেশের বাইরের খোলসে আঘাত করে ক্ষতি করতে পারে। ছোট একটা বস্তু তার আকার নুড়ির মতো হলেই যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে, আর মোটামুটি এক ফুটের মতো যে কোনো বস্তু উপনিবেশের যে কোনোটাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অবশ্য সৌভাগ্যের কথা এই ধরনের ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। নিরাপত্তার জন্য এই সব উল্কাপিণ্ড আমাদের কাছে পৌঁছাবার আগেই এদের খুঁজে বের করে গতি পরিবর্তন বা ধ্বংস করে দিতে হবে। আশা করছি এই পদ্ধতি শিঘ্রিই আমরা শিখে ফেলব। তাতে করে আমাদের নিরাপত্তার যে বাড়াবাড়ি আর তার জন্য সবার যে অভিযোগ তা প্রশমিত হয়ে যাবে।

মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা আর যদি অক্লান্ত পরিশ্রম করা যায় তাহলেই আমরা আমাদের পরিবেশ ঠিক রাখতে পারি।

প্রতিটা উপনিবেশই এমন কোনো না কোনো জিনিস তৈরি করে যা অন্য উপনিবেশের লোকজন পেতে চায়। সেই সব জিনিসের মধ্যে তা খাবারই হোক আর শিল্পকর্মই হোক তাতে থাকে দক্ষতার ছাপ। আমরা এগুলো দিয়ে পৃথিবীর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়তে পারি, আমাদের ইচ্ছা আসলে এই সুযোগ পৃথিবীতে ঘুরতে যাওয়া আর সেখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলো দেখা। পৃথিবীর মানুষ চিন্তাই করতে পারবে না নীল দিগন্ত রেখা, সত্যিকার সমুদ্র

বা বরফের চূড়াওয়ালা পাহাড় দেখার জন্য আমরা কেমন ব্যাকুল হয়ে থাকি।

তাতে করে পৃথিবী আর উপনিবেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত চলতেই থাকবে। প্রত্যেক উপনিবেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ভারসাম্য আছে, অবশ্য পৃথিবীতেও তাই, কিন্তু এই দিনেও উপনিবেশগুলোর আবহাওয়ামণ্ডলী পৃথিবীর মতো এত উন্নত স্তরে পৌছান সম্ভব না।

আমাদের নিজস্ব কীট-পতঙ্গ রয়েছে যা আমাদের পরিবেশের সাথে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি হঠাৎ করে অন্য উপনিবেশ অথবা পৃথিবী থেকে কোনো আগন্তুক কীট-পতঙ্গ আমাদের এখানে ঢুকে পড়ে তাহলে কি হবে?

উটকো একটা কীট, একটা পোকা বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণী আমাদের পরিবেশ তছনছ করে দিতে পারে যা আসলে আমাদের গাছপালা বা প্রাণীর উপর এক বিরাট হুমকী। ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য আমাদের উপনিবেশের প্রতিটি জিনিস গুনে গুনে রাখতে হয়। বেশি হয়ে গেলে তা ধ্বংস করে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। কোনো কোনো কীট-পতঙ্গ হয়তো তার নিজের উপনিবেশের জন্য নিরীহ আর যদি পৃথিবীতে থাকে তাহলে হয়তো তার ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেলেও কিছু হবে না কিন্তু সেটাই যদি অন্য কোনো উপনিবেশে থাকে তাহলে বিশাল সমস্যা। ফলে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে মাসাধিক কাল সময় লাগিয়ে হলেও শেষ কীটটাকে খুঁজে বের করা হয়।

আরো খারাপ হবে যদি ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা প্রোটজোয়ার মতো সামান্য জিনিসও এখানে ঢোকে, তাহলে? আর যদি এরা রোগবালাই উৎপন্ন করে তাহলে পৃথিবীর নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। অথচ এক উপনিবেশের রোগের আক্রমণ অন্য উপনিবেশের ঠেকানর কোনো ক্ষমতাই নেই।

যদি কখন সেরকম কিছু হয় তাহলে উপনিবেশের সমস্ত শক্তি ব্যয় করা হয় সিরাম তৈরি বা আমদানি করার কাজে যাতে দ্রুত প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান যায়। আর রোগ যদি ছড়ানর মতো পর্যায়ে পৌছেই যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে হয়। তবে হতাহতের ঘটনা পুরোপুরি ঠেকান যায় না।

স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার দাবীতে সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। এর ফলে এক উপনিবেশ থেকে কোথাও গেলে বা অন্য উপনিবেশ থেকে ফেরার সময় ভালো মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া ঢুকতে দেয়া হয় না। তাদের ব্যাগ থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। লুকান কোনো জীবাণুর সংক্রমণ হয় কিনা তা দেখার জন্য কিছুদিন তাদের আলাদা করে রাখা হয়।

তদুপরি ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক তার পরোয়া না করে, উপনিবেশের অধিবাসীরা তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে জেনেও পৃথিবীবাসিদের দেখার জন্য জীদ ধরে। পৃথিবী এমন জায়গা যেখানে মারাত্মক জীবাণু আর পরজীবীর আবাসভূমি। অথচ পৃথিবীবাসিদের সাথেই উপনিবেশবাসিদের বেশি যাতয়াত চলে। সমস্ত উপনিবেশেই এক দল লোক আছে যারা চায় পৃথিবীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং এই দাবী তারা মাঝে মাঝে বেশ তীব্র ভাবেই জানায়।

এই বিপদজ্জনক কথাটাই আমি পৃথিবীবাসিদের জানিয়ে সতর্ক করতে চাই। পৃথিবীবাসিরা উপনিবেশের অধীবাসীদের মনে ধীরে ধীরে এই ভাবে অবিশ্বাস এমনকি ঘৃণার জন্ম দিচ্ছে।

যতক্ষণ পৃথিবী থেকে আমাদের দূরত্ব কয়েক শ বা কয়েক হাজার মাইল ততক্ষণ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হাস্যকর। পৃথিবীর প্রতি লোভ বা পৃথিবীর আকর্ষণ প্রবল। সুতরাং এখন সবাই বলাবলি করছে, যদিও এখন তা কানাঘুষার মতো কিন্তু অচিরেই তা জোরে-সোরে শুরু হবে, আর সেটা আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি সেটা হল এই সৌরজগত ছেড়ে যাওয়ার কথা।

প্রতিটি উপনিবেশে মাইক্রোফিউশান মটরের মাধ্যমে পরিচালনা প্রযুক্তির সাজসরঞ্জাম রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সৌরজগতের মধ্যে রয়েছি ততক্ষণ পর্যাপ্ত সৌরশক্তি আমরা পাচ্ছি, কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হলে সূর্য দূরে চলে যাবে ফলে তা দিয়ে তখন আমাদের আর কাজ হবে না। তখন আমরা হাইড্রোজেন ফুয়েলের জন্য ছোট ছোট ধূমকেতু ধরে কাজ চালাব।

তখন প্রতিটি উপনিবেশ পৃথিবীকে বিদায় জানাবে। তখন এগুলো তারাদের মাঝে অকল্পনীয় শূন্যতার মাঝে এক একটা স্বাধীন জগৎ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আর কে জানে হয়তো একদিন, হতে পারে লক্ষ বছর পরে কোনো একটা উপনিবেশ পৃথিবীর মতো কোনো একটা জগৎ খুঁজে পাবে। হয়তো খালি অবস্থায় পড়ে আছে যেখানে সেটা জনবসতি গড়তে পারবে।

কিন্তু পৃথিবীকে আমি যে ব্যাপারে সতর্ক করতে চাই তা হল উপনিবেশগুলো একদিন তাদের ত্যাগ করে চলে যাবে। তোমরা যদি আবার এ ধরনের উপনিবেশ আবার তৈরি কর তাহলে আবার তারা তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে। আর এইভাবে তোমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়াদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং তারা সারা গ্যালাক্সি জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের এটুকুই সান্তনা যে এখান থেকে চলে গিয়ে তারা সারা গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনুবাদ: সাজ্জাদ কবীর

লেট'স নট

অধ্যাপক চার্লস কিটরেজ লম্বা পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সহযোগী অধ্যাপক হেবার ভ্যানডারমিরের ঠোঁটে ছোঁয়ান গ্লাসটা ঠেলে ফেলে দেয়া। টলমলভাবে তাঁর এই দৌড়ে আসার দৃশ্যটা অনেকটা স্লোমোশনে ব্যায়াম করার মতো দেখাচ্ছিল।

ভ্যানডারমির নিজের কাজে এতটা মগ্ন ছিলেন যে কিটরেজের দৌড়ে আসার ধুপধাপ শব্দ শুনতে পাননি। প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপর তাকালেন লজ্জিতভাবে। তাঁর দৃষ্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া গ্লাসটার দিকে ও মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া তরল পদার্থের দিকে।

'কী ছিল ওতে?' ভ্যানডারমিরের হাতটা জোরে চেপে ধরে প্রশ্ন করলেন কিটরেজ।

'পটাশিয়াম সায়ানাইড। আমরা চলে আসার সময় কিছুটা সাথেও করে নিয়ে এসেছিলাম। যদি তেমন কিছু...'

'ওটা কী আর সাহায্য করবে? এক গ্লাসতো চলেই গেছে। এখন এটা পরিষ্কার করা দরকার...না, আমি করছি।'

কিটরেজ কার্ডবোর্ডের খণ্ড অংশ দিয়ে কাচের টুকরোগুলো তুললেন, কাপড়ের টুকরোতে মুছলেন বিষাক্ত তরলটুকু। তারপর বিষণ্ন মনে কার্ডবোর্ড ও কাপড় একটা ঢালুপথে ছুড়ে দিলেন, আধ মাইল দূরে গিয়ে পড়ল ওগুলো।

ভ্যানডারমিরের দিকে ঘুরে তাকালেন কিটরেজ। ভ্যানডারমির বসেছিলেন ছোট্ট একটা খাটে, তাঁর চোখ দুটো দেয়ালের দিকে। পদার্থবিজ্ঞানীর চুল পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে, ওজনও কমে গেছে অনেক।

আশ্রয়স্থলে কোনো মোটা মানুষ নেই। কিটরেজও বদলে গেছেন, এক সময়ের এই মানুষটাকে এখন লম্বা, পাতলা ও ধূসর দেখাচ্ছে।

ভ্যানডারমির বললেন, 'পুরোন দিনগুলোর কথা স্মরণ করো, কিট।'

'আমি স্মরণ করতে চাই না।'

'কী আনন্দের দিন ছিল,' বললেন ভ্যানডারমির। 'স্কুলগুলো ছিল স্কুলের মতোই। সেখানে শ্রেণীকক্ষ ছিল, যন্ত্রপাতি ছিল, ছাত্ররা ছিল, বাতাস ছিল, আলো ছিল, আর ছিল মানুষেরা। অনেক মানুষ।'

'একটা স্কুলের মতো স্কুলে এখন রয়েছে একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্র।'

'প্রায় ঠিক বলেছ,' কাতর স্বরে বললেন ভ্যানডারমির। 'দু'জন শিক্ষক রয়েছে। তুমি, রসায়নের, আমি, পদার্থবিজ্ঞানের। আমরা দু'জন, বইয়ের বাইরে সব কিছু শেখাতে পারি। আর রয়েছে একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। সে-ই প্রথম মানুষ যে এখানে পি এইচ ডি করেছে। সম্পূর্ণ অন্যভাবে। বেচারা জোনস।'

কিটরেজ তাঁর হাতদুটো ভ্যানডারমিরের পিঠে রাখলেন সান্তনা দিতে। বললেন, 'অন্য কুড়িজন বালক বালিকা আছে যারা কোনো একদিন গ্র্যাজুয়েট হবে।'

চোখ তুলে তাকালেন ভ্যানডারমির। তাঁর মুখটা ধূসর দেখাচ্ছিল। 'ইতোমধ্যে আমরা কী শেখাব তাদের ? ইতিহাস ? মানুষ কীভাবে হাইড্রোজেন দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় আর সেই বিস্ফোরণে কতটা খুশি হয় ? জিওগ্রাফি ? আমরা বর্ণনা করতে পারি কীভাবে বাতাস সবখানের উজ্জ্বল ধুলোবালিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর পারি বিদ্যুৎ দ্রবীভূত আইসোটোপগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের সমস্ত গভীর ও অগভীর স্থানে।'

কিটরেজ এটাকে খুব কঠিনভাবে দেখলেন। তিনি এবং ভ্যানডারমির ছিলেন একমাত্র যোগ্য বিজ্ঞানী যারা সময়ের ভেতর দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। শত শত পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে তাঁরা পৃথিবীর বিপজ্জনক বুক থেকে পালিয়ে এসে এখানে গ্রহের স্তরের আধ মাইল নিচে সৃষ্টি করেছিলেন এই জীবনের পরিকল্পনা।

মরিয়া হয়ে ভ্যানডারমিরকে সাহস দেবার চেষ্টা করলেন কিটরেজ। বললেন, 'তুমি জান তাদের কী শেখাতে হবে। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞানকে চালু রাখব যাতে কোনো একদিন আমরা পৃথিবীতে মানুষের পুনর্বাসন করতে পারি। সবকিছু শুরু করতে পারি নতুন করে।'

ভ্যানডারমির কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর মুখটা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখলেন।

কিটরেজ বললেন, 'কেন নয়? এমনকি তেজস্ক্রিয়তাও চিরকালের জন্যে স্থায়ী হয় না। হাজার বছর, পাঁচ হাজার বছর থাকতে দাও এটাকে। কোনো একদিন পৃথিবীর পৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় মাত্রা সহনীয় মাত্রায় নেমে আসবে।'

'কোনো একদিন।'

'অবশ্যই। কোনো একদিন। তুমি দেখনি আমরা এখানে মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কুল বানিয়েছি? যদি আমরা সফল হই, তুমি আর আমি, আমাদের বংশধররা মুক্ত আকাশে ঘুরবে, আবার ভিজবে বৃষ্টিতে। তাদের সব কিছুই থাকবে,' কষ্ট করে হাসলেন তিনি। 'গ্র্যাজুয়েট স্কুলগুলো সেরকম করেইতো তৈরি করেছি।'

ভ্যানডারমির বললেন, 'আমি এসবের কিছুই বিশ্বাস করি না। প্রথমত মৃত্যুর চেয়ে যখন এটাকে আমার কাছে উৎকৃষ্ট মনে হবে, কেবল তখনই আমি যে কোনো কিছু বিশ্বাস করব। কিন্তু এখন, এতে কিছুই বোঝা যায় না। তাই আমরা যা জানি তার সব কিছুই তাদের শেখাব প্রথম থেকে শেষ, আর তখন আমরা মারা যাব...এখানে।'

'কিন্তু তার আগে জোনস আমাদের কাছ থেকে শিখতে থাকবে, এবং তারপর শিখতে থাকবে অন্যেরা। বালক-বালিকাদের মধ্যে বড়জোর যারা পুরান পদ্ধতিগুলো মনে রাখতে পারবে তারা শিক্ষক হবে, আর তারপর যেসব বালক বালিকা এখানে জন্ম নেবে তারা শিখবে। এটা হবে সংকটপূর্ণ বিষয়। যদি কারো জন্ম নিয়ে অভিযোগ করা হয়, মনোবল ধ্বংস করার মতো কোনো স্মৃতি থাকবে না। এই হবে তাদের জীবন। তারা সংগ্রাম করে যাবে। কোনো কিছুর জন্যে তারা যুদ্ধ করে যাবে...একদিন জয় করবে সমগ্র বিশ্ব। যদি, ভ্যান, যদি আমরা গ্র্যাজুয়েট লেভেলে শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু বাঁচিয়ে রাখি। সেটা কেন, তুমি তা বুঝতে পেরেছ? পারনি?'

'অবশ্যই বুঝতে পেরেছি,' বিরক্তির সাথে বললেন ভ্যানডারমির। 'কিন্তু সেটা করা সম্ভব হবে না।'

'হাল ছেড়ে দিলেই এটা অসম্ভব হবে। আমি নিশ্চিত সব কিছুই সম্ভব।'

'বেশ, চেষ্টা করব আমি,' ফিসফিস করে বললেন ভ্যানডারমির।

কিটরেজ তার নিজের ছোট্ট খাটটার দিকে এগোলেন, বন্ধ করলেন চোখ দুটো, তারপর তীব্রভাবে আশা করলেন যে তিনি পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর তার সুরক্ষাকর কক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন। মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। এক মুহূর্তের জন্যে। তিনি নভোযানের পাশে এসে দাঁড়ালেন, যে নভোযানটার ভেতরের যন্ত্রগুলো খুলে ফেলে সেখানে জীবন সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছে। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল তখন। সেদিকে একবার নিজের মনোবলকে জাগিয়ে তুললেন তিনি। তারপর মঙ্গলের হালকা, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে তাকালেন দূরের মিট মিট করে জ্বলা মৃত সন্ধ্যা তারাটির দিকে। ওটা ছিল পৃথিবী।

অনুবাদ: মিজানুর রহমান কল্লোল

এ লয়েন্ট অব প'

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না যে মন্টে স্টেইন খুব কৌশলে প্রতারণার সাহায্যে লাখ খানেক ডলারের বেশি চুরি করেছিল। এই বিষয়েও কোনো প্রশ্ন নেই যে তাকে পাকড়াও করা হয়েছিল স্ট্যাচূ অব লিমিটেশন পার হবার ঠিক একদিন পরে। এই বিশেষ পন্থাতেই সে তার গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াত। আর এর ফাঁকে নিউ ইয়র্ক রাজ্য বনাম মন্টগোমেরি হারলো স্টেইনের যুগান্তকারী কেসটাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই বিশেষ কেসটার ফলে আইনেও চতুর্থমাত্রার বিষয়টা বিবেচনায় আনা শুরু হয়।

প্রতরণা করার পর যখন মন্টের হাতে লাখ খানেকের মতো মালপানি এসে গেল তখন সে খুব ঠাণ্ডা মাথায় একটা টাইম মেশিনে গিয়ে ঢুকল, যেটাও অবশ্য অন্যায় পথেই যোগাড় করা, তাতে উঠে সে ঠিক সাত বছর একদিন পরের একটা তারিখে যাবার জন্য মেশিনটাকে চালু করে দিল।

স্টেইনের উকিল বিষয়টাকে খুব সহজ ভাবেই উপস্থাপন করল যে সময়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আর স্থানের মধ্যে লুকিয়ে থাকার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এখন যদি আইনের থাবা সাতটা বছরের মধ্যে স্টেইনকে ধরতে না পারে তবে সেটা তাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

ডিস্ট্রিক এটর্নি অবশ্য বোঝানর চেষ্টা চালায় যে আইন আর অপরাধীর মধ্যে কোনো খেলা খেলার জন্য স্ট্যাচূ অব লিমিটেশনের ব্যাপারটা চালু করা হয়নি। এটা একটা ক্ষমা প্রদর্শনমূলক আইন যার ফলে কোনো অপরাধী সারাটা জীবন ধরে গ্রেফতার হবার ভয়ে পালিয়ে বেড়ানর হাত থেকে বাঁচতে পারে। কোনো কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় গ্রেফতারে উৎকণ্ঠায় থাকাটাই যথেষ্ট শাস্তি বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু স্টেইনের বেলা ? তাকে তো এক মুহূর্তের জন্যও উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়নি।

স্টেইনের আইনজীবী তার মন্তব্য অনড় থাকেন। আইনে অপরাধীর মানসিক পীড়ন পরিমাপের কোনো মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয়া নেই। ওখানে শুধু একটা সময়ের উল্লেখ করা আছে। সে সময় পার হয়ে গেছে।

সরকারি আইনজীবী বলে যে স্টেইন সেই সময় সীমার মধ্যে দিয়ে পার হয়নি। বিবাদী পক্ষের উকিল জানায় যে স্টেইনের বয়স ঘটনা ঘটার সময়ের চেয়ে সাত বছর বেশি কাজেই সে সময় সীমার মধ্যে দিয়েই অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। সরকারি আইনজীবী এই কথাটা মানতে রাজি না হলে বিবাদী উকিল স্টেইনের বার্থ সার্টিফিকেট এনে হাজির করে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তার জন্ম হয়েছে ২৯৭৩ সালে। অপরাধ সংঘটিত হবার সময় অর্থাৎ ৩০০১ সালে তার বয়স ছিল একত্রিশ বছর। এখন ৩০১১ সালে তার বয়স আটত্রিশ।

সরকারি উকিল লাফ দিয়ে ওঠেন, স্টেইন শারীরিকভাবে আটত্রিশ বছরের নয় বরং একত্রিশ বছরের।

বিবাদী উকিল কোনো বিবাদে না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় শুধু আইনটা মনে করিয়ে দেন যে কাউকে একবার মানসিক ভাবে সক্ষম প্রমাণের জন্য তার বয়স বের করা হয় বর্তমান তারিখ থেকে তার জন্ম তারিখটাকে বিয়োগ করে।

সরকারি আইনজীবী অস্থির হয়ে বলা শুরু করেন যে আজ যদি স্টেইনকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হয় তবে আইন গ্রন্থের অর্ধেক আইনই অর্থহীন হয়ে পড়বে। বিবাদী উকিল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন, 'বেশ তো তাহলে সময় পরিভ্রমণকে আওতাভুক্ত করার জন্য পুরাতন আইন বদলে ফেলুন। তবে কিনা যতক্ষণ নাকি সেটা না হচ্ছে ততক্ষণ অন্তত আইন মতোই বিচার করুন।'

জর্জ নেভিল প্রেসটন এক সপ্তাহের সময় নিলেন চূড়ান্ত রায় দেবার আগে। এটা ছিল আইনের ইতিহাসের জন্য এক বিশেষ ক্রান্তিকাল। যদিও এখানে দয়া দেখান হয়েছিল তবু অনেকেই মনে করে যে জর্জ প্রেসটন তার রায়টা দেবার আগে আবেগের তাড়নায় যথেষ্ট দোলাচালে ভুগেছিলেন।

যার ফলে তার রায় পুরোটা ছিল

'সময়ের গায়ে একটা কুলুঙ্গি স্টেইনকে বাঁচিয়ে দিল।'

অনুবাদ: আসরার মাসুদ

টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এন্ড থার্টি এ. ডি.

শেষ রাতের দিকে যখন ঘুম আসে না, পুরান সব ক্ষতগুলোতে জ্বালা শুরু হয়, আমি তখন প্রায়ই ভবিষ্যৎ পৃথিবী নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন। সবারই নম্বর রয়েছে, রেজিস্ট্রেশন রয়েছে, কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিভার চিহ্ন নেই, কোথাও কোনো সত্যিকারের মন নেই, একটি মানুষেরও নেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, গোটা পৃথিবী জুড়ে একই অবস্থা।

—জে. বি. প্রিস্টলি

'সে কথা বলবে আমাদের সাথে,' বান্টিং দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই বলল আলভারেজ।

'ভালো,' বলল বান্টিং। 'সামাজিক চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত সে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। আজব এক চরিত্র। কি করে সেসব জেনেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট এড়িয়ে চলেছে, কখনো জানতে পারব না আমি। তবে কথা যা বলার আপনি বলবেন। আগের বার সে বিরক্ত করে মেরেছে আমাকে।'

এক্সিকিউটিভ ট্রেইল বরাবর করিডর ধরে নেমে এগোল দু'জন। এ পথে কাদাচিৎ পা পড়ে কারো। ইচ্ছে করলে তারা মুভিং স্ট্রিপ্স বা চলন্ত ফিতে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আলভারেজ হাঁটতে পছন্দ করে বলে আর অমত করেনি বান্টিং। মাত্র মাইল দুয়েকের পথ—এ আর এমন কি।

আলভারেজ দীর্ঘদেহী, একহারা গড়ন। বলা যায়, অ্যাথলেটিক ফিগার। তার চালচলনও তেমন। আয়েশী যান্ত্রিক সুবিধে এড়িয়ে কায়িক পরিশ্রমটা বেশি করে থাকে। যেমন—সিঁড়ি ভেঙে ওঠা নামা, র‍্যাম্পওয়ে ধরে চলা। সবসময় নড়াচড়ার ভেতরেই আছে সে, এদিকে বান্টিং তার বিপরীত। নাদুসনুদুস গোলগাল গড়ন তার। বলতে গেলে কুঁড়ের হদ্দ।

সূর্যের আলো পর্যন্ত গায়ে লাগায় না। ফলে চেহারা সুরতে প্রকট হয়ে উঠেছে ফ্যাকাশে ভাব।

বান্টিং এক ধরনের চাপা কষ্ট নিয়ে বলল, 'আমি মনে করি, আমরা দু'জনই এজন্যে যথেষ্ট।'

'আমারও তাই মত। যদি পারি, আমাদের সেক্টরে রেখে দেব এটাকে।'

'হ্যাঁ! আপনি জানেন, আমিও চিন্তাভাবনা করছি—আমাদের সেক্টরে এটাকে রাখতে হবে কেন? সাতশ' লেভেলের বসবাসের জায়গার ভেতর পঞ্চাশ মিলিয়ন বর্গমাইল জুড়ে তৈরি হবে অ্যাপার্টমেন্টগুলো।'

'বিশাল একটা কাজ হবে বটে,' বলল আলভারেজ।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল বান্টিং।

'যদি কাজটা আমরা করতে পারি,' নরম গলায় বলল আলভারেজ। 'তাহলে ক্রেডিট বাড়বে আমাদের। একদম ওপরে উঠে যাব আমরা। পৌঁছে যাব শেষ প্রান্তে। এসে যাব গন্তব্যে। শুধু আমরা নই, সকল মানুষ। এবং আমরা করব এটা।'

চোখমুখ উজ্জ্বল হল বান্টিংয়ের। বলল, 'আপনি ভাবছেন, তারা ঠিক সেভাবে দেখবে ব্যাপারটাকে?'

'ব্যাপারটাকে তো আমাদের সেভাবেই দেখতে হবে।'

পায়ে চলা পথটা টুকরো পাথর দিয়ে গড়া। টুকরোগুলো আবার আঁটো করে বাঁধা হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে। ফলে হাঁটার সময় শব্দ হচ্ছে না। মাঝামাঝি দূরত্বে এসে ক্রসকরিডর পেরোবার সময় মুভিং স্ট্রিপগুলোতে অগণিত মানুষের ভিড় দেখতে পেল দু'জন। ফোঁস ফোঁস বাতাসে ভেসে আসছে নানারকম গন্ধ। সহজাত অনুভূতি থেকেই বলে দেয়া যায় কোন গন্ধটা কিসের।

তাদের গন্তব্য হচ্ছে একটা আবাসিক রুম। করিডরের একদম শেষ মাথায় ঘরটা। হাজার হাজার যে ঘরগুলো তারা পেরিয়ে এসেছে, সেগুলোর চেয়ে অন্যরকম এই রুমটা। বাতাসে কেমন একটা গন্ধ।

'গন্ধটা পাচ্ছ?' বিড় বিড় করে বলল বান্টিং।

'আগেই গন্ধটা শুঁকেছি আমি,' বলল আলভারেজ। 'অমানবিক।'

'আক্ষরিক অর্থেই!' বলল বান্টিং। 'ওদের দিকে আমরা তাকাই, এটা চায় না সে। বলুন, চায়?'

'সে যদি চাইত, তাহলে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত।'

সঙ্কেত পাঠিয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জন। চার পাশে অগণিত মানুষের সীমাহীন গুঞ্জনের মাঝে দু'জন যেন উপেক্ষিত। এখানে সবসময় এরকম একটা ভাব থাকেই।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে অপেক্ষা করছে ক্র্যানউইৎজ। গোমড়া দেখাচ্ছে তাকে। ক্র্যানউইৎজের কাছে তাদের দু'জনকে যেমন বিধ্বস্ত লাগছে, তেমনি ক্র্যানউইৎজকেও উস্কোখুস্কো লাগছে তাদের কাছে।

সব সময় একই পোশাকে ক্র্যানউইৎজকে দেখে আসছে তারা। হালকা ধূসর রঙের কাপড় পরে সে। মাথার চুল একটু বেশি রকমের বড়। তার লালচে চোখ দুটোতে অস্থিরতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। ঘন ঘন নড়ছে চোখের মণি।

'আমরা ভেতরে আসতে পারি ?' শীতল সৌজন্য আলভারেজের।

দরজার একপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ক্র্যানউইৎজ।

ভেতরে গন্ধটা আরো প্রকট। দরজটা বন্ধ করে দিল ক্র্যানউইৎজ। তারা দু'জন বসল গিয়ে চেয়ারে। ক্র্যানউইৎজ বসল না। দাঁড়িয়ে রইল এক ঠাঁয়। মুখে কথা নেই তার।

আলভারেজ বলল, 'সেক্টর প্রতিনিধি হিসেবে আমার সাধ্য অনুযায়ী আর্জি নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। সাথে উপ-প্রতিনিধি বান্টিংও আছে। তা—আপনি সামাজিক প্রয়োজনের সাথে একাত্ম হতে রাজি কিনা, বলুন।'

ক্র্যানউইৎজ-এর চেহারা দেখে মনে হল, চিন্তা করছে সে। শেষে কথা বলতে গিয়ে গলায় বাধা পেল সে। খুক্ খুক্ কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'আমি চাই না। আমাকে করতে হবে না। সরকারের সাথে এ ব্যাপারে চুক্তি রয়েছে আমাদের। আমার পরিবারের সবসময় অধিকার আছে—'

'আমরা তো সবই জানি,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বান্টিং। 'এবং এখানে ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আপনাকে স্বেচ্ছায় রাজি হতে বলছি।'

আলভারেজ আলতো করে বান্টিংয়ের হাঁটু স্পর্শ করে বলল, 'আপনি তো বুঝতে পারছেন, আপনার বাবার আমল আর এখনকার পরিস্থিতি এক

নয়। কিংবা গত বছরের কথাই ভেবে দেখুন না। কি হয়েছিল, বলুন তো?'

ক্র্যানউইৎজ-এর লম্বা চোয়াল কেঁপে উঠল একটু। বলল, 'কই, আমি তো কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। কম্পিউটারের সাথে সঙ্গতি রেখে জন্মহার কমে গেছে গত বছর। এবং এই জন্মহারের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন ঘটেছে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ঘটনার। কাজেই গত বছরটা কেন অন্যান্য বছরের চেয়ে আলাদা হবে?'

ক্র্যানউইৎজের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের জোর নেই। আলভারেজ নিশ্চিত, সে জানে গত বছর অন্যান্য বছরের চেয়ে কেন আলাদা। আলভারেজ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এ বছর আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে পেরেছি। জন্মহার এবং মৃত্যুহার এখন একদম সমানে সমান। জনসংখ্যার লেভেলটা স্থির হয়ে গেছে এখন। লোকজনের বসবাসের জন্যে বাড়িঘরের নির্মাণকাজ এখন পুরোপুরি নির্ধারিত হয়ে গেছে। সী ফার্মগুলোতে রয়ে গেছে একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে। শুধু মাত্র আপনি দাঁড়িয়ে আছেন মানুষ এবং তাবৎ কর্মকাণ্ডের মাঝখানে।'

'সামান্য ক'টি ইঁদুরের জন্যে তাহলে আটকে আছে সব?'

'সামান্য ক'টি ইঁদুর এবং আরো কিছু প্রাণী। গিনিপিগ, খরগোশ। কিছু পাখি এবং গিরগিটি। সঠিক হিসেবটা আসলে নিইনি আমি—'

'কিন্তু সারা পৃথিবীর বুকে সামান্য ক'টি প্রাণীই তো শুধু। কি আর এমন ক্ষতি ওরা থেকে গেলে?'

'লাভই বা কি?' পাল্টা প্রশ্ন বান্টিংয়ের।

ক্র্যানউইৎজ বলল, 'লাভটা হচ্ছে চোখের দেখা। একটা সময় ছিল, যখন—'

এ গল্প আগেও শুনেছে আলভারেজ। কণ্ঠে যথাসম্ভব সহানুভূতি ঢেলে (এবং আলভারেজকে অবাক করে দিয়ে সত্যিই কিছুটা সত্যিকারের সহানুভূতি এসে গেল) বলল, 'আমি জানি সেটা। একটা সুদিন গেছে তখন! কয়েক শ' বছর আগের কথা সেটা! যে প্রাণীগুলোকে আপনি যত্নআত্তির সাথে লালন পালন করছেন, প্রচুর পরিমাণে ছিল সেগুলো। এবং কোটি কোটি বছর আগে, এক সময় ছিল ডাইনোসররা। এভাবে অনেক প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু আমরা প্রতিটা জীবজন্তুর মাইক্রোফিল্ম রেখে দিয়েছি। মানুষকে ওদের সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে দেয়া চলবে না।'

'আপনারা মাইক্রোফিল্মের সাথে সত্যিকারের জিনিসের তুলনা করেন কিভাবে ?' উত্তেজিত কণ্ঠ ক্র্যানউইৎজের।

কৌতুক খেলে গেল বান্টিংয়ের ঠোঁটে, 'মাইক্রোফিল্মে প্রাণীগুলোর বোটকা গন্ধটা নেই।'

'এক সময় অনেক বড় ছিল চিড়িয়াখানা,' বলল ক্র্যানউইৎজ। 'বছরের পর বছর একে একে অনেক প্রাণী ধ্বংস করে ফেলেছি আমরা। বড় বড় প্রাণীগুলোর একটিও এখন আর নেই। মাংসাশী সমস্ত প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে। বড় বড় গাছগুলো শেষ। থাকার মধ্যে আছে শুধু অল্প কিছু ছোট ছোট গাছ আর খুদে প্রাণীগুলো। থাকতে দিন ওদের।'

আলভারেজ বলল, 'ওদের দিয়ে আপনি করবেনটা কি ? কোনো মানুষই দেখতে চায় না ওদের। লোকজন কিন্তু সব আপনার বিরুদ্ধে।'

'সামাজিক চাপের কথা বলছেন—'

'আমরা প্রকৃত বাধার মুখে টলাতে পারব না লোকজনকে। জীবনকে বিষিয়ে তোলে—এমন জিনিস দেখতে চায় না মানুষ। তারা তো অসুস্থ হয়ে পড়ছে, হ্যাঁ—সত্যিই। কাজেই এসব প্রাণী নিয়ে করবে কি তারা ?' আলভারেজের কণ্ঠে শ্লেষের আভাস।

ক্র্যানউইৎজ বসে গেল এবার। চাপা একটা উত্তেজনা তার গলার লালচে আভা বাড়িয়ে দিল আরো। সে বলল, 'একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি আমি। একদিন পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে চলে যাব আমরা। বাইরের অন্যান্য গ্রহে মানুষ গড়ে তুলবে নতুন বসতি। তখন সে চাইবে এসব প্রাণী। নতুন ফাঁকা পৃথিবীতে বিজাতীয় প্রাণীর সঙ্গ কামনা করবে মানুষ। তখন বৈচিত্র্যপূর্ণ নতুন এক ইকোলজি শুরু হবে মানুষের। শুরু হবে ...'

অন্য দু'জনের তীব্র দৃষ্টির সামনে মিলিয়ে গেল ক্র্যানউইৎজের কথা।

বান্টিং বলল, 'নতুন পৃথিবী বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, যেখানে আমরা নতুন বসতি গড়ে তুলব ?'

'কেন, ১৯৬৯ সালে চাঁদে পৌঁছেছিলাম আমরা,' বলল ক্র্যানউইৎজ।

'নিশ্চয়ই, সেখানে আমরা বসতি গড়েছিলাম, এবং চলেও এসেছি ছেড়ে। সৌরজগতে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোনো গ্রহ নেই, যেখানে মানব জীবন টিকে থাকার মতো পরিবেশ আছে।'

ক্র্যানউইৎজ বলল, 'সৌরজগতে না থাক, অন্য কোথাও আছে। সেখানকার পৃথিবীগুলো অন্য কোনো তারকাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেখানে আমাদের পৃথিবীর মতো পৃথিবী আছে কয়েক শ'। এবং অবশ্যই আছে।'

আলভারেজ মাথা নেড়ে বলল, 'সেসব তো আমাদের নাগালের বাইরে। আমরা তো শেষমেষ ভোগ করে যাচ্ছি পৃথিবীটাকেই এবং সেটা পৃথিবী ভরিয়ে তুলেছি মানুষে মানুষে। বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার যে ক্ষেত্র আমরা বেছে নিয়েছি, সেটা হচ্ছে এই পৃথিবী। তাছাড়া আলোক-বর্ষ দূরত্ব পাড়ি দিয়ে অন্য কোনো তারকা জগতে যাওয়ার মতো স্টারশিপ তৈরির ক্ষমতাও নেই আমাদের। গত শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে জানেন কিছু ?'

'উন্মুক্ত পৃথিবীর এটাই তো ছিল শেষ শতাব্দী,' বলল ক্র্যানউইৎজ।

'হ্যাঁ, তাই ছিল,' শুকন কণ্ঠে বলল আলভারেজ। 'আশা করি, এই শতাব্দীর কথা মনে রেখে অতি-কল্পনায় গা ভাসাবেন না। আমি এর পাগলাম দিকটাও বিবেচনা করেছি। এখনকার তুলনায় সেসময় পৃথিবী বলতে গেলে ফাঁকাই ছিল তখন। তবে তারা মনে করত, পৃথিবীটা ভরে গেছে লোকজনে। এর কারণও ছিল বটে। তারা তাদের অর্ধেকেরও বেশি জিনিস যুদ্ধের কাজে লাগাত, যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজে লাগাত। কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়াই টাকা-পয়সা নষ্ট করে ফেলত। এভাবে নানারকম অসঙ্গতি দানা বেঁধে উঠল চারদিকে। "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" বলে জনসংখ্যার যে বাড়তি চাপটাকে তারা বোঝাত, এই জিনিসটাকে ভয় পেতে লাগল সবাই। তখন পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য পৃথিবীতে বসতি গড়ার স্বপ্ন দেখতে লাগল তারা। আমরাও এখন সেরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি।

'বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনা মিলে সবকিছু সে বদলে দেয়, এই জিনিসটাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছি। নইলে তো এসব বলার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। বর্তমানে বিশ্ব সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সিউসান পাওয়ারের উন্নয়ন রয়েছে, এবং এগিয়ে যাচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। শক্তির প্রাচুর্য এবং সুস্থির জীবন নিয়ে মানুষ সুখশান্তি বসবাস করতে পারে শান্তিময় পৃথিবীতে। এবং বিজ্ঞান সুসামঞ্জস্যপূর্ণ একটা পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলে।

'এটা তো আগেই জানা গেছে যে, ঠিক কত মানুষ এই পৃথিবীতে

বসবাস করতে পারে। কত ক্যালোরি সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে, কত ক্যালোরি ব্যবহৃত হয়, কত টন কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতি বছর দরকার পৃথিবীর সব সবুজ গাছপালায়, কত টন পরিমাণ প্রাণীর জীবন এই গাছগুলোর ওপর নির্ভরশীল—সব হিসেবই এখন মানুষের নখদর্পণে। এই পৃথিবী সব মিলিয়ে দুই মিলিয়ন টন পরিমাণ প্রাণীর জীবনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে সক্ষম—'

ক্র্যানউইৎজ শেষমেষ আর চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'এবং এই দুই ট্রিলিয়ন প্রাণীর পুরো সংখ্যাটাই মানুষ হচ্ছে না কেন?'

'ঠিক তাই।'

'এমন কি প্রয়োজনে অন্যান্য সব প্রাণী মেরে ফেলা হবে, তাই না?'

'অভিব্যক্তিবাদের এটাই তো নিয়ম,' রাগের সাথে বলল ব্যান্টিং। 'যার যোগ্যতা আছে, সেই টিকে থাকবে।'

আলভারেজ আবার তার সঙ্গীর হাঁটু স্পর্শ করে বলল, 'বান্টিং ঠিকই বলেছে, ক্র্যানউইৎজ', নরম গলায় বলে চলল সে। 'পৃথিবীতে বরাবরই অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীরা দুর্বলদের জায়গা দখল করে আসছে। যেমন—সরীসৃপরা স্থান দখল করে উভচরদের, এবং পরে সরীসৃপদের হটিয়ে দেয় স্তন্যপায়ীরা। এবং বর্তমানে এই জায়গা দখলের ব্যাপারটি রয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। পৃথিবীতে এখন গিজ্‌গিজ্ করছে পনেরো মিলিয়ন মানুষ—'

'কিন্তু এটা সম্ভব কিভাবে?' ক্র্যানউইৎজের প্রশ্ন। 'পুরোটা ভূভাগ জুড়ে একটা মাত্র বিশাল দালানে একসঙ্গে বসবাস করছে পৃথিবীর সব মানুষ, তাদের সাথে অন্য কোনো প্রাণী নেই, কোনো গাছপালা নেই। ব্যতিক্রম আছি শুধু আমি। আর পৃথিবী জুড়ে যত সাগর মহাসাগর আছে, সব হয়ে গেছে প্লাঙ্কটন স্যুপ। একটা প্রাণীও নেই, অথচ প্লাঙ্কটনে ভর্তি। আমরা আমাদের লোকজনকে খাওয়ানর জন্যে অবিরাম করে যাচ্ছি প্লাঙ্কটনের চাষ।'

'আমরা খুব ভালোভাবে বসবাস করছি,' বলল আলভারেজ। 'কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো অপরাধ নেই। আমাদের জন্ম যেমন নিয়ন্ত্রিত, তেমনি মৃত্যুও শান্তিপূর্ণ। আমাদের শিশুরা জন্মগতভাবেই এই পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত। পৃথিবীতে এখন সব মিলিয়ে স্বাভাবিক ব্রেইন আছে বিশ বিলিয়ন টনের মতো।'

'এবং সব ক'টা ব্রেইনের এই বিশাল ওজন আছে কি করতে ?'

একরাশ বিরক্তি নিয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল বান্টিং। কিন্তু আলভারেজ এখনো শান্ত। সে বলে চলল, 'আমাদের যাত্রাপথের যে গন্তব্য, আপনি কিন্তু সেটা গুলিয়ে ফেলছেন, বন্ধু। হয়তোবা আপনার পোষা প্রাণীগুলোর জন্যেই এমনটি হচ্ছে। যখন পৃথিবীতে উন্নয়নের একটা প্রক্রিয়া চলছে, তখন জীবনের প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেয়া উচিত। যদি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অপচয়ও হয়, তবু এর একটা সময়োচিত দিক রয়েছে। এক সময় পৃথিবী ছিল একদম ফাঁকা। তারপর ধাপে ধাপে অভিব্যক্তিবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। কোনো প্রাণী এসে জায়গা করে নিয়েছে, আবার কোনো প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এভাবে দশ মিলিয়ন বা তারও বেশি জাতের প্রাণী এসেছে পৃথিবীতে—এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে চলেছে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা।'

'এমনকি পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর, তাকেও শিখে নিতে হয়েছে—কিভাবে টিকে থাকতে হবে। আর এই টিকে থাকতে গিয়ে মানুষকে নিতে হয়েছে বিভিন্ন রকম সুযোগ, পা বাড়াতে হয়েছে অসম্ভবের দিকে। তারপর হয় বোকা বনে যেতে হয়েছে, নয়তো এসেছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। এভাবে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মানুষ আজ পৌঁছেছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। গোটা পৃথিবী আজ ভরে গেছে মানুষে মানুষে। এখন শুধু এই সাফল্যটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে যাওয়া।'

আলভারেজ একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'আমরা এটাই চাই, ক্র্যানউইৎজ। শুধু আমরা কেন, গোটা পৃথিবী চায় এটা। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, এই প্রজন্মে আমরা পৃথিবীটাকে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের করে পেয়েছি। এবং এজন্যে আমাদের স্বতন্ত্র একটা বৈশিষ্ট্য চাই। আপনার প্রাণীগুলো সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ক্র্যানউইৎজ একগুঁয়ে ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'ওরা তো খুবই ছোট এক রুমের ভেতর পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়াও করছে একেবারেই সামান্য। যদি ওদের সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ঘরটা নিয়ে কি করবেন আপনারা ? আরো পঁচিশ জন মানুষকে দিয়ে দেবেন ? পনেরো ট্রিলিয়নের মধ্যে মাত্র পঁচিশজনকে নিয়ে এত চিন্তাভাবনা ?'

বান্টিং বলল, 'এই পঁচিশজন মানুষ আরো পঁচাত্তর পাউন্ড মানব-মস্তিষ্ক

বহন করছে। এই হিসেবটা থেকে পঁচাত্তরজন মানুষের মূল্যটা ভেবে দেখুন একবার ?'

'কিন্তু আপনাদের তো বিলিয়নকে বিলিয়ন টন আছেই ?'

'জানি;' বলল আলভারেজ। 'কিন্তু নিখুঁত এবং অনিখুঁত বলে একটা কথা আছে। পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং অসম্পূর্ণ জীবনের পার্থক্যের মতো ব্যাপারটা। আমরা ঠিক এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। গোটা পৃথিবী এই ২৪৩০ সালকে উদযাপনের জন্যে উদগ্রীব। এই সেই বহু প্রতীক্ষিত বছর, যখন কম্পিউটার বলে দিয়েছে আমাদের, পৃথিবী এখন পরিপূর্ণভাবে ভরে গেছে মানুষে। লক্ষ্যভেদ অর্জিত হয়েছে আমাদের। জায়গা দখলের লড়াইয়ে বিজয়ের মুকুট পেয়ে গেছি আমরা। এখন এই মাত্র পঁচিশজন মানুষের জন্যে পিছিয়ে থাকব আমরা—তা হোক না পৃথিবীর জনসংখ্যা পনেরো ট্রিলিয়ন। এটা যদিও সামান্য, খুবই সামান্য একটা খুঁত, তবু খুঁত তো বটে।'

'ভেবে দেখুন,' ক্র্যানউইৎজ। পৃথিবী পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে অপেক্ষা করছে মানুষে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যে। এখন আমাদের কি আর দেরি করা সাজে ? আমরা আপনার ওপর জোর করতে পারি না, এবং তা করবও না। তবে আপনি স্বেচ্ছায় যদি রাজি হয়ে যান, তাহলে হিরো বনে যাবেন সবার কাছে।'

বান্টিং সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আগামীতে পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে, সবাই বলবে ক্র্যানউইৎজ কাজ করেছেন বটে। এবং তার এই একটি মাত্র কাজ পূর্ণাঙ্গতা এনে দিয়েছে মানব ইতিহাসে।'

ক্র্যানউইৎজ অনেকটা ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে বলল, 'এবং তারা এটাও বলবে, আলভারেজ এবং বান্টিং মিলে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।'

'যদি সফল হই, তবেই!' তার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস নেই। 'কিন্তু আমাকে বলুন, ক্র্যানউইৎজ, পনেরো ট্রিলিয়ন মানুষের এই আলোকিত ইচ্ছেটাকে আপনি সারাজীবনের জন্যে আটকে রাখতে পারবেন ?'

ক্র্যানউইৎজ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল নিচের দিকে। আলভারেজ আলতো করে হাত নাড়ল বান্টিংয়ের দিকে, বান্টিং কোনো কথা বলল না। নীরবতায় অটুট রইল। ধীর গতিতে পেরতে লাগল সময়।

সহসা ক্র্যানউইৎজ ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল, 'আমার এই প্রাণীগুলোর সাথে আরো একটা দিন কাটাতে পারি আমি ?'

'তারপর ?'

'তারপর—আমি আর দাঁড়াব না গোটা মানবজাতি এবং তাদের পরিপূর্ণতার মাঝখানে।'

আলভারেজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'গোটা বিশ্বকে এ খবরটা জানিয়ে দেব আমি। আপনি সম্মানিত হবেন।'

রুষ্টচিত্তে চলে গেল আলভারেজ এবং বান্টিং।

বিশাল জায়গা জুড়ে কন্টিনেন্টাল বিল্ডিংগুলো ছড়িয়ে। সেখানে পাঁচ ট্রিলিয়ন মানুষ শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে, দুই ট্রিলিয়নের মতো মানুষ খাচ্ছে আরাম করে, আধা ট্রিলিয়ন মানুষ ভালোবাসা বিনিময় করছে সতর্কতার সাথে। বাকি মানুষেরা তাপ থেকে নিজেদের আড়াল করে কথা বলছে খোশ মেজাজে, কিংবা একমনে কাজ করে যাচ্ছে কম্পিউটারে, নয়তো গাড়ি চালাচ্ছে, অথবা পড়ে আছে কলকব্জা নিয়ে, কিংবা মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরিতে কাজ করছে, বা আনন্দ দিচ্ছে অন্যদের। কোটি কোটি মানুষ ঘুমোতে যাচ্ছে, কোটি কোটি মানুষ জেগে উঠছে, এবং এই রুটিনের কোনো হেরফের হচ্ছে না।

কলকব্জাগুলো কাজ করে যাচ্ছে অবিরাম, নিজেদের পরীক্ষা নিজেরাই করছে, দরকার হলে সেরে নিচ্ছে মেরামত। আর পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোতে সে প্লাঙ্কটন স্যুপ রয়েছে, ক্রমাগত রোদে পুড়ে পুড়ে ভাঙছে, ভাঙছে, আর ভাঙছে। সেগুলো তুলে নিয়ে শুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে সীমাহীন দালানগুলোর প্রতিটা কোণে।

এভাবে কয়েক দশক ধরে চলছে এই প্রক্রিয়া হয়তো বা হাজার বছর ধরে চলবে। শেষবারের মতো নিজের পোষা প্রাণীগুলোকে খাওয়াল ক্র্যানউইৎজ। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল গিনিপিগটাকে। একটা কাছিম তুলে নিয়ে তাকাল ওটার অনুভূতিপ্রবণ চোখের দিকে। আঙুলের ফাঁকে জীবন্ত এক ঘাসের ডগা অনুভব করল ক্র্যানউইৎজ।

পোষা প্রাণীগুলোকে একে একে গুনল ক্র্যানউইৎজ। পৃথিবীর এই শেষ জ্যান্ত প্রাণীগুলো মানুষের জন্যে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। যেখানে সবুজ সতেজ গাছ জন্মে, সেই মাটি আগে পুড়িয়ে ফেলল ক্র্যানউইৎজ। মরে গেল সব গাছ। এবার পুরো ঘরটা সে ভরিয়ে দিল প্রাণঘাতী গ্যাসে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল সব প্রাণীর। একে একে মারা পড়ল সব ক'টা।

শেষে শুধু রইল বেঁচে ক্র্যানউইৎজ। গোটা মানবজাতি এবং পূর্ণাঙ্গতার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে। তার চিন্তাভাবনায় বিদ্রোহী ভাবটা রয়ে গেছে এখনো। এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় গ্যাসও রয়েছে মজুদ। আর বাঁচতে চায় না সে।

এবং তারপর সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গতা এল মানবজাতির মাঝে। ক্র্যানউইৎজ চলে যাওয়ার পর পনেরো ট্রিলিয়ন মানুষ এবং তাদের বিশ বিলিয়ন টন মগজে অস্থির কোনো চিন্তাভাবনাই রইল না আর। পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করার মতো অস্বাভাবিক আইডিয়া নিয়ে আর দাঁড়াল না কেউ।

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

দ্য উইননাউইং

একটা রহস্যের দেয়ালে আবৃত ডা. অ্যারন রডম্যানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। এই রহস্যের দেয়ালটা যে অবিচলভাব পুরু হয়ে উঠছে, পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

'আপনার আত্মরক্ষার জন্যেই—' তারা সতর্ক করে দিয়েছিল তাকে। ব্যাখ্যা করে বলেছিল, 'যদি ভুল লোকজনের হাতে পড়ে যায়—'

না, সঠিক লোকের হাতেই পড়েছে জিনিসটা (ডা. রডম্যান কিছুটা হতাশা নিয়ে ভাবে নিজের কথা), পাস্তুরের জীবাণু তত্ত্ব যে বিরাট এক আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জন্যে, এটা তো একদম পরিষ্কার। মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি জানার জন্যে সবচে' বড় চাবি এটা।

ডা. রডম্যানের পঞ্চাশতম জন্মদিনের পর যখন তিনি নিউ ইয়র্কের মেডিসিন অ্যাকাডেমির সাথে কথা বললেন, তারপর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিন (বিশেষ একটা মাহাত্ম্য রয়েছে এখানে) থেকে মুখ খোলা বন্ধ হয়ে গেল ডা. রডম্যানের। নির্দিষ্ট কিছু সরকারি লোকজন ছাড়া অন্য কারো সাথে তার কথা বলা যায় না। এমনকি কোনো কিছু ছাপতেও পারবে না সে।

তবে সব রকমের সরকারি সহযোগিতা পাবে ডা. রডম্যান। তার টাকা যা লাগবে, পাবে সবই। এবং তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সরকারি লোকজন এসে তার নির্দেশনা নিয়ে যেতে লাগল, তারা বুঝতে চেষ্টা করল—আসলে কি করছে ডা. রডম্যান।

'ডা. রডম্যান,' তারা জিজ্ঞেস করে রডম্যানকে। 'একটা ভাইরাস নির্দিষ্ট একটা অঙ্গের ভেতর কিভাবে ছড়ায় কোষ থেকে কোষে, এবং নির্দিষ্ট ওই অঙ্গ ছাড়া আর কোথাও সংক্রমণ ছড়ায় না?'

প্রশ্নটা রডম্যানের কাছে বড্ড ক্লান্তিকর। জবাবে বার বার "জানি না" বলে হাঁপ ধরে গেছে তার। তাছাড়া জিনিসটাকে "ভাইরাস" বলে চিহ্নিত করাটাও ডা. রডম্যানের অন্যতম বিরক্তির কারণ। তিনি বলেন, 'এটা মোটেও ভাইরাস নয়, কারণ এটা নিউক্লেইক অ্যাসিড মলিকিউল নয়। এটা সব মিলিয়ে অন্য কিছু—একটা লিপোপ্রোটিন।'

যদি প্রশ্নকর্তারা মেডিকেলের লোকজন না হয়, তাহলে সেটা ডা. রডম্যানের জন্যে ভালো। সে তখন ব্যাখ্যা করে বোঝতে চায় ব্যাপারটা। বলে, 'প্রতিটা জীবিত কোষ, এবং কোষের ভেতর প্রতিটা খুদে কাঠামো বিশেষ এক ঝিল্লি দিয়ে আবৃত। প্রতিটা কোষের কাজ নির্ভর করে এই ঝিল্লির ওপর। কোন উপাদান কি পরিমাণে কিভাবে ঝিল্লির ভেতর দিয়ে চলাচল করছে, সেটাই হচ্ছে মূলকথা। ঝিল্লির ভেতর একটু খানি পরিবর্তন হলেই, উপাদানটির কার্যপ্রবাহে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তখন কোষের রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কাজের ধারাও বদলে যায়।

'সব ধরনের রোগই ঝিল্লির কর্মতৎপরতার পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের জায়গা বদল হতে পারে ঝিল্লির ভেতর। কোনো কৌশল এই ঝিল্লিগুলোকে কব্জা করে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে জীবনকে। ঝিল্লির ওপর প্রভাব খাটিয়ে শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে হরমোন এবং আমার এই লিপোপ্রেটিনও এক ধরনের কৃত্রিম হরমোন, ঠিক ভাইরাস নয়। এই লিপোপ্রোটিন বা এলপি নিজ ক্ষমতাবলে ঢুকে যায় ঝিল্লির ভেতর, তারপর ঝিল্লির বেশিরভাগ উপাদানকে নিজের কব্জায় এনে ফেলে—কাজকর্ম ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার।

'কিন্তু ঝিল্লির এই সুন্দর কাঠামো সবখানেই একরকম নয়। প্রকৃতপক্ষে জীবিত যে কোনো কিছুর মধ্যেই—দুটি অঙ্গের ঝিল্লিগুলো কখনো এক রকম হয় না। একটি এলপি পৃথক দুটি অঙ্গে গিয়ে কখনো একরকম প্রভাব খাটাবে না। কোন অঙ্গে গিয়ে কোষ থেকে গ্লুকোজ বের করে দিয়ে ডায়াবেটিস সৃষ্টি করতে পারে, আবার আরেক অঙ্গে গিয়ে কোষের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ করে দিয়ে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।'

বেশিরভাগ মানুষ ডা. রডম্যানের মুখে যে কথা শুনে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে বিষ।

'এটি একটি বিশেষভাবে নির্বাচিত বিষ,' রডম্যান বলে তাদের। 'তবে কম্পিউটারের মাধ্যমে একদম কাছ থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া আগেভাগে কিছুই বলা যাবে না এ সম্পর্কে। নির্দিষ্ট একটা ঝিল্লির প্রাণ রসায়নে কি ধরনের কাজ করে একটি এলপি, তার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত।'

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে একটা অদৃশ্য ফাঁস যেন ক্রমশ চেপে বসছে ডা. রডম্যানের গলায়। আরাম-আয়েশ দিনকে দিন হারিয়ে যাচ্ছে তার। স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য সবখান থেকে উধাও। দুর্ভোগের নরক যেন বিশাল হাঁ মেলে এগিয়ে আসছে এই হতাশাগ্রস্ত মানুষটার দিকে।

এটা হচ্ছে ২০০৫ সাল। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন ছয় বিলিয়ন। দুর্ভিক্ষ দেখা না দিলে সাত বিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াত লোক সংখ্যা। গত প্রজন্মে ১ বিলিয়নের মতো মানুষ মারা গেছে না খেয়ে। এবং ভবিষ্যতেও মারা যাবে আরো।

পিটার অ্যাফার বিশ্ব খাদ্য সংস্থার চেয়ারম্যান। রডম্যানের ল্যাবরেটরিতে ঘন ঘন যায় সে দাবা খেলতে। সেইসঙ্গে আলাপ হয় টুকটাক। পিটার অ্যাফার বলে থাকে, অ্যাকাডেমিতে রডম্যানের বক্তব্যের তাৎপর্যটা সেই আগে ধরতে পেরেছে বলে আজ চেয়ারম্যান হয়েছে। রডম্যান ভাবে, এই তাৎপর্য বোঝাটা আবার কোনো ব্যাপার হল। এটা তো একদম জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা বলেনি রডম্যান।

রডম্যানের চেয়ে বছর দশেকের ছোট অ্যাফার। তার মাথায় লাল চুলগুলো রঙ হারাচ্ছে ক্রমশ। কথায় কথায় হাসে লোকটা, যদিও আলাপে হাসির বিষয় থাকে খুবই কম। কারণ এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার চেয়ারম্যান যখন সারা বিশ্বের খাদ্য সংস্থান নিয়ে কথা বলে, দুর্ভিক্ষের বিষয়টা তখন প্রসঙ্গক্রমেই এসে যায় বার বার।

অ্যাফার বলল, 'যদি বিশ্ববাসীর খাবার সরবরাহে সত্যিই সেরকম বিঘ্ন ঘটে, তাহলে না খেয়ে মারা যাবে সবাই।'

'যদি সত্যিই সেরকম ব্যাপার ঘটে,' বলল রডম্যান। 'তাহলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হতে পারে, এমন কোনো উদাহরণ বেছে নিতে হবে এর সমাধানের জন্যে। আসলে যা ঘটছে, সে তো গুটিকয়েক সুবিধাবাদী আখের গোছানোর ফল।'

'কিন্তু আপনি কি পারবেন, আপনাকে দেয়া বাড়তি সাপ্লাইয়ের লোভটুকু সামলাতে ?'

'মানুষ বলতেই স্বার্থপর, কিন্তু এখানে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকাটা সামান্য। আমাকে এ নিয়ে বলে কোনো লাভ নেই। এ ব্যাপারে কোনো পছন্দ অপছন্দ দেয়ার মতো ভূমিকা নেই আমার।'

'আপনি তো রোমান্টিক,' বলল অ্যাফার। 'পৃথিবীটাকে কখনো লাইফবোট হিসেবে কল্পনা করে দেখেছেন ? সঞ্চিত খাবারগুলো যদি পৃথিবীর সব মানুষকে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে একজনো সেরকম খাবার পাবে না। শেষ পর্যন্ত না খেয়ে ঠিকই মারা যাবে সবাই। যদি কিছু সংখ্যক মানুষকে সরিয়ে দেয়া যায় এই লাটফবোট থেকে, তাহলে বেঁচে যাবে বাকিরা। কিছু লোকের নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে কিছু লোক যে মরে যাবে, প্রশ্ন তো সেটা নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে কিছু লোকের বেঁচে থাকা নিয়ে। সবাই মরে যাওয়ার চেয়ে কিছু সংখ্যক বেঁচে থাকা ভালো নয় কি ?'

'তার মানে আপনি অফিসিয়ালি বলছেন—কিছু লোকের জীবনে উৎসর্গ করতে, যাতে বাকিরা বেঁচে যায় ?'

'আমরা নিরুপায়। লাইফবোটের লোকজন সশস্ত্র। কয়েকটি মহল থেকে তো সরাসরি হুমকি আসছে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের। তাদেরকে যদি বেশি খাবার না দেয়া হয়, ফাটিয়ে দেবে পারমানবিক বোমা।'

রডম্যান ব্যঙ্গ করে বলল, 'তার মানে আপনার কথা মতো পরিস্থিতিটা এই—তুমি মরলে আমি বেঁচে যেতে পারি, কিন্তু আমি যদি মরি, তুমি বাঁচবে না—একটা অচলাবস্থা আর কি।'

'না, ঠিক তা নয়,' বলল অ্যাফার। 'পৃথিবীর কিছু জায়গার মানুষ এমনিতেই বাঁচতে পারবে না। একদম মানুষ গাদাগাদি করে অহেতুক সেখানে অনাহারের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ধরুন, সেখানে এমন কিছু খাবার পাঠিয়ে দেয়া হল, যেগুলো খেয়ে মারা গেল তারা। ব্যস্ত ওই জায়গাতে আর কখনো খাবার পাঠাতে হবে না।'

রডম্যান এই প্রথম ধাক্কা খেল ভেতরে ভেতরে। জিজ্ঞেস করল, 'ওদেরকে মারবেন কিভাবে ? মানে, একই খাবার খেয়ে কিছু লোক মরবে, এবং কিছু বেঁচে যাবে—এটা কিভাবে সম্ভব ?'

'এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটা জনগোষ্ঠীর কোষ-ঝিল্লির গড়পড়তা কাঠামোগত উপাদানকে বেছে নেয়া হবে। একটি এলপি যদি শুধুমাত্র ওই উপাদানের ওপর ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে ওই লোকগুলো যা খাবে, মারাত্মক পরিণতি হবে তাদের।'

'এ যে অচিন্তনীয় ব্যাপার।' স্তম্ভিত রডম্যান।

'তবে চিন্তা করে দেখুন। কোনো যন্ত্রণা থাকবে না এতে। ঝিল্লিগুলোর কাজ খুব ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। আক্রান্ত ব্যক্তি স্রেফ ঢলে পড়বে গভীর ঘুমে, জেগে উঠবে না আর কোনোদিন—অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, কিংবা পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের চেয়ে অনেক ভালো এই চিরবিদায়। তাছাড়া এ মৃত্যু তো সবার জন্যে নয়, যারা এলপি'র সাথে একাত্ম হতে পারবে না, তারাই শুধু মরবে। এতে যদি চরম বিপর্যয় ঘটে, তাহলে বড় জোর শতকরা সত্তর ভাগ লোক মারা যাবে। এভাবে ঝাঁট মেরে যদি কাজটাকে যথাযথভাবে সফল করে তোলা যায়, তাহলে জনসংখ্যার বাড়তি চাপ এবং হতাশা বলে আর থাকবে না কিছু। বাদ বাকি যে লোকজন থেকে যাবে পৃথিবীতে, সবাই যার যার জাতি, দল এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে রক্ষা করে যেতে পারবে।'

'এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কোটি কোটি লোককে মেরে ফেলাটা—'

'না, আমরা তো মারতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু নির্দিষ্ট কিছু লোককে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার একটা সুযোগ দিচ্ছি মাত্র। কারা কারা মরবে, সেটা নির্ভর করছে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার ওপর। পুরো ব্যাপারটাই থাকছে ঈশ্বরের হাতে।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে যাবে, তখন কি হবে?'

'আসল ব্যাপারটা জানাজানি হতে হতে আমরা কেউ আর থাকব না তখন,' বলল অ্যাফার। 'এবং তখন সমৃদ্ধশালী পৃথিবীতে সীমিত সংখ্যক যে লোকজন থাকবে, আমাদের এই বীরোচিত কাজের জন্যে ধন্যবাদ জানাবে তারা। প্রশংসা করবে একযোগে সবার মৃত্যু এড়িয়ে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যককে মেরে ফেলার এই কৌশলটির।'

ডা. রডম্যান অনুভব করল, চোখেমুখে রক্ত চলে আসছে তার। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে খুব। তবু সে বলল, 'এই পৃথিবীটা বিরাট এক জায়গা এবং

খুবই জটিল এক লাইফবোট আমরা এখনো জানি না, আমাদের সম্পদগুলো সবার মাঝে সঠিকভাবে বিলিবন্টন হচ্ছে কি হচ্ছে না। আর এটা সবচে' খারাপ দিক যে, এই কঠিন দুঃসময়েও আমরা সম্পদগুলো সঠিকভাবে সবখানে ভাগ করে দেয়ার কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছি না। পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রতিদিন প্রচুর খাবার নষ্ট হচ্ছে, এবং এ ঘটনা ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে উন্মত্ত করে তুলছে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' শীতল কণ্ঠে বলল অ্যাফার। 'কিন্তু পৃথিবীটাকে যেভাবে আমরা চালাতে চাই, সেভাবে তো পারি না। পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখেই চলতে হবে আমাদের।'

'তাহলে আমার সঙ্গেও সঙ্গতি রেখে চলুন। আপনি আমার কাছ থেকে যে এলপি চাইছেন—সেটা আমি দিতে পারব না। এ সর্বনেশে পথের দিকে একটা আঙুলও নড়বে না আমার।'

'তাহলে কি হবে, জানেন?' বলল অ্যাফার। 'আপনি যতটা অভিযুক্ত করছেন আমাকে, তারচে' বড় খুনী বনে যাবেন। আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করবেন, সিদ্ধান্ত বদলে যাবে আপনার।'

প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো কর্মকর্তা এসে দর্শন দিয়ে যেতে লাগল রডম্যানকে। সবারই বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীর। খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই কারো। উদর ফুলিয়ে আসা এই লোকেরা অনাহারীদের মেরে ফেলার ব্যাপারে ঘ্যান ঘ্যান করে ক্রমশ অস্থির বানিয়ে ফেলল রডম্যানকে।

কৃষি বিভাগের জাতীয় সচিব একদিন রডম্যানকে ঠেস মেরে বলল, 'যদি কোনো গোয়ালের গরুগুলো খুরা রোগ কিংবা মুখের রোগের আক্রান্ত হয়, কিংবা অ্যান্থ্রাক্সে ভোগে, তাহলে ব্যাপকভাবে রোগ ছড়ানর আগে কি মেরে ফেলবেন না রোগাক্রান্ত গরুগুলোকে?'

'মানুষ কিন্তু গরু নয়,' সোজা উত্তর রডম্যানের। 'এক দুর্ভিক্ষ কোনো সংক্রামক রোগ নয়।'

'বাস্তবে কিন্তু দাঁড়াচ্ছে তাই,' বলল সচিব। 'এটাই তো আসল পয়েন্ট। যদি আমরা ফুঁ চালিয়ে জনসংখ্যার বাড়তি চাপটাকে কমিয়ে না দিই, তাহলে

দুর্ভিক্ষ সংক্রামক রোগের মতোই ছড়িয়ে পড়বে অনাক্রান্ত এলাকাগুলোতে। কাজেই আমাদের আপনি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারেন না।'

'কিন্তু আপনি আমাকে রাজি করাবেন কিভাবে? নির্যাতন চালাবেন?'

'আরে না, আপনার গায়ের একটা রোমও স্পর্শ করব না আমরা। কারণ আপনার দক্ষতা আমাদের কাছে অতি মূল্যবান এক সম্পদ। আমরা শুধু খাবারটা উঠিয়ে নেব।'

'হ্যাঁ উপোস থাকলে অবশ্যই ক্ষতি হবে আমার।' চিন্তিত কণ্ঠ রডম্যানের।

'না, উপোস তো আপনাকে রাখব না আমরা। যদি মানবকুলের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কয়েক কোটি মানুষকে আমরা মেরে ফেলতে যাই, সেক্ষেত্রে আপনার মেয়ে, মেয়েজামাই, এবং তাদের শিশুটাকে অভুক্ত রাখাটা হবে অনেক সহজ কাজ।'

রডম্যান বোবা বনে গেল। সেক্রেটারি বলল, 'না, অত তাড়াহুড়ো নেই। আমরা আপনাকে সময় দেব চিন্তাভাবনা করার। আপনার পরিবারকে বিপদে ফেলার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই, কিন্তু বাধ্য হলে তো করতেই হবে সেটা। ভেবে দেখার জন্যে সপ্তাখানেক সময় নিন আপনি। আগামী বৃহস্পতিবার পুরো কমিটি হাজির হবে আপনার সামনে। তখন আমাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আপনাকে। এ নিয়ে আর দেরি করলে চলবে না।'

পাহারা দ্বিগুণ করা হল রডম্যানের চারপাশে। এখন সে সরাসরি এবং পুরোপুরি ভাবে একজন বন্দি। সপ্তাখানেক পর বিশ্ব খাদ্য পরিষদের পনোরোজন সদস্যের সবাই এসে হাজির। কৃষি বিভাগের জাতীয় সচিবও এল তাদের সাথে। আরো এল জাতীয় আইন প্রণয়নকারী পরিষদের কয়েকজন সদস্য। সবাই এসে জড়ো হল ডা. রডম্যানের ল্যাবরেটারিতে। জনগণের টাকায় গড়া বিলাসবাহুল রিসার্চ বিল্ডিংয়ের যন্ত্রণা কক্ষে গিয়ে লম্বা বিল্ডিংটা ঘিরে বসল তারা।

কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল তাদের। বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা নেয়া হল। রডম্যানের সাথে কথাবার্তায় এমন একটা সমঝোতা এসে গেল, কেউ আর প্রশ্ন করল না—রডম্যান তাদের সাথে আছে কি নেই। রডম্যানের

হাবভাবে মনে হল না, সবার সাথে একমত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা তার মাথায় আছে।

শেষমেষ রডম্যান বলল, 'আপনাদের এই প্রজেক্ট যে ভাবেই হোক, সফল হবে না। বিশ্বের কয়েকটি জায়গায় যখন এলপি মেশান খাদ্যশস্য পৌছুবে, খুব শীঘ্রি মারা পড়বে অসংখ্য মানুষ। তখন এই মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে যারা বেঁচে থাকবে, তারা যে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে, সেটা কি আপনারা ভেবে দেখেছেন ?'

রডম্যানের একদম মুখোমুখি বসে আছে অ্যাফার। সে বলল, 'এই সম্ভবনার ব্যাপারে সতর্ক আছি আমরা। আমাদের এই পরিকল্পনা তো আজকের নয়, কয়েক বছর ধরেই চিন্তাভাবনা করছি। কাজেই ওসব এলাকায় ফুঁ চালালে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এসব সম্ভাবনা ভেবে দেখা হয়েছে।'

'আপনি কি আশা করছেন, যারা বেঁচে থাকবে, ধন্যবাদ জানবে আপনাদের ?' বিষণ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রডম্যান।

'ওরা জানবে না, আমরা সুকৌশলে ওদেরকে আলাদা করে ফেলেছি। তাছাড়া খাদ্যশস্যের সব চালানেই "এলপি" থাকবে না। কোন জায়গার খাদ্যশস্য ভেজাল রয়েছে, এটিও ওরা চিহ্নিত করতে পারবে না। আমরা দেখাব যে, স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন খাদ্যশস্যেই এখানে ওখানে বিষাক্ত হয়ে জন্মাচ্ছে। আরেকটা সুবিধে থাকবে যে, প্রত্যেকেই তো আর ধুপ্‌ধাপ্ মরে যাবে না। তাৎক্ষণিকভাবে মারা যাবে খুবই অল্প সংখ্যক। কিছু মানুষ প্রচুর খেয়েও মারা যাবে না, আবার কিছু মানুষ সামান্য একটু খেয়েই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে—এটা যার যার ঝিল্লির ওপর নির্ভর করছে। অনেকটা প্লেগ রোগের পুনরাবির্ভাবের মতো।'

রডম্যান বলল, 'ওরা যদি সত্যিই এরকম মহামারীর কথা ভেবে বসে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, ভেবে দেখেছেন ? চিন্তা করেছেন, কি পরিমাণ আতঙ্ক ছাড়াবে ?'

'তাহলে সেটা ভালো হবে ওদের জন্যে,' টেবিলের এক প্রান্ত থেকে গম গম করে উঠল সেক্রেটারির কণ্ঠ। 'এ থেকে একটা শিক্ষা পাবে ওরা।'

'আমরা ঘোষণা দেব, এই বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল অ্যাফার। 'আমরা তো জানব, কোনো কোনো এলাকায়

এলপি'র কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। সেসব জায়গায় পাইকারী টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করব। বুঝলেন ডা. রডম্যান, গোটা পৃথিবীটাই ভয়ানক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কাজেই খুব শীঘ্রি এর প্রতিকার আবশ্যক। ভয়াবহ মৃত্যু-সীমানায় দাঁড়িয়ে গোটা মানব জাতি, কাজেই সমাধানের একমাত্র পথটা নিয়ে অথবা আর সংঘাত সৃষ্টি করবেন না।'

'আমার প্রশ্ন তো এখানেই। এটাই যদি সমাধানের একমাত্র পথ হয়, তাহলে এই মহৎ কাজে আপনারা নিজেদের উৎসর্গ করছেন না কেন—শুধু কোটি কোটি নিরীহ মানুষের এত দায় পড়েছে কেন?'

ট্রলি ভর্তি খাবার আসায় থামতে হল রডম্যানকে। সে নরম কণ্ঠে বলল, 'আপনাদের চাঙা করার জন্য সামান্য আয়োজন করেছি আমি। তো, খাওয়ার জন্যে আলোচনায় খানিকক্ষণ বিরতি চলুক, কি বলেন?'

এগিয়ে গিয়ে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল রডম্যান। একটু পরে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'যেহেতু মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ নিয়ে যা বলছি আমরা, কাজেই অন্তত খাওয়াটা ভালো হওয়া দরকার।'

অ্যাফার তার আধ-খাওয়া স্যান্ডউইচের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'নাহ, খাওয়াটা মোটেও ভালো জমছে না। সাদা পাউরুটিতে ডিমের সালাদটা টাটকা মনে হচ্ছে না। আপনার জায়গায় হলে, অবশ্যই এই কফি সবটা বদলে ফেলাতাম আমি।'

হতাশা চাপার জন্যে অ্যাফার শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যাক-গে, এই দুর্ভিক্ষের সময় খাবার অপচয় করাটা মোটেও উচিত নয়।'

এই বলে স্যান্ডউইচের বাকিটুকু শেষ করল অ্যাফার।

চুপচাপ অন্য সবার খাওয়া দেখল রডম্যান। তারপর ট্রে-তে পড়ে থাকা শেষ স্যান্ডউইচটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম, যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি, তাতে আপনাদের অনেকেরই খিদে বলে থাকবে না কিছু। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু দেখলাম না। প্রত্যেকেই খেয়েছেন আপনারা।'

'আপনার অবস্থাও তো তাই,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল অ্যাফার। 'এখনো খাচ্ছেন দিব্যি।'

'হ্যাঁ, খাচ্ছি,' বলল রডম্যান, আয়েশ করে চিবোচ্ছে সে। 'পাউরুটিতে টাটকা ভাবটা না থাকায় আমি দুঃখিত। গত রাতে নিজ হাতে এসব তৈরি করেছি আমি। তার মানে পনেরো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে।'

'আপনি বানিয়েছেন?' অ্যাফারের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, বানাতে হল। কারণ এলপি'র যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অন্য কোনো উপায় ছিল না।'

'আপনি কি বলছেন এসব?'

'ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা আমাকে বলেছেন, বিপুল জনগোষ্ঠিকে বাঁচানর জন্যে কিছু সংখ্যক মানুষকে মেরে ফেলা দরকার। হয়তো বা আপনাদের কথাই ঠিক। আপনারা সেই বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছেন আমার ভেতর। কিন্তু সে জিনিসটি আমরা করতে চাইছি, সে ব্যাপারে নিজেদের একটা অভিজ্ঞতা বোধহয় থাকা উচিত আমাদের। যে স্যান্ডউইচগুলো আপনারা পেয়েছেন, সেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এগুলো বানান।'

উপস্থিত কর্মকর্তাদের কয়েকজন সাঁই করে খাড়া হয়ে গেলেন ঝোঁকের বশে।

'আমাদের বিষ খাওয়ান হয়েছে?' হাঁ করে দম নিল সেক্রেটারি।

রডম্যান বলল, 'খুব জোরালভাবে যে সেটা কার্যকর হবে, তা নয়। আপনাদের সবার ভেতরকার প্রাণ-রসায়ন জানা নেই আমার। কাজেই আপনাদের পছন্দমতো শতকরা সত্তর ভাগ মৃত্যুর নিশ্চয়তা দিতে পারব না।'

সব কটা চোখ এসে স্থির হল রডম্যানের ওপর। আতঙ্কে জমে গেছে সবাই। চোখের পাতা নিস্তেজ হয়ে এল রডম্যানের। বলল, 'এরপরেও মনে হচ্ছে, আপনারা দু'তিনজন মারা যাবেন আগামী দু'এক সপ্তার মধ্যে। দরকার শুধু তাই দেখার জন্যে বসে বসে অপেক্ষা করা। এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। তবে ঘাবড়ানর কিছু নেই। এই মৃত্যু হবে সম্পূর্ণ ব্যথা-বেদনা হীন, এবং এটা ঘটবে ঈশ্বরের অঙ্গুলী নির্দেশে, আপনাদেরই একজন আমাকে বলেছেন একথা। এটা যে একটা ভালো শিক্ষা হবে, একথাও বলেছেন একজন। এই সকল থেকে যারা শেষমেষ বেঁচে যাবেন, তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাইবেন ব্যাপারটাকে।'

অ্যাফার সহসা বলে উঠল, 'এটা স্রেফ একটা ধাপ্পা। আপনি নিজেও তো স্যান্ডউইচ খেয়েছেন।'

রডম্যান বলল, 'হ্যাঁ। আমার ভেতরকার প্রাণ রসায়নের সাথে 'এলপি-কে যেহেতু ম্যাচ করে নিয়েছি, কাজেই সবার আগে মারা যাব আমি।' চোখ দুটো বন্ধ হল তার। 'যারা বেঁচে থাকবেন—আমাকে ছাড়াই সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে তাদের।'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

স্পেল মাই নেম উইথ "এস"

মার্শাল জেবাটিনস্কির নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। মনে হচ্ছে স্টোর ফ্রন্ট কাঁচ এবং দাগঅলা কাঠের পার্টিশন ভেদ করে একজোড়া চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। লক্ষ্য করছে। এ ভাবনাটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল মার্শালকে। সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না তার মতো নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট একজন নিউমেরোলজিস্ট বা সংখ্যাতত্ত্ববিদের কাছে কেন এসেছে।

নিউমেরোলজিস্ট পুরান একটা ডেস্কের পেছনে বসেছে। বোঝাই যায় বাজার থেকে কেনা সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস। লোকটার জামাকাপড়েরও একই দশা। ছোটখাট মানুষটা পিটপিট করে তাকাচ্ছে জেবাটিনস্কির দিকে। তার কালো চোখ জোড়া ঝকঝকে, উজ্জ্বল।

নিউমেরোলজিষ্ট বলল, 'আমার কাছে এর আগে কোনো পদার্থ বিজ্ঞানী আসেননি, ড. জেবাটিনস্কি।'

জেবাটিনস্কি চট করে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা কিন্তু গোপনীয়।'

হাসল নিউমেরোলজিষ্ট। বয়সের ভাঁজ আর দাগ নিয়ে কুঁচকে গেল মুখ বলল, 'আমি গোপনীয়তা রক্ষা করেই সবসময় কাজ করি।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'একটা কথা প্রথমেই খোলাসা করে নিই। আমি কিন্তু নিউমেরোলজিতে বিশ্বাস করি না। আর বিশ্বাস করতে চাইও না।'

'তা হলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'আমার স্ত্রী পাঠিয়েছে। তার এসবে অগাধ বিশ্বাস', কাঁধ ঝাঁকাল পদার্থবিদ।

'কিসের জন্যে এসেছেন? টাকা? নিরাপত্তা? দীর্ঘজীবন? নাকি অন্য কিছু?'

জেবাটিনস্কি জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। নিউমেরোলজিস্ট ধৈর্য নিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

জেবাটিনস্কি ভাবছে : কি বলব আমি ? বলব যে আমার বয়স চৌত্রিশ এবং আমি নিজের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না ? অবশেষে বলল সে, 'আমি সাফল্য চাই। চাই স্বীকৃতি।'

'ভালো চাকরি ?'

'অন্য কোনো চাকরি। ভিন্ন ধরনের কিছু। এ মুহূর্তে আমি একটা টিমের হয়ে কাজ করছি। সরকারি গবেষণায় যা হয়ে থাকে আর কি। টিম!'

'আপনি একা কাজ করতে চান ?'

'আমি টিম থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। চাই নিজের মতো করে নিজেকে গড়তে।' কথাটা বলে খুব হালকা বোধ করল জেবাটিনস্কি। বলে চলল, 'টিমের সঙ্গে কাজ করে নিজের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না আমি। কতগুলো নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টের ভিড়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছি যেন। এখন একা হয়ে যেতে চাই। আশা করি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি আপনাকে।'

নিউমেরোলজিস্ট ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনিও আশা করি বুঝতে পারবেন ড. জেবাটিনস্কি যে আমি সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারি না।

সংখ্যাতত্ত্বের উপর বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও কথাটা শুনে খুব হতাশ বোধ করল জেবাটিনস্কি। বলল, 'পারেন না ? তা হলে কিসের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন আপনি ?'

'সম্ভাবনার মধ্যে ইমপ্রুভমেন্টের। আমার কাজের প্রকৃতি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত। যেমন আপনি অণু-পরমাণু নিয়ে কাজ করেন। পরিসংখ্যানের আইন তো আপনার জানাই আছে।'

'আপনার জানা আছে ?' তেঁতো গলায় জিজ্ঞেস করল জেবাটিনস্কি।

'জানা আছে। সত্যি বলতে কি, আমি একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং কাজ করি হিসেব কষে। আমার ফি বাড়ানর জন্যে এসব কথা বলছি না। আমার ফি বেশি নয়। মাত্র পঞ্চাশ ডলার। তবে যেহেতু আপনি একজন বিজ্ঞানী কাজেই আমার অন্য ক্লায়েন্টদের চেয়ে আমার কাজের ধরনটা আপনি বেশি বুঝতে পারবেন। আর ব্যাপারটা আপনাকে ব্যাখ্যা করেও আনন্দ পাচ্ছি।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'একটা কথা বলি। কিছু মনে করবেন না। আমাকে অক্ষরের সংখ্যাগত মূল্যের কথা বা তাদের রহস্যময় গুরুত্ব বা এধরনের কিছু বলে লাভ হবে না। আমি এসব বুঝব না। তারচে আসল কথায় চলে

আসুন—'

'আমি নিউমেরোলজিস্টের সাইনবোর্ড টাঙিয়েছি যাতে পুলিশ বিরক্ত না করে।' বলল ছোটখাট লোকটি। 'যদিও নিজেকে অঙ্কশাস্ত্রবিদ বলে পরিচয় দিতেই ভালোবাসি,' হাসল জেবাটিনস্কি।

নিউমেরোলজিস্ট বলল, 'আমি কম্পিউটার তৈরি করি। পড়াশোনা করি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে।'

'কি!'

'শুনে অবাক হচ্ছেন? পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাটা কম্পিউটারে ঢোকালে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে সক্ষম কম্পিউটার।'

'আপনি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারবেন?'

'কাছাকাছি হয়তো যেতে পারব। তবে কাজটা করতে হলে আপনার নামের বানান বদলাতে হবে আমাকে। ডাটা পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তিত ওটা ঢোকাব অপারেশন প্রোগ্রামে।'

'কিন্তু আমার নাম বদলাতে চাইছেন কেন?'

'এই একটি পরিবর্তনই আমার দ্বারা করা সম্ভব। নানা কারণে মানুষের নাম পরিবর্তন করে থাকি আমি। প্রথম কারণ হল, এটা একটি সাধারণ পরিবর্তন। আমি যদি অন্য কিছু অনেক বেশি পরিবর্তন করতে যাই তা হলে প্রচুর নতুন রাশি পেয়ে যান যার ব্যাখ্যা হয়তো আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় কারণ হল, এটা হল রিজনাব্‌ল্ চেঞ্জ। আমি আপনার উচ্চতা, চোখের রঙ বা মেজাজের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারব না। তৃতীয়ত, এটাকে আমি বলব সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ। নাম মানুষের কাছে অনেক অর্থ বহন করে। আর চতুর্থ বা সর্বশেষ কারণ হল—এটা একটা কমন চেঞ্জ। যা প্রতিদিনই অসংখ্য লোক করে আসছে।'

জেবাটিনস্কি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যদি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে না পান?'

'এ ঝুঁকিটা আপনার। তবে বর্তমানের চেয়ে খারাপ ভবিষ্যৎ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

জেবাটিনস্কি অস্বস্তি নিয়ে তাকাল ছোটখাট মানুষটির দিকে।

'আমার এ সব বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে নিউমেরোলজির প্রতি বিশ্বাস আসতেও পারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিউমেরোলজিস্ট। 'ভেবেছিলাম সত্য কথাটি বললে স্বস্তিবোধ করবেন। আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাই। আর সে সুযোগও আছে।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'আপনি যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পান—'

'তা হলে আমি পৃথিবীর সবচে ধনী মানুষটি হলাম না কেন, তাই তো ? তবে আমি যা পেয়েছি তা নিয়েই সন্তুষ্ট। আমার চলার মতো অল্প টাকার দরকার। আর সেটা আপনার মতো ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে আমি পেয়ে থাকি। আমি লোকজনকে সাহায্য করতে ভালোবাসি। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো এটাই ব্যাখ্যা দেবেন আমার শক্তি এবং অহংকার বলে। যাকগে— আপনি কি এবার আমায় সাহায্য করবেন ?'

'কত দিতে হবে যেন বললেন ?'

'পঞ্চাশ ডলার। আপনার সম্পর্কে বায়োগ্রাফিকাল সমস্ত তথ্য দরকার হবে আমার। এ বিষয়ে একটা ফর্ম পাঠিয়ে দেব ডাক যোগে। ওটা পেয়ে যাবেন এক হপ্তার মধ্যে। আর আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন—(নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল লোকটা) আগামী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে।'

'পাঁচ হপ্তা ? এত দেরি ?'

'আমার আরো অনেক কাজ আছে, বন্ধু। অন্য ক্লায়েন্ট আছে। ভুয়া হলে কাজটা আরো আগে করে দেয়ার কথা বলতাম। যাকগে, আপনি রাজি তো ?'

ওঠে দাঁড়াল জেবাটিনস্কি। 'রাজি—তবে মনে রাখবেন ব্যাপারটা। গোপনীয়।'

'অবশ্যই। আপনি আপনার সমস্ত তথ্য ফেরত পেয়ে যাবেন আমার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে। কথা দিচ্ছি, আপনার তথ্য উপাত্ত নিয়ে ভবিষ্যতে অন্য কোনো কাজে লাগাব না।'

নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট দোর গোড়ায় থমকে দাঁড়াল। 'আপনি যে নিউমেরোলজিস্ট নন এ কথা আমি ফাঁস করে দিতে পারি। সে ভয় পাচ্ছেন না?

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, বন্ধু। আপনি আমার কাছে এসেছেন তাই হয়তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

পরের মাসের ২০ তারিখ নিউমেরোলজিস্টের অফিসে হাজির হয়ে গেল

জেবাটিনস্কি। একবার ভেবেছে আসবে না। কিন্তু কি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ঠিকই চলে এসেছে। বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল বুড়ো নিউমেরোলজিস্ট।

'বলুন ?—আঃ, ওঃ জেবাটিনস্কি।'

'মনে আছে আমাকে ?' হাসার চেষ্টা করল জেবাটিনস্কি।

'জ্বী, মনে আছে।'

'ভবিষ্যৎ বাণীর কি হল ?'

নিউমেরোলজিস্ট বুকে হাত বাঁধল, 'সে কথা বলবার আগে স্যার, ছোট্ট একটা ব্যাপার—'

'ফি দিতে হবে ?'

'আমি আপনার কাজটা করেছি, স্যার কাজেই পাওনাতো হয়েছেই।'

জেবাটিনস্কি পাঁচটা দশ ডলারের নোট এগিয়ে দিল বুড়োর দিকে। সে টাকাটা গুণে তার ডেস্কের ক্যাশ ড্রয়ারে রাখল। বলল, 'আপনার কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি আপনাকে পরামর্শ দেব নাম বদলে সেবাটিনস্কি করে ফেলুন।'

'সেবা—বানানটা কি রকম।'

'এস-এ-বি-এ-টি-আই-এন-এস-কে-ওয়াই।'

বেজার দেখাল জেবাটিনস্কিকে। 'আপনি আমার নামের প্রথম অক্ষরটা বদলে ফেলতে চাইছেন ? জেড-এর জায়গায় এস দিতে বললেন ? এতেই চলবে ?'

'চলবে।'

'কিন্তু নাম পরিবর্তনে কি লাভ হবে ?'

'আগেই বলেছি, আমি এ ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারব না। আর নাম পরিবর্তন করা না করা আপনার ইচ্ছা। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেমন আছে তেমনই থাকবে। তবে আপনার ফি কিন্তু ফেরত দিতে পারব না।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'কিন্তু আমার কি কাজ ? সবাইকে বলে দেব যে এখন থেকে আমার নামের বানান "এস" দিয়ে করতে ?'

'এ নিয়ে কোনো আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপনার নামটা বৈধভাবে পরিবর্তন কারেন। এ ব্যাপারে উনি আপনাকে ছোটাখাট কিছু পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'তা আমি কি করে বলব ? হয়তো কাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইমপ্রুভমেন্ট। হয়তো কোনোদিনই হবে না।'

'কিন্তু আপনি তো ভবিষ্যৎ দেখেছেন। দাবি করছেন দেখেছেন।'

'ক্রিস্টালবলের মতো নয়। না, ড. জেবাটিনস্কি। আমি আমার কম্পিউটার থেকে কোড করা কিছু ফিগার পেয়েছি। আমি সম্ভাবনার কথা বলতে পারি। তবে কোনো ছবি দেখিনি।'

জেবাটিনস্কি চলে এল ওখান থেকে। এখন মনে হচ্ছে পঞ্চাশটা ডলারই গচ্চা গেল। স্রেফ একটা নাম সেবাটিনস্কির জন্যে! ঈশ্বর, কি নামরে বাবা। জেবাটিনস্কির চেয়েও খারাপ।'

আইনজীবীর কাছে যাবে কি যাবে না তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে একমাস কেটে গেল। তারপর লইয়ারের কাছে গেল জেবাটিনস্কি।

আইনজীবী জানালেন জেবাটিনস্কি ইচ্ছে করলেই আবার আগের নামে ফিরে যেতে পারবে।

ঠিক আছে। তবে নামটা পরিবর্তন করে দেখিই না, ভাবল জেবাটিনস্কি। এবং তাই করল সে।

হেনরী ব্রান্ড ফোল্ডারের পৃষ্ঠা একের পর এক উল্টে যাচ্ছে, সিকিউরিটিতে চৌদ্দ বছর ধরে কাজ করার অভ্যস্ত চোখে দেখছে ওটা। প্রতিটি শব্দ পাড়ার দরকার নেই। অদ্ভুত কোনো শব্দ ফোল্ডারে থাকলে তা ওর চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না।

সে বলল, 'লোকটাকে তো আমার নির্ভেজাল মনে হচ্ছে।' হেনরী ব্রান্ডও নির্ভেজাল মানুষ। লেফটেন্যান্ট আলবার্ট কুইন্সি, যে নিয়ে এসেছে ফোল্ডারটা, সে বয়সে তরুণ, হ্যান ফোর্ড স্টেশনের সিকিউরিটি অফিসার। সে বলল, 'কিন্তু সেবাটিনস্কি কেন ?'

'কেন নয় ?'

'কারণ এর কোনো মানে দাঁড়ায় না। জেবাটিনস্কি একটি বিদেশী নাম। কিন্তু নামটা পরিবর্তন করলে আমি অ্যাংলো-স্যাক্সন কোনো নাম নিতাম। কিন্তু জেবাটিনিস্কি সেবাটিনিস্কি হবে কেন ? এর কারণ খুঁজে বের করা উচিত।'

'কেউ তাকে সরাসরি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে ?'

'অবশ্যই করেছে। আমিই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি। সে এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলেনি। শুধু বলেছে "জেড" অক্ষরটা কেন। "এস"-এ পরিবর্তন করা হল এ নিয়ে লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সে বেজায় ক্লান্ত।'

'তাই হওয়াই স্বাভাবিক। নয় কি লেফটেন্যান্ট ?'

'হয়তো তাই। কিন্তু নাম বদলে সে স্যান্ডস বা স্মিথ রাখল না কেন যদি তার নাম বদলাতে "এস"-এর দরকারই হয়ে পড়ে ? আর "জেড" নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকলে পুরো নামটাই বদলে ফেলতে পারত। যেমন "এ" দিয়ে—অ্যারন।'

'তবে লোকটার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি,' বিড়বিড় করল ব্রান্ড। 'একজন তার নাম যেভাবে ইচ্ছা বদলাতে পারে। এ কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব নয়।'

লেফটেন্যান্ট কুইন্সিকে অসন্তুষ্ট দেখাল। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যার, লোকটা রাশান।'

ব্রান্ড বলল, 'না। সে থার্ড-জেনারেশন আমেরিকান।'

'মানে ওর নামটা রাশান।'

বিরক্তির চিহ্ন ফুটল ব্রান্ডের চেহারায়, 'আবার ভুল করছ তুমি। ওটা পোলিশ নাম।'

দু'হাত মেলে ধরে লেফটেন্যান্ট অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল, 'ওই একই হল।'

ব্রান্ডের মা'র কুমারী নাম ছিল উইসতিউস্কি। সে বাধা দিল। 'অমন কথা কোনো পোলকে বলতে যেয়োনা, লেফটেন্যান্ট। কিংবা কোনো রাশানকে।'

'আমি আসলে বলতে চাইছি, স্যার,' লালচে হয়ে উঠেছে লেফটেন্যান্টের চেহারা। 'রাশান এবং ডেনিশ সকলেই যবনিকার ওপাশের লোক।'

'সে আমরা জানি।'

'আর জেবাটিনস্কি বা সেবাটিনস্কি, যে নামেই ওকে ডাকুন, তার আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে ওধারে।'

'বললাম তো সে থার্ড-জেনারেশন। তার সেকেন্ড কাজিন কেউ থাকতেও পারে। তাতে কি হল ?'

'তাতে কিছু হয়েছে বলছি না। অনেকেরই নানা আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে ও দেশে। কিন্তু জেবাটিনস্কি তার নাম বদলে ফেলেছে।'

'বলে যাও।'

'হয়তো সে মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণের চেষ্টা করছে। হয়তো ওধারে জেবাটিনস্কির কোনো আত্মীয় খুব বিখ্যাত হয়ে উঠতে চলেছে। আর আমাদের জেবাটিনস্কি ভয় পাচ্ছে ভেবে এই আত্মীয়তা তার নিজের অগ্রগতির জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'এতে নাম পরিবর্তন করে কোনো ফায়দা হবে না। সে সেকেন্ড কাজিনই থাকবে তাছাড়া, তুমি ওপাশে আর কোনো জেবাটিনস্কি থাকে বলে শুনেছ ?'

'তা শুনিনি, স্যার।'

'তা হলে সে খুব বিখ্যাত কেউ হতে পারে না। আমাদের জেবাটিনস্কি তার কথা জানবে কি করে ?'

'নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে সে। আর এটাই বিশেষভাবে সন্দেহজনক। কারণ জেবাটিনস্কি একজন পরমাণু পদার্থবিজ্ঞানী।'

ব্রান্ড আবার চোখ বোলাতে লাগল ফোল্ডারে। বলল, 'বিষয়টি খুবই নগণ্য। এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে কি ?'

'তা হলে আপনি আমাকে বোঝান, স্যার, সে কেন এভাবে তার নাম পাল্টে ফেলবে ?'

'এটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, লেফটেন্যান্ট।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা উচিত। ওপারে জেবাটিনস্কি নামে কেউ আছে কিনা জানতে হবে। তারপর দেখব এ দুটি নামের জন্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা।' লেফটেন্যান্টের কণ্ঠ হঠাৎ নেমে এল, যেন নতুন কোনো আইডিয়া এসেছে মাথায়। 'সে নাম বদলাতে পারে ওদের কাছ থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে; মানে ওদের প্রটেক্ট জন্যে।'

'বরং উল্টোটাই সে করছে বলে আমার ধারণা।'

'তবে প্রটেকশন দেয়াটাই তার উদ্দেশ্য হওয়া বিচিত্র নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রান্ড। 'ঠিক আছে। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখব আমরা। তবে বিশেষ কিছু না পেলে এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না, লেফটেন্যান্ট। আর ফোল্ডারটা দিয়ে যাও। ওটা থাকুক আমার কাছে।'

তথ্যগুলো যখন পৌঁছাল ব্রান্ডের কাছে ততদিনে তো লেফটেন্যান্টের থিওরীর কথা ভুলে গেছে। তবে সতেরো জন রাশান এবং পোলিশ নাগরিকদের সকলের নাম জেবাটিনস্কি দেখে ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল তার। মানে কি এর ? ভাবল সে। তারপর পড়া শুরু করল।

শুরুটা হয়েছে আমেরিকার দিক থেকে। মার্শাল জেবাটিনস্কি (ফিঙ্গার প্রিন্ট)-এর জন্ম নিউইয়র্কের বাফেলোতে (হাসপাতালের ডেটও দেয়া আছে)। তার বাবারও জন্ম বাফেলোতে, মা-ও নিউইয়র্কের। তার দাদু-দিদিমা দু'জনেই জন্মগ্রহণ করেছেন পোল্যান্ডের বিয়ালিস্টকে। (আমেরিকায় তাদের প্রবেশের দিন তারিখ, নাগরিকত্ব গ্রহণের তারিখ, ছবি সবই আছে।)

সতেরো জন রাশান এবং পোলিশ নাগরিক, যাদের প্রত্যেকের নাম জেবাটিনস্কি, এরা অর্ধশতাব্দী আগে যারা বিয়ালিস্টকে বাস করত, তাদের বংশধর। তবে এদের বিস্তারিত বর্ণনা পড়ার আগ্রহ বোধ করল না ব্রান্ড। একটি নামের ওপর তার নজর আটকে গেল। এ নামটিকে সে আলাদা করে ফেলল চিহ্ন দিয়ে। তারপর ওই নামটি ছাড়া বাকি সবার নাম ও তথ্য খামে ভরে ফেলল।

বিশেষ নামটির দিকে তাকিয়ে রইল ব্রান্ড। ভাবছে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ফোন করল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ড. পল ক্রিসেন্টকে। তাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলল।

মুখ পাথর করে গল্পটা শুনলেন ড. ক্রিস্টো। মাঝে মাঝে কন্দের মতো মোটা নাকটা চুলকালেন আঙুল দিয়ে, অদৃশ্য ধুলো ঝাড়লেন। তাঁর চুলের রঙ মরিচা-ধূসর , ঘন, ছোট করে ছাঁটা।

তিনি বললেন, 'না, আমি জেবাটিনস্কি নামে কোনো রাশানের নাম শুনিনি। আমেরিকানেরও না।'

ব্রান্ড বলল, 'এর মধ্যে বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে

ব্যাপারটা এত শীঘ্রি বাদ দিতেও চাইছি না। এক তরুণ লেফটেন্যান্ট ব্যাপারটি নিয়ে লেগেই আছে আমার পেছনে। আর আমি এমন কিছু করতে চাই না যার কারণে এটা নিয়ে তাকে সংসদীয় কমিটিতে যেতে হয়। আর ঘটনাটা ঘটছে মিখাইল আন্দ্রেভিচ জেবাটিনস্কি নামে এক নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টকে নিয়ে। আপনি নিশ্চিত এর নাম কখন শোনেননি?'

'মিখাইল আন্দ্রেভিচ জেবাটিনস্কি? না-না। এ নাম কখনো শুনিনি।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে। তবে এ নিয়ে বড় রকমের কিছু একটা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। এক জেবাটিনস্কি এখানে, আরেকজন ওখানে। দু'জনেই নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, আর এখানকার জেবাটিনস্কি হঠাৎ করেই তার নাম বদলে রেখেছে সেবাটিনস্কি। আর সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছে "আমার নামের বানান করুন 'এস' দিয়ে।" আর এ নিয়ে সন্দেহ জেগেছে আমার গোয়েন্দা-সচেতন লেফটেন্যান্টের মনে। আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা হল রাশান জেবাটিনস্কি বছর খানেক আগে হঠাৎ নেই হয়ে গেছে।'

অবিচল ভঙ্গিতে ড. ক্রিস্টো বললেন, 'মেরে ফেলা হয়েছে!'

'হতে পারে। তবে প্রশ্ন হল হঠাৎ করেই একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট অদৃশ্য হয়ে যাবে কেন?'

'আপনি ওটার বায়োগ্রাফি আমাকে দিন,' ড. ক্রিস্টোর কাগজের টুকরোটা নিয়ে বার দুই চোখ বোলালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'এটা নিউক্লিয়ার অ্যাবস্ট্রাক্টে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

ড. ক্রিস্টোর স্ট্যাডি রুমের এক দিকের দেয়াল বোঝাই ছোট ছোট বাক্স। তার মধ্যে মাইক্রোফিল্ম ভর্তি। ওই দেয়াল আসলে একটা পর্দা। ওটাই নিউক্লিয়ার অ্যাবস্ট্রাক্ট।

ড. ক্রিস্টো প্রজেক্টার চালিয়ে দিলেন। তাঁর কাজ ধৈর্য ধরে দেখছে ব্রান্ড।

কিছুক্ষণ পরে ড. ক্রিস্টো বললেন, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

ব্রান্ড জিজ্ঞেস করল, 'কি অদ্ভুত?'

ড. ক্রিস্টো বললেন, 'এক্ষুণি এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছি না। আপনি কি অন্য নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টদের একটা লিস্ট দিতে পারবেন যারা গত বছর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন?'

'আপনি কিছু দেখতে পেয়েছেন ?'

'এই লোকের ওপর আমার সন্দেহ জোরদার হচ্ছে। মনে হচ্ছে লোকটা গামা-রে রিফ্লেকশনের সাফল্যের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'এর অর্থ ?'

'গামারে-র বিরুদ্ধে রিফ্লেক্টর শিল্ড বিভাজন করা গেলে, ইন্ডিভিজ্যুয়াল শেল্টারগুলো ফল-আউটের বিরুদ্ধে প্রটেকশন গড়ে তুলতে পারবে। এই ফল-আউটটা বিপজ্জনক, জানেন বোধ হয়। হাইড্রোজেন বোমা একটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে। তবে ফল-আউট হাজার হাজার মাইল জুড়ে সমস্ত মানুষকে আস্তে আস্তে মেরে ফেলতে সক্ষম।'

ব্রান্ড চট করে জানতে চাইল, 'আমরা এ নিয়ে কোনো কাজ করছি ?'

'না।'

'ওরা যদি এ কাজে সফল হতে পারে আর আমরা এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকি তা হলে ওরা আমেরিকাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারবে। বিশেষ করে তাদের শেল্টার প্রোগ্রাম শেষ হবার পরে।'

'সেটা ভবিষ্যতের কথা। এতে তাড়াহুড়োর কি আছে ? এ সব নিয়ে কথা হচ্ছে স্রেফ একজন মানুষ তার নামের প্রথম অক্ষরটা বদলে ফেলেছে বলেই তো!'

'ঠিক আছে। স্বীকার করছি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে,' বলল ব্রান্ড। 'তবে এখানেই ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে চাইছি না আমি। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীদের তালিকা যেভাবেই হোক আপনাকে জোগাড় করে দেব। প্রয়োজন মস্কো যাব, তবু।'

তালিকাটি পেয়ে গেল ব্রান্ড। তালিকা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। কমিশনে মিটিং ডাকা হল। জাতির সেরা সব মাথা সেই মিটিং-এ থাকলেন। এমন কি আমেরিকান প্রেসিডেন্টও। শেষে সিদ্ধান্ত হল আমেরিকানরাও ফিল্ড রিসার্চ শুরু করবে। তবে আমেরিকান জেবাটিনস্কি ওরফে সেবাটিনস্কিকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হল। ড. ক্রিস্টো বললেন, 'আমি সেবাটিনস্কির কাজ দেখেছি। সে লোক ভালো। তবে নিজের কর্মক্ষেত্র নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায় না সে।'

'তা হলে ?' জানতে চাইল ব্রান্ড।

‘লোকটা অ্যাকাডেমিক জব-এর জন্যে উপযোগী। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ব্যবস্থা করতে পারলে সে খুশি হবে বলে আমার ধারণা। এতে কাছ থেকে ওর ওপর চোখ রাখাও যাবে। কি বলেন।’

মাথা ঝাঁকাল ব্রান্ড সায় দেয়ার ভঙ্গিতে। ‘ব্যাপারটা নিয়ে চিফের সাথে কথা বলব আমি।’

দু’জনে লিফটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ব্রাণ্ড ভাবল, একটা নামের অক্ষর পরিবর্তন নিয়ে কত কিইনা ঘটে গেল।

পরিবর্তন ঘটল মার্শাল জেবাটিনস্কির জীবনেও। সে প্রিন্সটনের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেয়ে গেল। সেবাটিনস্কির স্ত্রী সোফি বলল, ‘নামটা বদলে ফেলে ভালোই করেছ। নাম পরিবর্তনের কারণেই তোমার ক্যারিয়ারের সমৃদ্ধি ঘটেছে।’

স্ত্রীকে সায় দিল সেবাটিনস্কি। তবে নামের আগে “জেড”-এর বদলে “এস” লাগানর কারণে তাকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ওসব নিয়ে এখন আর ভাবিত নয় সেবাটিনস্কি। সে ভেবেছে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির লোকজন তাকে জেরা করছে। অবশ্য পেছনের ঘটনা তার জানার কথা নয়। জানে না নাম পরিবর্তনের কারণে কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

বুড়ো নিউমেরোলজিস্টকে ধন্যবাদ জানাতে খুশি মনে তার অফিসে গেল সেবাটিনস্কি। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বুড়ো নেই। যেখানে “নিউমেরোলজিস্ট” সাইনটি ঝুলত এখন সেখানে “ঘর ভাড়া দেয়া হইবে” সাইনবোর্ড ঝুলছে।

অনুবাদ ঃ অনীশ দাস অপু

দ্য ইম্‌মোর্টাল বার্ড

'হ্যাঁ, অবশ্যই', বললেন ডঃ ফিনেস ওয়েলচ, 'আমি সব মহান মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে ফেরৎ আনতে পারি।'

হয় তিনি সামান্য মাতাল ছিলেন, অথবা এমন হতে পারে যে কথাটা তিনি বলেননি। অবশ্য বড়দিনের বাৎসরিক পার্টি উপলক্ষ্যে কেউ যদি একটু আধটু মাতাল হয়েও থাকে তাতে তেমন দোষের কিছু হয় না।

স্কুলের তরুণ ইংরেজীর ইন্‌স্ট্রাক্টর স্কট রবার্টসন নিজের গ্লাসটা ঠিক করতে করতে ডানে বামে দেখে নেন কেউ আবার তাদের কথা আড়ি পেতে শুনছে কিনা। 'সত্যি বলছেন ডঃ ওয়েলচ ?'

'আলবৎ বলছি, আর শুধু আত্মা না আমি শরীরটাকেও ফেরৎ আনতে পারি।'

রবার্টসন বেশ গুছিয়েই বলে, 'আমার মনে হয় এটা সম্ভব না।'

'কেন না ? এতো অতি সহজ একটা পার্থিব অদল বদলের ব্যাপার।'

'তার মানে আপনি সময় পরিভ্রমনের কথা বলছেন ? কিন্তু সেটা তো...অস্বাভাবিক।'

'তোমার যদি জানা থাকে ব্যাপারটা কিভাবে হয় তবে মোটেও অস্বাভাবিক না।'

'বেশ, তাহলে কিভাবে ডঃ ওয়েলচ ?'

পদার্থবিদ এবার বেশ ঠান্ডা মাথাতেই জবাব দেন, 'তুমি ভেবেছ আমি তোমাকে বলে দেব ?' তিনি অন্যমনস্কভাবে আরেকটা ড্রিঙ্ক নেবার জন্য এদিক ওদিক তাকালেন কিন্তু পেলেন না। তিনি বলে চললেন, 'আমি এর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে এনেছি, আর্কিমিডিস, নিউটন, গ্যালিলিও, বেচারারা সব।'

'তারা কি এখানে এসে খুব একটা খুশি হননি ? আমার তো মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড দেখে তাদের সব অবাক হয়ে যাওয়ার কথা,' বলে রবার্টসন। তার আসলে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে মজাই লাগছিল।

'হ্যাঁ তা তারা হয়েছিল, খুব হয়েছিল, বিশেষ করে আর্কিমিডিস, আমি যখন যৎসামান্য গ্রীক বিদ্যা জাহির করে তাকে এসব বুঝিয়ে বলছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল উনি বুঝি খুশিতে পাগলই হয়ে যাবেন। কিন্তু নাহ্...না না—'

'সমস্যাটা কোথায় ছিল ?'

'শুধু একটা ভিন্ন সংস্কৃতি। তারা আমাদের জীবন যাত্রার সাথে খাপ খাওয়াতেই পারলেন না। তার ভয়ানক একাকী এবং ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে তাই তাদের ফেরতই পাঠাতে হল।'

'এটা সত্যিই দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ মহান মানসিকতা কিন্তু নমনীয় মানসিকতা না। বৈশ্বিকও না। সেই জন্যই আমি শেক্সপিয়রকে দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছিলাম।'

'কি ?' রবার্টসন চিৎকার করে ওঠেন। এটা ক্রমেই ঘরের কাছাকাছি চলে আসছিল।

'আহা অমন করে চিল্লাতে নেই, ওটা এক ধরনের অভদ্রতা।'

'আপনি কি বলছেন যে আপনি শেক্সপিয়রকে ফেরৎ এনেছিলেন ?'

'এনেছিলাম, আমার একজন সত্যিকার বৈশ্বিক মানসিকতার মানুষের প্রয়োজন ছিল, এমন কেউ যে নাকি মানুষকে জানে খুব ভালো করে যাতে তার সময়ের কয়েক শতাব্দী পরেও তাদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে পারে। সেই মানুষটা শেক্সপিয়র ছাড়া আর কে ? আমি তার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছি, বুঝতেই পারছ স্মারকচিহ্ন হিসেবে।'

চোখ পিটপিট করে রবার্টসন জানতে চায়, 'আপনাকে দেয়া স্বাক্ষর ?:'

'এখানেই আছে', ওয়েলচ জামার এ পকেট সে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলেন। 'আহ্ পেয়েছি, এই যে সেটা।'

একটা ছোট্ট পেস্টবোর্ডে টুকরো ইন্সট্রাক্টরের দিকে এগিয়ে দেন। যার এক পিটে লেখা রয়েছে "এল ক্লেইন এন্ড সন্স, পাইকারী হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।" অন্যপিঠে আঁকা বাঁকা হাতে লেখা 'উইল ম শেখসপির' বুনো একটা সন্দেহ রবার্টসনকে পেয়ে বসে। 'উনি দেখতে কেমন ছিলেন ?'

'তাঁর ছবির মতো না, টাকমাথা এবং বিকট গুঁফো, কথা বলছিলেন আইরিশ উচ্চারণে, আমি অবশ্য আমাদের সময় সমন্ধে তাকে যতটা সম্ভব খুশি করতে চেষ্টা করছি। আমি তাকে বলেছিলাম যে তাঁর নাটক সমন্ধে আমরা কি উচ্চ ধারণা পোষণ করি এমনকি আজো পর্যন্ত যে ব্রডওয়েতে সেগুলো চলছে সে কথাও। সত্যি বলতে কি আমি তাকে বলেছিলাম যে আমরা মনে করি সেগুলো ইংরেজী ভাষার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা, এমনকি সব ভাষার সাহিত্য বিবেচনাতেও তা হতে পারে।'

'দারুন, দারুন।' দম না নিয়েই বলে যায় রবার্টসন।

'আমি তাঁকে বলেছিলাম লোকেরা তাঁর নাটকের ওপর কেমন গাদা গাদা প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি একটা অন্তত দেখতে চেয়েছিলেন আর আমি লাইব্রেরি থেকে তাঁর জন্য একটা সংগ্রহও করে দিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'আহ্, কি বলব, তিনি তো রীতিমত মুগ্ধ, তাঁর অবশ্য ইদানিং কালের বাগধারা টারা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছিল, আর ১৬০০ সালের পরের কোনো ঘটনার উল্লেখ থাকলেও ধরতে পারছিলেন না, তা আমি অবশ্য যথেষ্ঠ সাহায্য করেছি। বেচারা। আমার মনে হয় এমনটা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তিনি ঘুরে ফিরে খালি বলতেন "রক্ষা কর খোদা, পাঁচশ বছর সময়ে শব্দ নিয়ে কি না করা যায়! আমার মনে হয় এরা কেউ একজন চাইলে এক খণ্ড ভিজে ন্যাকড়া নিঙড়েই বন্যাও ঘটিয়ে দিতে পারবে।"'

'তার তো এটা বলার কথা না।'

'কেন না? তিনি তার নাটকগুলো যত জলদি সম্ভব লিখে শেষ করতেন। তিনি বলছিলেন তাকেও সময়সীমার মধ্যেই শেষ করতে হত। তিনি হ্যামলেট লিখেছিলেন ছয় মাসেরও কম সময়ে। কাহিনীতো পুরাতনই, তিনি শুধু সেটাকেই ঘসা মাজা করেছিলেন।'

'হুঁ ওরা টেলিস্কোপের আয়নার বেলা ঐ মোছামুছিটা করে।' ইংরেজির ইন্‌স্ট্রাক্টর বেশ রুষ্ট গলাতেই বলেন।

পদার্থবিদ অবশ্য তার ঐ রাগটাকে গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি বারে একটা ককটেল প্রস্তুত দেখে পাশ কাটিয়ে সেদিকেই গেলেন। 'আমি অবশ্য

অমর কবিকে এটাও বলেছিলাম যে আমরা কলেজেও শেক্সপিয়রের ওপর কোর্স করাই।'

'আমার নিজেরই একটা কোর্স আছে।'

'আমি জানি সেটা, আমি তোমার সন্ধ্যার বাড়তি কোর্সটাতে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম না যে মানুষ তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম তাকে নিয়ে কি ভাবে সেটা জানার জন্য এতটা উতলা হতে পারে। বেচারা। তিনি এটার জন্য প্রচুর খেটেছিলেন।'

'আপনি উইলিয়াম শেক্সপিয়রকে আমার কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন?' বিড়বিড় করে ওঠে রবার্টসন। যদিও এটা ছিল নিছকই একটা এ্যালকোহল ফ্যান্টাসি তবু চিন্তাটা তাকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তোলে। আর সত্যিই কি এ্যালকোহল ফ্যান্টাসি? তার একটু একটু করে মনে পড়তে থাকে ক্লাসে সত্যিই কেমন যেন সন্দেহভাজন একটা টাক মাথা লোক অদ্ভূত সব প্রশ্ন করত...

'অবশ্যই তার নিজের নামে না,' বলেন ডঃ ওয়েলচ। 'যাক তার ওপর দিয়ে যা গেছে তা নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। শুধু এটুকুই বলা যায় এটা ছিল ভুল, মস্ত ভুল। আহ্ বেচারা।, ককটেলটা ততক্ষণে তার হাতে চলে এসেছে এবং তিনিও সেটার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন।

'কেন? ভুল কেন? কি হয়েছিল?'

'আমাকে আবার তাকে ১৬০০ সালে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হয়েছে।' কঠোর গলায় গর্জন করে ওঠেন ওয়েলচ। 'তোমার কি মনে হয়? একটা মানুষ কতটা অবমাননা সহ্য করতে পারে?'

'আপনি কোনো... মানে কিসের অবমাননার কথা বলছেন?'

ডঃ ওয়েলচ তার ককটেলটা টোস্ট করেন। 'নির্বোধ। কেন মনে নেই, তুমি যে তাকে তোমার কোর্সে ফেল করিয়ে দিয়েছিলে।'

অনুবাদ: আসরার মাসুদ

ফ্রানশাইজ

লিন্ডার বয়স দশ, বাড়িতে একমাত্র সে-ই জেগে থাকতে পছন্দ করে।

নরম্যান মূলার আধো ঘুম আধো জাগরণের ভেতর লিন্ডার গলার আওয়াজ পাচ্ছিল। (শেষ পর্যন্ত সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিল প্রায় একঘন্টা আগে যদিও সেটা ছিল ঘুমের বদলে ক্লান্তিজনিত কারণে।)

লিন্ডা এখন তার বাবার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ধাক্কা দিয়ে বাবাকে বলল, 'বাবা, বাবা, ওঠো, ওঠো!'

নরম্যান যন্ত্রণা আড়াল করল। 'কী হয়েছে, লিন্ডা।'

'বাবা দেখ, অন্য সময়ের তুলনায় বাইরে পুলিশ অনেক বেশি। চারিদিকে পুলিশের গাড়ি!'

নরম্যান মূলার ঘুম থেকে ওঠে পড়ল। কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করল। সকাল হতে শুরু করেছে মাত্র। আকাশটা কেমন যেন ঘোলা ঘোলা, যেন বিষণ্ণ। মনটাও তার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। স্ত্রী সারাহ রান্না ঘরে সকালের নাস্তা বানাচ্ছে তার শব্দ শুনতে পেল। তার শ্বশুর ম্যাথিউ-র কাশির শব্দ আসছে বাথরুম থেকে। সন্দেহ নেই এজেন্ট হ্যান্ডলি তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।

আজ সেই দিন,

আজ নির্বাচনের দিন।

বছরটা শুরু হয়েছিল অন্য বছরগুলোর মতোই। হয়তো তার চেয়ে একটু খারাপ, কারণ বছরটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বছর। তবে অন্য সব নির্বাচন বছরগুলোর মতো এতটা খারাপ নয়।

রাজনীতিবিদরা গান-রিট ইলেক্টোরেট এবং ইলেক্ট্র-রনিক ইন্টেলিজেন্স ভৃত্য সম্পর্কে ভোটারদের কাছে বলছে। প্রেস কম্পিউটারের সাহায্যে পরিস্থিতি অ্যানালাইজ করছে (নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং সেন্ট লুই পোস্ট-ডেসপ্যাচ পত্রিকার নিজস্ব কম্পিউটার আছে) এবং ভবিষ্যতে কি কি হতে পারে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে। বক্তব্যদানকারী এবং নিবন্ধকাররা রাজ্য এবং কাউন্টিগুলো কে কোন ভূমিকা রাখবে সে নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশ করছে।

এ বছরটা অন্যরকম মোড় নিতে যাচ্ছে তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল সারাহ মূলার। ৪ অক্টোবরের, (নির্বাচন হতে আর মাত্র একমাস বাকি) সন্ধ্যায় তার স্বামীকে বলেছিল, 'শুনেছ কেন্টওয়েল জনসন বলেছে এবার ইন্ডিয়ানা রাজ্য বছরের সেরা রাজ্য হতে যাচ্ছে। তাকে নিয়ে এই কথা বলল চারজন। ভাবো একবার। আর আমাদের রাজ্য।'

ম্যাথিউ হরটেনওয়েলার খবরের কাগজের আড়াল থেকে মুখ বার করে, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন, 'ওদেরকে মিথ্যা বলার জন্যে টাকা দেওয়া হয়েছে। ওদের কথায় কান দিস না।'

'ওরা চারজন বলেছে, বাবা,' সারাহ নরম সুরে বলল। 'ওরা প্রত্যেকে ইন্ডিয়ানার কথা বলেছে।'

'ইন্ডিয়ানা রাজ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ', নরম্যানও নরম সুরে বলল, 'হকিন্স-স্মিথ আইনের বলে ইন্ডিয়ানা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, তাছাড়া সেবার ইন্ডিয়ানাপলিসে যা ঘটেছিল। ওটা—'

ম্যাথিউ রাগত চেহারা নিয়ে কাগজের আড়াল থেকে মুখটা বার করে বললেন, 'ওদের কেউ কিন্তু ব্লুমিংটন কিংবা মনরো কাউন্টির কথা বলেনি, বলেছে?'

'তা, ঠিক—' নরম্যান বলল

লিন্ডা এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল আর প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল যখন যে কথা বলছিল, সে এবার বলল, 'এবছর তুমি কি ভোট দিচ্ছ?'

নরম্যান সুন্দর করে হেসে বলল, 'মনে হয় না দেব।'

কিন্তু অক্টোবরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বাতাস ততদিনে গরম হয়ে

উঠেছে, সারাহ-র স্বপ্ন দেখার অভ্যেস আছে। সে বলল, 'তাহলে তো দারুণ হয়, তাই না?'

'আমি ভোট দিলে?' নরম্যান মূলারের হালকা সোনালী গোঁফের কারণে তাকে বেশ যুবক যুবক লাগে সারাহ-র কাছে, কিন্তু সেই গোঁফে এখন পাক ধরতে শুরু করেছে। ফলে তার চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন করে তুলেছে। কপালের বলিরেখা গভীর হওয়াতে অনিশ্চয়তার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। সে কোনোদিন নিজের সম্পর্কে উচ্চ কোনো ধারণা পোষণ করেনি। তার স্ত্রী আছে, একটা চাকরি এবং ছোট্ট একটি মেয়ে আছে। হয়তো কোনো হতাশার মুহূর্তে মনে হয়েছে তার প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তবে সে মনে করাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি।

তাই সে তার স্ত্রীর চিন্তাধারা কোথায় যাচ্ছে সেটা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছে। 'আসলে', সে বলল, 'প্রায় দুইশত মিলিয়ন মানুষ আছে দেশে, তাই এই বিষয়ে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো যুক্তি নেই।'

স্ত্রী বলল, 'কেন, নরম্যান, তুমি দুইশত মিলিয়ন বলছ তা ঠিক নয়, সেটা তুমি ভালো করেই জান। কুড়ি থেকে ষাট বছরের মধ্যে হতে হবে এবং পুরুষদের ভেতর থেকেই বাছা হয় তাহলে দাঁড়াচ্ছে পাঁচ কোটিতে এক। তারপর যদি ওরা সত্যি সত্যি ইন্ডিয়ানা—'

'তাহলে ওটা দাঁড়াচ্ছে কোয়ার্টার মিলিয়নে এক। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই সুযোগ নিয়ে ঘোড় দৌড়ে দৌড় দিতে বলছ না, ঠিক তো? চল, খেতে চল।'

ম্যাথিউ কাগজের আড়াল থেকে বিড় বিড় করে বললেন, 'বোকার হদ্দ।'

লিন্ডা আবার বলল, 'তুমি কি এ বছর ভোট দেবে, বাবা?'

নরম্যান মাথা ঝাঁকাল শুধু। ওরা সবাই খাবার ঘরে মিলিত হল।

২০ অক্টোবর, সারাহ-র উত্তেজনা চরমে পৌছাল। কফি খাওয়ার সময় সে বলল যে, মিসেস শুলজ্ বলেছে, তার চাচাত ভাই একজন এ্যাসেম্বলির সেক্রেটারি, যে সকল "টাকা" এখন ইন্ডিয়ানার দিকে।

'সে আরো বলেছে যে প্রেসিডেন্ট ভিলার্স ইন্ডিয়ানাপলিসে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন।'

নরম্যান মূলার, স্টোরে হাড়ভাঙা খাটুনি দেয় প্রতিদিন, সব শুনে শুধু ভ্রু জোড়া একবার উপরে তুলল তবে কিছু বলল না।

ম্যাথিউ হরটেনওয়েলার, যিনি ওয়াশিংটনের ওপর বিরক্ত, তিনি বললেন, 'ভিলার্স যদি ইন্ডিয়ানায় বক্তৃতা দেয় তাহলে বুঝতে হবে মাল্টিভ্যাক অ্যারিজোনাকে বেছে নিয়েছে। মাথা মোটা লোকটা কাছাকাছি যেতে ভরসা পাচ্ছে না।'

সারাহ তার বাবার কথায় তেমন আপত্তি জানাল না। বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না ওরা কেন দ্রুত কোনো রাজ্য ঘোষণা দিচ্ছে না, তারপর কোনো কাউন্টি ঘোষণা দিলেই পারে। তারপর যারা বাদ পড়ল তারা তো শান্তি পেতে পারে।'

'ওরা যদি তেমন করে থাকে', নরম্যান বলল, 'তাহলে রাজনীতিবিদরা শকুনের ঘোষণা অনুসরণ করবে। এরপর শহরের কোনায় কোনায় এক কি দুটো করে কংগ্রেসম্যান দেখা যাবে।'

ম্যাথিউ চোখ দুটো সরু করে তাকালেন এবং তার পেকে যাওয়া চুলে হাত বোলালেন। 'ওরা শুকুন, তাহলে শোনো—'

সারাহ বিড় বিড় করে বলল, 'শোনো বাবা—'

ম্যাথিউ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'শোনো, ওরা যখন মাল্টিভ্যাক বসাল তখন আমি ওখানে ছিলাম। ওরা বলেছিল, এর ফলে দলগত রাজনীতি শেষ হল। আর কোনো ভোটারের টাকা প্রচার অভিযানে খরচ করা হবে না। আর নয় দাঁত বের করা প্রচার চাপ সৃষ্টি করে কংগ্রেস কিংবা হোয়াইট হাউসে ঢোকান। এরপর কি হল। প্রচার কমল না ঠিকই, শুধু অন্ধের মতো প্রচার হতে শুরু করল। একদল লোক পাঠান হল ইন্ডিয়ানায় হওকিন্স-স্মিথ এক্টের বলে এবং অন্য একটি দলকে পাঠান হল ক্যালিফোর্নিয়ায় জো হ্যামারের কেস নিয়ে যেখানে ওই কেসটি জটিল রূপ নিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ওসব ছাড়, ফিরে যাও পুরান—'

লিন্ডা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি কি চাও না বাবা এই বছর ভোট দিক?'

ম্যাথিউ মেয়ের দিকে একবার তাকালেন। তারপর নরম্যান এবং সারাহ-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা সময় ছিল যখন আমি ভোট

দিয়েছি। সোজা হেঁটে গিয়েছি পোলিং বুথের দিকে, তারপর লিভার ধরে টান দিয়ে ভোট দিয়েছি। এর চেয়ে ভালো কিছু আর ছিল কি? আমি মনে মনে বলেছি; এই লোকটি আমার প্রার্থী এবং আমি তাকে ভোট দিলাম। এমনই হওয়া উচিত।'

লিন্ডা উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভোট দিয়েছিলে ? সত্যি ?'

সারাহ তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠল পাছে পাড়ায় এই কথাটা ছড়িয়ে যায় সেই ভয়ে। 'ও কিছু না, লিন্ডা। দাদা যে ভোটটা দিয়েছিল সেটা আসল ভোট নয়। ওই ধরনের ভোট সকলেই দিত, তোমার দাদাও দিয়েছে। কিন্তু ওটা আসল ভোট ছিল না।'

ম্যাথিউ রেগে বলে উঠলেন, 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ভোট দেওয়াটা ঠিক ভোট ছিল না। আমার বয়স যখন বাইশ তখন আমি ল্যাংলিকে ভোট দিয়েছিলাম এবং সেটাই আসল ভোট ছিল। আমার একটা ভোটে কিছুই যায় আসে না, তারপরেও। অন্য যে কোনো লোকের ভোটের যতটা গুরুত্ব ছিল আমারও ছিল ততটা। এবং কোনো মাল্টিভ্যাক ছিল না যে—'

নরম্যান বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, লিন্ডা, তোমার শোবার সময় হয়েছে। ভোট নিয়ে প্রশ্ন করাটা বন্ধ কর। যখন বড় হবে তখন তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে।'

নরম্যান তাকে চুমু খেল। ৯.১৫ মিনিট পর্যন্ত সে বিছানার পাশে বসে ভিডিও দেখতে পারবে বলে প্রতিজ্ঞা করল সে।

লিন্ডা বলল, 'দাদা,' দাদা কাগজটা না নামান পর্যন্ত লিন্ডা তার চেহারা নিচু করে দেখল তার দাদাকে। সেদিন ছিল শুক্রবার ৩১ অক্টোবর।

দাদা বললেন, 'বল ?'

লিন্ডা তার দুই কনুই দাদার হাঁটুতে রাখল যাতে খবরের কাগজটা গুটিয়ে সরিয়ে রাখেন।

লিন্ডা বললেন, 'দাদা, তুমি কি সত্যি একবার ভোট দিয়েছিলে ?'

দাদা বলল, 'তুমি তো শুনতে পেয়েছ আমি দিয়েছি, শুনতে পাওনি ? তুমি কি ভেবেছিলে আমি গল্প করেছি ?'

'না, না, কিন্তু মা বলল যে তখন সবাই ভোট দিত।'

'হ্যাঁ, দিত।'

'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে সবাই ভোট দিত ?'

ম্যাথিউ তার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর তাকে কোলে তুলে নিল।

গলার আওয়াজটা নরম করে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'শোনো, লিন্ডা, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে প্রত্যেকে ভোট দিত। ধর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হবে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নেব। ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা একজন করে নমিনি দিত, তারপর সকলেই বলত কাকে তাদের বেশি পছন্দ। নির্বাচনের পর গুনে দেখা হত ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীকে কয়জন চাইছে আর রিপাবলিকান দলের প্রার্থীকে কয়জন চাইছে। যে বেশি ভোট পেত সেই-ই প্রেসিডেন্ট হত। বুঝেছ ?'

লিন্ডা হাঁ সূচক মাথা নাড়ল তারপর বলল, 'কিন্তু মানুষ বুঝত কি করে কাকে ভোট দিতে হবে ? মাল্টিভ্যাক কি ওদের বলে দিত ?'

ম্যাথিউর ভ্রু কুঁচকে গেল, কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন, 'নিজেদের বুদ্ধি মোতাবেক কাজ করত, বুঝেছ।'

লিন্ডা দাদার কাছ থেকে চলে এল। দাদা গলা নিচু করে বললেন, 'আমি তোমার উপর রাগ করছি না, লিন্ডা। আসলে ব্যাপারটা হল গুনতে গুনতে বেশিরভাগ সময় সারা রাত লেগে যেত। এতে মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠত। তাই তারা একটি মেশিন বের করল যা দিয়ে অল্প কিছু ভোট দেখে একই জায়গার আগের বছরের ফলাফল তুলনা করে পুরো ফলাফল বলে দিবে। এইভাবে মেশিন গুনে বলে দেবে মোট ভোট কত এবং কে নির্বাচিত হয়েছে। বুঝেছ ?'

লিন্ডা মাথা নেড়ে বলল, 'যেমন, মাল্টিভ্যাক।'

'প্রথম দিককার কম্পিউটারগুলো ছিল মাল্টিভ্যাকের চেয়ে অনেক ছোট। তারপর মেশিনগুলো বড় হতে লাগল এবং ওগুলো বলে দিতে পারত ফলাফল, কম সংখ্যক ভোটের ফল দেখে। এরপর ওরা তৈরি করল মাল্টিভ্যাক এবং এটা একটি ভোট দেখেই ফলাফল বলে দিতে পারে।'

লিন্ডা পুরো গল্পটা শুনে বেশ মজা পেল, বলল, 'বাহ্ এটা ভালো।'

ম্যাথিউ কপাল কুঁচকে বললেন, 'না, এটা ভালো নয়। আমি চাইনা কোনো মেশিন আমাকে বলে দিক কিভাবে ভোট দিতে হবে কারণ মিলওয়াকির কিছু জোকার বলেছে তারা উচ্চ ট্যারিফের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি ভোট দেব তাকে কারণ আমি তাকে পছন্দ করি। হয়তো আমি তাকে ভোট দেব না। হয়তো—'

কিন্তু লিন্ডা ততক্ষণে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। দোরগোড়ায় তার মার সাথে দেখা হল। মার পরনে তখন কোটটা রয়েছে। মাথার টুপি খোলারও সময় পায়নি। দমবন্ধ করে মা বলল, 'একা একা এগোও, লিন্ডা। মার মতো এগুবে না।'

তারপর ম্যাথিউর দিকে তাকিয়ে মাথার টুপিটা খুলে চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'আগাথার ওখানে গিয়েছিলাম।'

ম্যাথিউ তার দিকে উৎসুক্য নিয়ে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

সারাহ কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'বুঝতে পারছ ও কি বলেছে ?'

ম্যাথিউ খবরের কাগজটা সোজা করলেন খড়মড় শব্দ তুলে। বলল, 'তা নিয়ে আমি ভাবছি না।'

সারাহ্ বলল, 'শোনো, বাবা—' না তার রাগ করার সময় নেই এখন। খবরটা দিতেই হবে। ম্যাথিউ-ই হল একমাত্র লোক যে খবরটা শুনতে আগ্রহী। 'আগাথার স্বামী জো একজন পুলিশের লোক সেটা তুমি জান। সে বলেছে গত রাতে এক ট্রাক সিক্রেট সার্ভিসের লোক ব্লুমিংটনে এসেছে।'

'ওরা নিশ্চয়ই পেছনে আসেনি।'

'কি যে বল, বাবা ? সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, এবং এটা ইলেকশনের সময়। ওরা ব্লুমিংটনে।'

'ওরা বোধ হয় কোনো ব্যাংক ডাকাত ধরার জন্য এসেছে।'

'শহরে কোনো ব্যাংক ডাকাতি হয়নি জানা মতে...বাবা, তুমি একটা হোপলেস।'

সারাহ হতাশ হয়ে চলে গেল।

খবরটা শুনে নরম্যান মূলারও তেমন কোনো উৎসাহ প্রকাশ করল না।

'আচ্ছা সারাহ, আগাথার স্বামী জো কি করে বুঝল ওরা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ?' শান্ত গলায় সে জিজ্ঞেস করল। 'তারা নিশ্চয়ই তাদের আইডেন্টিফিকেশেন কার্ড কপালে সেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে না।'

কিন্তু পরদিন দুপুরে, নভেম্বর তখন একদিনের পুরাতন হয়ে গেছে, সারাহ বিজয় গর্বে বলল, 'সবাই অপেক্ষা করে আছে ব্লুমিংটন থেকে একজন ভোটদাতা হতে চলেছে। ব্লুমিংটন নিউজে যেমন বলেছে, তেমন বলেছে ভিডিওতেও।'

নরম্যান অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। সে অস্বীকার করছে না খবরটা নিয়ে। মাল্টিভ্যাকের রশ্মি যদি ব্লুমিংটনে আঘাত হানে তাহলে তাদের স্বাভাবিক জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তার মানে খবরের কাগজের লোক, ভিডিও শো, টুরিস্ট, সব মিলিয়ে এক উদ্ভট কাজ কারবার। নরম্যান তার নিরুপদ্রব জীবনধারা পছন্দ করে। দূরে থাকা ঢেরা পেটান রাজনীতি কাছে এগিয়ে আসছে, এটা তার কাছে ভালো লাগছে না।

সে বলল, 'সব গুজব। আর কিছু না।'

'তাহলে অপেক্ষা করেই দেখ। ইউ জাস্ট ওয়েট এ্যান্ড সি।'

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। ডোর বেলটা বেজে উঠল তক্ষণি। নরম্যান মূলার দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কাকে চাচ্ছেন ?' দীর্ঘকায় গম্ভীর চেহারার একটি লোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি নরম্যান মূলার ?'

নরম্যান জবাবে বলল, 'হ্যাঁ,' তবে তার গলার জোর আগের মতো নেই। মিন মিন করে যেন বলল। আগন্তুকের চলন বলন দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে এতক্ষণ যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল।

আগন্তুক তার পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো বিড় বিড় করে বলে গেল, 'মিস্টার নরম্যান মূলার, যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাতে এসেছি যে ৪ নভেম্বর ২০০৮ মঙ্গলবার আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটদাতাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।'

নরম্যান মূলার কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাল।

চেয়ারটাতে বসল, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, প্রায় অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। সারাহ দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে এসে হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল আতঙ্কিত হয়ে। ফিস ফিস করে বলল, 'অসুস্থ হয়েও না নরম্যান, অসুস্থ হয়েও না। ওরা তাহলে অন্য কাউকে বেছে নিবে।'

নরম্যান যখন কথা বলতে পারল তখন সে ফিস ফিস করে বলল, 'আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না।'

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট কোট খুলল, তারপর জ্যাকেটের বোতাম খুলে আরাম করে সোফায় বসল।

'না, না ঠিক আছে,' সরকারি ঘোষণা জানিয়ে দেবার পর থেকে তাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং বন্ধুভাবাপন্ন মনে হচ্ছে। বলল, 'এই নিয়ে আমাকে ঘোষণাটা দিতে হয়েছে ছয়বারের মতো এবং সব ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখেছি আমি। তবে কারোর প্রথম প্রতিক্রিয়াই ভিডিওর মতো হয় না। কি বলছি বুঝতে পারছেন? একটা দেশ প্রেমে উজ্জিবীত চেহারা নিয়ে বলছে বক্তা, "দেশের জন্য কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।" এই ধরনের কথা আরকি।' এজেন্ট কথাগুলো বলে প্রাণখুলে হাসল।

সারাহ-ও হাসল কিন্তু হাসিটা যেন অপ্রকৃতিস্থ।

এজেন্ট বলল, 'এখন আমাকে কয়েকদিন আপনার পাশেপাশে থাকতে হবে। আমার নাম ফিল হেন্ডলি। আমাকে ফিল বলেই ডাকবেন। নির্বাচন দিন পর্যন্ত মিস্টার মূলার বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। মিসেস মূলার আপনি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে জানিয়ে দিন যে তিনি অসুস্থ। আপনি কাজে বের হতে পারেন তবে এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে পারবেন না। ঠিক আছে মিসেস মূলার?'

সারাহ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, স্যার একটা কথাও বলব না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু মিসেস মূলার', হেন্ডলি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমরা কিন্তু সিরিয়াস। বাইরে যাওয়া দরকার যাবেন, আমাদের লোক আপনাকে অনুসরণ করবে। আমি দুঃখিত কিন্তু আমরা এইভাবেই কাজ করতে বাধ্য।'

'ফলো করবে?'

'বোঝা যাবে না। চিন্তার কারণ নেই। এটা করতে হবে মাত্র দু'দিনের

জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসছে কে নির্বাচিত হল। আপনার মেয়ে—'

'সে ঘুমোচ্ছে,' সারাহ গলায় দ্বিধা নিয়ে বলল।

'ভালো। ওকে বলবেন আমি আপনাদের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু এবং আপনাদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকব। ও যদি সত্যি কথাটা জেনে ফেলে তাহলে তাকে বাড়িতেই আটকা থাকতে হবে। আর আপনার বাবার বাড়িতেই থাকা ভালো।'

'সেটা তার একেবারেই পছন্দ নয়', সারাহ বলল।

'কোনো উপায় নেই। আপনাদের সঙ্গে আর কেউ থাকে না যখন—'

'আমাদের সব বিষয় জানা আছে দেখছি,' নরম্যান ফিসফিস করে বলল।

'কিছুটা জানি', হেন্ডলি স্বীকার করল। 'এই মুহূর্তে আপনাদের জন্যে আপাতত আমার এই নির্দেশ। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্য করার জন্যে। সরকার আমার জন্যে খরচ করবে তাই আপনাদের কোনো বাড়তি খরচ হবে না। প্রতি রাতে আমি চলে যাব এবং সে জায়গায় অন্য একজন আসবে। সে এই ঘরেই বসে থাকবে, তাই আপনাদের শোবার ব্যবস্থা করার জন্যে ঝামেলা করতে হবে না। এবার শুনুন, মিস্টার মূলার—'

'জী স্যার ?'

'আপনি আমাকে ফিল বলেই ডাকবেন,' এজেন্ট বলল আবার। 'এই দুইদিন আপনার ভূমিকার জন্য আপনাকে তৈরি করে তোলা হবে। আমরা চাই আপনি মাল্টিভ্যাকের সামনে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকবেন। স্বাভাবিক থেকে মনে করবেন প্রতিদিনকার কাজই আপনি করছেন। ঠিক আছে ?'

'ঠিক আছে,' নরম্যান বলল, তারপরই সে তার মাথা ঝাঁকাল তীব্রভাবে। 'কিন্তু আমি কোনো দায় দায়িত্ব নিতে পারব না। আমাকে কেন ?'

'তাহলে শুনুন', হেন্ডলি বলল, 'সরাসরিই বলি। মাল্টিভ্যাক সব খুঁটিনাটি তথ্য জানে, কোটি কোটি তথ্য। যে তথ্যটা জানে না সেটা দীর্ঘদিন

পর্যন্ত জানে না। এটাই হল মানুষের চরিত্র। সব আমেরিকানরাই অন্যরা কি করছে কি ভাবছে তার দ্বারা প্রভাবিত। যে কোনো আমেরিকানকে মাল্টিভ্যাকের সামনে এনে তার মানবিক প্রবণতা যাচাই করা যায়। তা থেকে দেশের সবার মানসিক প্রবণতা বোঝা যায়। কিছু আমেরিকান কোনো এক বিশেষ বছরে কি ঘটেছে তার ওপর নির্ভর করে তাদের প্রতিক্রিয়া। মাল্টিভ্যাক আপনাকে এ বছরের সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক নাগরিক হিসেবে বেছেছে। সবচেয়ে চালাক কিংবা শক্তিশালী এবং সবচেয়ে ভাগ্যবান এর কোনোটাই নয় কিন্তু আপনি সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক। তাই আমরা মাল্টিভ্যাকের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলি না, তুলি কি?'

'ও কি ভুল করতে পারে না?' নরম্যান জিজ্ঞেস করল।

সারাহ শুনছিল অধৈর্যভাবে, সে এবার বলে উঠল, 'তার কথায় কান দেবেন না, স্যার। ও আসলে নার্ভাস। আসলে সে রাজনীতি সম্পর্কে ভালো জানে এবং ভালো বোঝে।'

হেন্ডলি বলল, 'মাল্টিভ্যাক সিদ্ধান্ত নেয়, মিসেস মূলার। এবার সে আপনার স্বামীকে বেছেছে।'

'কিন্তু ওটা কি সব জানে?' নরম্যান গোঁয়ারের মতো বলে উঠল। 'ওটার কি ভুল হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, হতে পারে। খোলাখুলি কথাই ভালো। ১৯৯৩ সালে একজন নির্বাচিত ভোটদাতাকে জানানর দুই ঘণ্টা আগে স্ট্রোকে মারা যায়। মাল্টিভ্যাক সেটা অনুমান করতে পারেনি; পারারও কথা নয়। একজন ভোটদাতা মানসিকভাবে দুর্বল হতে পারে কিংবা দেশের প্রতি আনুগত্যের অভাব থাকতে পারে। মাল্টিভ্যাকের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সব রকম তথ্য তাকে ফিড করা হচ্ছে। তাই একজন বিকল্প ভোটদাতা সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়। আমার মনে হয় না এবার তার দরকার হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো, মিস্টার মূলার এবং আপনাকে খুব সাবধানে অনুসন্ধান করা হয়েছে। আপনি সবগুলোতেই উৎরে গেছেন।'

নরম্যান হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইল।

'কাল সকালের মধ্যে, স্যার,' সারাহ বলল, 'ও ঠিক হয়ে যাবে। অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগবে।'

'অবশ্যই', হেন্ডলি বলল।

•

পরে বেডচেম্বারে যখন ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ রইল না, তখন সারাহ ধমকের সুরে বলে উঠল, 'নিজেকে শক্ত কর, নরম্যান। এমন সুযোগ ক'জনের জীবনে আসে।'

নরম্যান মরিয়া হয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, সারাহ। পুরো ব্যাপারটা।'

'ওহ্ খোদা, কেন ? তোমাকে তো কিছুই করতে হবে না, শুধু দু'টো কি একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'এ দায়িত্ব অনেক বড়। আমি পারব না।'

'দায়িত্ব কিসের ? কোনো দায়িত্ব নেই। মাল্টিভ্যাক তোমাকে বেছেছে। দায়িত্বটা মাল্টিভ্যাকের। সবাই সেটা জানে।'

নরম্যান বিছানায় উঠে বসল হঠাৎ বিদ্রোহ এবং রাগ থেকে। চেঁচিয়ে বলল 'প্রত্যেকেই হয়তো ব্যাপারটা জানে। কিন্তু তারা জানে না। তারা—'

'নিচু গলায় কথা বল,' ঠাণ্ডা গলায় সারাহ বলল। 'তোমার কথাগুলো শহরের সবখান থেকে শোনা যাবে।'

'না শুনতে পাবে না,' নরম্যান বলল, দ্রুত তার গলার স্বর নামিয়ে ফেলল। 'ওরা যখন ১৯৮৮ সালের রিজলেই প্রশাসন সম্পর্কে বলে, ওরা কি তখন বলে কিভাবে জিতেছিল ? না বলে না। তারা বলে "জঘন্য ম্যাককোম্বার ভোট" বলে, যেন হামফ্রে ম্যাককোম্বারই হল সেই মানুষ যে যা ইচ্ছে করতে পারে কারণ সেই-ই মাল্টিভ্যাকের মুখোমুখি হয়েছিল। আমি নিজেকে বলেছি এবং ভেবেছি গ্রামের হতভাগ্য ওই কৃষক কিন্তু বলেনি তার নামটা বেছে নিতে। তাহলে এটা তার দোষ হবে কেন ? এখন তার নাম একটি অভিশাপ।'

'তুমি তো দেখছি পাগল হয়ে গেছ,' সারাহ বলল।

'আমি সচেতন। সারাহ, আমি তোমাকে বলেছি এই প্রস্তাব আমি মানব না। ওরা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াতে পারবে না। বলব আমি অসুস্থ। আমি বলব—'

সারাহ-র ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। 'আমার কথা শোনো,' সে ফিস ফিস করে বলল। 'তুমি শুধু তোমার কথাই বলতে পার না। ভোটার অব দ্য ইয়ারের মানে তুমি জান। এর মানে হল প্রচার, সম্মান এবং ঝুড়ি ভর্তি টাকা—'

'এবং তারপর আবার কেরানীর কাজে ফিরে যাওয়া।'

'তা হবে কেন। মাথায় বুদ্ধি থাকলে তোমাকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বানাবে, তোমাকে করবেই যদি আমার কথা মতো চল। তোমার হাতের কার্ড ঠিকমতো চালতে পারলেই প্রচার কন্ট্রোলে চলে আসবে। তুমি কেনেল স্টোরেজের কাছে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। তোমার বেতন বাড়াতে পারবে এবং চাকরির পর পেনশানও বাড়াতে পারবে।'

'ভোটদাতার অর্থ তো তা নয় সারাহ।'

'এটা তোমার ভাবনা। তুমি যদি তোমার জন্য কিংবা আমার জন্য—আমার কথা বাদই দিলাম—তুমি অন্তত লিন্ডার জন্য কিছু করো।'

নরম্যান আর্তনাদ করে উঠল।

'কি ভাবছ, করবে না?' সারাহ বাধা দিয়ে বলল।

'ঠিক আছে করব,' বিড় বিড় করে বলল নরম্যান।'

৩ নভেম্বর সরকারি ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেল। নরম্যানের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। অবশ্য সে সাহসও তার ছিল না।

তাদের বাড়ি একেবারে সীল করে দেওয়া হল। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাদের বাড়ির বাইরে যেতেও বাধা দিচ্ছে এবং সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে কেউ এসে দেখা করবে তারও কোনো উপায় রইল না।

প্রথম দিকে টেলিফোন বাজত ঘন ঘন, কিন্তু ফিলিপ হেন্ডলি অমায়িক হাসি দিয়ে প্রতিবার ফোন তুলত। এরপর এক্সচেঞ্জ থেকে প্রতিটা কল থানায় ডাইভার্ট করে দেওয়া হল।

নরম্যান ভেবে দেখল এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। বন্ধুদের অভিনন্দনের (নাকি ঈর্ষা) ঠেলায় জান কাবাব হয়ে যেত। তাছাড়া সেলসম্যানদের ফোন, রাজনীতিবিদদের ফোন...এমনকি লাইফ থ্রেট করতেও ছাড়ত না।

খবরের কাগজ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি লিন্ডার তীব্র প্রতিবাদের পরও টেলিভিশনের কানেকশন কেটে দেওয়া হয়েছে।

ম্যাথিউ ঘরে বসে থাকলেন আর গজ গজ করতে লাগলেন; লিন্ডা প্রথম দিকে খুব উৎসাহিত হয়েছিল কিন্তু বাইরে যাওয়া বন্ধ হওয়ার ফলে সে খুব বিপদে পড়ল; সারাহ তার সময় ভাগ করে নিয়েছে রান্নাবান্না আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনার ছক বানান নিয়ে; নরমান ধীরে ধীরে মনমরা হয়ে পড়ছিল।

অবশেষে ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার ২০০৮ সালের সকাল হল। আজ ইলেকশনের দিন।

সকাল সকাল নাস্তা তৈরি, কিন্তু শুধু নরম্যান মূলারই খেল। গোসল এবং সেভ করার পরও তার নিজের কাছে কেমন যেন নোংরা নোংরা লাগছিল।

হেন্ডলি এমন মনমরা পরিবেশকে চাঙ্গা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল। (আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে যে দুপুরের আগেই বৃষ্টি হতে পারে।)

হেন্ডলি বলল, 'মিস্টার মূলার ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়িটা এমনই থাকবে। তারপর উনি ফিরে এসে আমরা বিদায় নেব।' সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আজ তার ইউনিফর্ম পরেছে। এমনকি একটি শক্তিশালী অস্ত্রও ঝুলছে তার কাঁধ থেকে।

'আপনারা আমাদের কোনো অসুবিধা করেননি, মিস্টার হেন্ডলি,' সারাহ কাষ্ঠহাসি মুখে এনে বলার চেষ্টা করল।

নরম্যান দুই কাপ কফি খেয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'আমি প্রস্তুত।'

হেন্ডলিও উঠে দাঁড়াল। 'বেশ, তাহলে চলুন, মিসেস মূলার আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার আতিথেয়তার জন্যে।'

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আর্মাড কার ছুটে চলল। যদিও এত সকালে রাস্তা সাধারণতঃ ফাঁকা থাকে না।

হেন্ডলি সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, '১৯৯২ সালের লেভেরেট

ইলেকশনকে বোমা মেরে ভণ্ডুল করার চেষ্টা হয়েছিল, তারপর থেকে রাস্তা ফাঁকা রাখা হয়।'

গাড়ি যখন থামল তখন বিনীত হেন্ডলি নরম্যানকে আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রাইভ-এর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দুই পাশের দেয়ালে সৈন্যরা সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা তাকে নিয়ে গেল জোরাল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে। সেখানে তিনজন সাদা ইউনিফর্ম পরা লোক হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করল।

নরম্যান রাগত গলায় বলে উঠল, 'এ কি, এটা যে হসপিটাল।'

'তাতে কোনো অসুবিধা নেই,' সঙ্গে সঙ্গে হেন্ডলি বলে উঠল। 'এটা সেই হসপিটাল যার সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে।'

'বেশ, কিন্তু আমাকে এখানে কি করতে হবে?'

হেন্ডলি মাথা দুলাতেই তিন সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আমি এখন তাঁর দায়িত্ব নিচ্ছি, এজেন্ট।'

হেন্ডলি স্যালুট ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাদা পোশাকের লোকটি বলল, 'মিস্টার মূলার, আপনি বসুন। আমি জন পলসন, সিনিয়র কম্পিউটার। আর এরা দু'জন হল স্যামসন লেভিন এবং পিটার ডোরোগোবুজ, আমার সহকারী।'

ভাবলেশহীনভাবে নরম্যান তাদের সাথে করমর্দন করল। পলসন লোকটা লম্বায় মাঝারি, হাসি হাসি মুখ, মাথায় পরচুল। চোখে পুরান ফ্যাশানের প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা। কথা বলতে বলতে সে একটা সিগারেট ধরাল। (নরম্যানকে সিগারেট অফার করায় সে নিল না।)

পলসন বলল, 'প্রথমেই বলে রাখি আমাদের তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মিস্টার মূলার। দরকার হলে সারাটা দিন আমাদের সাথেই কাটান, যাতে এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে এই সব ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন, বুঝেছেন?'

'ঠিক আছে,' নরম্যান বলল। 'তাড়াতাড়ি শেষ হলে বাঁচি।'

'আমি আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। তারপরেও আমরা আপনাকে স্পষ্ট ধারণা দিতে চাই কি হতে চলেছে। প্রথম কথা হল, মাল্টিভ্যাক এখানে নেই।'

'এখানে নেই ?' সে একটু যেন হতাশ হল। মাল্টিভ্যাক দেখার জন্যই ওর কৌতূহল। লোকে বলে মাল্টিভ্যাক আধ মাইল লম্বা এবং তিন তলা সমান উঁচু, ওর বারান্দা দিয়ে পঞ্চাশজন টেকনিশিয়ান সব সময় পায়চারী করছে। এটা পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিসগুলোর মধ্যে একটি।

পলসন তার মনের ভাব বুঝে হেসে বলল, 'না, আপনি হয়তো জানেন ওটা পর্টেবল নয়। ওটা মাটির তলায় আছে, অল্পসংখ্যক লোকই জানে ওটা কোথায়। বুঝতেই তো পারছেন ওটা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বাস করুন, ইলেকশনের কাজই তার একমাত্র কাজ নয়।'

নরম্যান ভাবল লোকটা ইচ্ছে করেই বেশি কথা বলছে যাতে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। 'ভেবেছিলাম ওটা দেখতে পাব। আমি ওটা দেখতে চাই।'

'তা তো অবশ্যই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওটার জন্যে প্রেসিডেন্টসিয়াল অর্ডার চাই এবং সেই সাথে নিরাপত্তা দপ্তরের ছাড়পত্র। সে যাই হোক, আমরা মাল্টিভ্যাকের সাথে বীম ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যুক্ত আছি। মাল্টিভ্যাক যা বলবে এখানে তার ব্যাখ্যা করা যাবে এবং আমরা যা বলব তা সোজা মাল্টিভ্যাকে বীম করে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। অন্যভাবে বললে আমরা ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।'

নরম্যান আশেপাশে তাকিয়ে দেখল চারিদিকে নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। এর কোনটারই তার কাছে কোনো অর্থ নেই।

'আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, মিস্টার মূলার,' পলসন বলল। 'জাতীয়, প্রাদেশিক এবং জাতীয় নির্বাচনের জন্য যত রকমের তথ্য দরকার তার সবই মাল্টিভ্যাকের জানা আছে। শুধু অনুমান করা যায় না এমন কিছু মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করে দেখার অপেক্ষা। আমাদেরকে কি প্রশ্ন করা হবে সেটা আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। হয়তো সেগুলোর বেশির ভাগই আপনার কিংবা আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে। হয়তো জিজ্ঞেস করবে শহরের ময়লা পরিষ্কার করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি; আপনি কি ওগুলো এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলার পক্ষপাতি। হয়তো জিজ্ঞেস করবে আপনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছে নাকি আপনি নিজেই ন্যাশনাল মেডিসিনেই আছেন। বুঝতে পারছেন তো ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'ওটা যে প্রশ্নই করুক না কেন আপনি আপনার মতো করে উত্তর দেবেন, যেমন ভাবে আপনার খুশি। যদি মনে করেন ভালো করে বোঝাতে এক ঘণ্টা লাগবে, সময় নিন প্রয়োজনে।'

'বুঝেছি।'

'আর একটা কথা, আমরা কতগুলো খুব সাধারণ ডিভাইস ব্যবহার করব, যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার রক্তের চাপ, হার্টবিট, চামড়ার পরিবাহিতা এবং ব্রেন-ওয়েভ প্যাটার্ন ইত্যাদি রেকর্ড করবে। মেশিনগুলো দেখতে খুব ভয়াবহ কিন্তু মোটেও যন্ত্রণাদায়ক নয়। আপনি টেরই পাবেন না।'

ইতোমধ্যে অন্য দুই টেকনিশিয়ান চাকাওয়ালা চকচকে অ্যাপারেটাস নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

নরম্যান জিজ্ঞেস করল, 'এইসব কি ব্যবহার করা হচ্ছে, আমি মিথ্যা বলছি কিনা তা দেখার জন্যে?'

'ঠিক তা নয়, মিস্টার মূলার। মিথ্যা বলার প্রশ্নই আসে না। এগুলো শুধু মানসিক আবেগ রেকর্ড করার জন্যে। যদি মেশিন আপনাকে প্রশ্ন করল আপনার ছেলের স্কুল সম্পর্কে, আপনি হয়তো বললেন, "স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বেশি।" এটা হল মুখের কথা। আপনার ব্রেন এবং হার্ট হরমোন এবং ঘামের গ্ল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া থেকে মাল্টিভ্যাক বিচার করবে এই বিষয়ে আপনি কতটা উত্তেজনা অনুভব করছেন। আপনার অনুভূতি আপনার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারবে মাল্টিভ্যাক।'

'এমনতর কথা আমি কখনো শুনিনি,' নরম্যান বলল।

'না, আমি নিশ্চিত আপনি শোনেননি। মাল্টিভ্যাকের কর্মপদ্ধতি গোপন রাখাটাই আমাদের কাজ। আপনাকে ছেড়ে দেবার আগে একটা কাগজে সই নেওয়া হবে যে, আপনি প্রতিশ্রুতি দেবেন যে আপনাকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কি উত্তর দিয়েছিলেন, কিংবা কি করা হয়েছিল, কিভাবে করা হয়েছিল, এসব কিছুই আপনি প্রকাশ করবেন না। মাল্টিভ্যাক সম্পর্কে বাইরের লোক যত কম জানবে তাতে আমরা যারা এখানে কাজ করি তাদের পক্ষে অনেক ভালো।' সে দাঁত বের করে হাসল। 'এমনিতেই আমাদের জীবন অনেক কঠিন হয়ে আছে।'

নরম্যান মাথা হেলিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি।'

'এবার আপনি কিছু খেতে বা পান করতে চান?'

'না। এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আপনার কোনো প্রশ্ন আছে?'

নরম্যান মাথা নাড়ল।

'তাহলে আপনি যখন তৈরি হবেন, আমাদেরকে বলবেন।'

'আমি প্রস্তুত আছি।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'সম্পূর্ণভাবে।'

পলসন মাথা নাড়ল এবং হাত নেড়ে অন্য দু'জনকে ইশারা করল। ওরা ভয়াল দর্শন যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে লাগল। নরম্যান মূলার দেখল ওইসব যন্ত্রপাতি দেখে তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে।

প্রায় তিনঘণ্টা ধরে নরক যন্ত্রণা চলল, মাঝে একবার কফি বিরতি ছিল, তারপর আবার সেই একই অবস্থা। সর্বক্ষণই নরম্যান মূলার ছিল নানারকম কলকব্জার সঙ্গে বাঁধা। কাজ শেষে সে প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

এখানে আজ কি হল সেসব গোপন রাখার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ায় তার হাসি পেল। ইতোমধ্যে সব তালগোল পাকাতে শুরু করেছে। কি প্রশ্ন করা হয়েছিল তা তার নিজেরই মনের ভেতর ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে।

ওর কাছে মাল্টিভ্যাকের গলার আওয়াজ যান্ত্রিক এবং সুপারহিউম্যান মনে হয়েছিল, কেন মনে হল তার কারণ জানে না, তবে তার ধারণা সম্ভবত বেশি টেলিভিশন দেখার ফল। সত্য ঘটনায় কোনো নাটকীয়তা নেই। প্রশ্নগুলো ম্যাটালিক ফয়েলে ফুটো ফুটো করা। অন্য একটি মেশিনে ওগুলো বাক্যে রূপান্তরিত হয়। পলসন পড়ে শোনাল প্রশ্নগুলো তারপর সেটা তার হাতে ধরিয়ে দিল পড়ার জন্যে।

নরম্যানের উত্তরগুলো রেকর্ডিং মেশিনে রেকর্ড করা হল। তারপর সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নরম্যানকে বাজিয়ে শোনান হল, যদি কোনো সংশোধনী থাকে। এরপর সেটা প্যাটার্ন তৈরির মেশিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, তারপর সেটা সরাসরি মাল্টিভ্যাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শুধু একটা প্রশ্নই নরম্যানের মনে পড়ল : 'ডিমের দাম সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?'

অবশেষে প্রশ্ন করা শেষ হল। ওরা ওর শরীর বিভিন্ন অংশ থেকে ইলেকট্রোড এবং ব্যান্ডগুলো খুলে নিতে লাগল। তারপর যন্ত্রপাতিগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে লাগল।

নরম্যান উঠে দাঁড়াল। একটা লম্বা শ্বাস টেনে জিজ্ঞেস করল, 'সব হয়েছে ? আমি যেতে পারি ?'

'এখন নয়।' পলসন দ্রুত তার সামনে এসে আশ্বাস দেবার মতো করে হাসল। 'আমরা আপনাকে আর এক ঘন্টা এখানে থাকতেই অনুরোধ করছি।'

'কেন ?' রেগে গিয়ে নরম্যান জিজ্ঞেস করল।

'মাল্টিভ্যাককে এইসব নতুন তথ্যগুলো, যেখানে কোটি কোটি তথ্য জমা আছে, সাজাবার জন্যে সময় দিতে হবে। হাজার হাজার ইলেক্ট্রনিক্সের কাজ এগুলো, বুঝতে পারছেন। জটিল বিষয়। নির্বাচন তো অনেক হল, ফোনিক্স, অ্যারিজোনা অথবা ইউলকোসবোরোর কোথাও, নর্থ ক্যারোলিনায়। বলা তো যায় না কোথাও সন্দেহ দেখা দিল। তখন হয়তো মাল্টিভ্যাক আপনাকে দুই একটি প্রশ্ন করতে পারে জরুরি ভিত্তিতে।'

'না,' নরম্যান বলল। 'আমি আর পারব না।'

'হয়তো এমন হবে না,' পলসন ঠাণ্ডা স্বরে বলল। 'এটা কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে "থাকতে" হবে।' তারপর তার গলা লোহার মতো কঠিন করে বলল, 'আপনার কোনো উপায় নেই, সেটা আপনি জানেন।'

নরম্যান হতাশ হয়ে বসে পড়ল। কাঁধটা একবার ঝাঁকাল।

পলসন বলল, 'আপনি খবরের কাগজ পড়তে পারবেন না, তবে রহস্য গল্প উপন্যাস পড়তে চাইলে বলুন, কিংবা দাবা খেলতে চাইলে খেলতে পারেন। অথবা সময় কাটানর জন্য অন্য কিছু থেকে আপনার কাছে তাহলে সেটা করুন। আমার মনে হয় সেটা বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি।'

ওরা ওকে পাশের একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেল। যে ঘরে তাকে প্রশ্ন

করা হয়েছিল ঠিক তার পাশের ঘর এটি। নরম্যান একটা প্লাস্টিকে ঢাকা গদিওয়ালা চেয়ার দেখে তাতে বসে চোখ বুজল।

শেষ ঘণ্টাটি তাকে এইভাবেই কাটিয়ে দিতে হবে।

নরম্যান অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ধীরে ধীরে উত্তেজনা নিয়মিত হয়ে স্বাভাবিক অনুভূতি ফিরে আসছিল তার। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। হাত মুঠো করতে গেলে আঙুল কাঁপছিল না।

হয়তো আর প্রশ্ন করা হবে না। হয়তো সব শেষ হয়েছে।

যদি সব শেষ হয়ে থাকে তাহলে ওকে মশাল মিছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। সে যে ভোটার অব দ্য ইয়ার!

সে, নরম্যান মূলার ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনের একটি ছোট্ট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্লার্ক। মহৎ লোক হিসেবে জন্ম হয়নি তার, মহৎ হবার জন্য চেষ্টাও করেনি, কিন্তু মহত্ত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল।

ঐতিহাসিকরা ২০০৮ সালের মূলারের ইলেকশন নিয়ে আলোচনা করবেন। ওর নাম দিয়েই চিহ্নিত হবে এ বছরের নির্বাচন, মূলার নির্বাচন।

প্রচার, ভালো চাকরি, কাড়ি কাড়ি টাকা, সবই সারাহকে খুব আনন্দ দেবে। হয়তো তার মনও তাই চাইছে। সে অবশ্যই স্বাগত জানাবে। প্রত্যাখান করবে না এইসব অফার। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে অন্য কিছু নিয়ে ভাবছিল।

ওটা হল দেশপ্রেমের আলো। আফটার অল, সে তো সমস্ত দেশের ভোটদাতাদের প্রতিনিধি। সে তাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে একদিনের জন্যে একজন ব্যক্তি মাত্র নয়, সে সমস্ত আমেরিকার।

দরজাটা খুলে গেল, পিঠ সোজা করে বসে চোখ খুলল। এক মুহূর্তের জন্যে তার পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠল। আবার প্রশ্ন করা হবে নাকি!

কিন্তু পলসনের মুখে হাসি। 'সব হয়ে গেছে, মিস্টার মূলার।'

'আর প্রশ্ন করা হবে না?'

'তার দরকার নেই। সবকিছু ঠিকঠাক মতোই হয়েছে। আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে, তারপর থেকে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাবেন। অর্থাৎ জনগণ যতটা দেবে।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' নরম্যানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'কে নির্বাচিত হল?'

পলসন তার মাথা নাড়ল। 'সরকারি ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিয়ম কানুন খুব কড়া। আমরাও আপনাকে বলতে পারব না। বুঝতে পারছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো অবশ্যই,' নরম্যান বিব্রত বোধ করল।

'সিক্রেট সার্ভিস লোকেরা আপনাকে কিছু কাগজ সই করতে দেবে।'

'অবশ্যই,' হঠাৎ যেন নরম্যান মূলার গর্ব বোধ করতে লাগল, আত্মবিশ্বাসে সে এখন বলিয়ান।

জগতটা নিঁখুতভাবে চলে না। তারই ভেতর দিয়ে পৃথিবীর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম ইলেকট্রনিক গণতন্ত্রের দেশের জনগণ নরম্যান মূলারের মাধ্যমে (তার মাধ্যমে!) অবাধ ও স্বাধীন মত প্রকাশ করার সুযোগ পেল।

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

দ্য সিক্রেট সেন্স

স্ট্রাস ওয়ালজের একটানা মধুর লয়ে পূর্ণ হয়ে আছে ঘর। লিঙ্কন ফিল্ডসের সংবেদনশীল আঙুলের নিচে বাজনাটি যেন ধীরে ধীরে মিইয়ে আসতে লাগল। আধাবোজা হয়ে আছে লিঙ্কনের চোখ সুরের মূর্চ্ছনায়। সঙ্গীত তাকে সবসময় এভাবেই প্রভাবিত করে। মন ভরে যায় অদ্ভুত সুন্দর সব স্বপ্নে, ঘরটা পরিণত হয় ধ্বনির স্বর্গে। শেষবারের মতো পিয়ানোর কি বোর্ডে লিঙ্কনের আঙুল দ্রুত ছুঁয়ে গেল। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল বাজনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিঙ্কন ফিল্ডস। এক মুহূর্ত রইল চুপ হয়ে। যেন মৃতপ্রায় প্রতিধ্বনি থেকে সুন্দরের শেষ গন্ধটা পেতে চাইছে। তারপর সে ঘুরে বসল, অস্পষ্ট হাসল ঘরের আরেক বাসিন্দার দিকে তাকিয়ে।

জবাবে পার্থ জ্যানও হাসল। তবে কিছু বলল না। লিঙ্কন ফিল্ডসকে পছন্দ করে সে। যদিও দু'জনের মধ্যে বোঝাপোড়াটা কম। তারা দুই ভুবনের মানুষ—পার্থ মঙ্গলগ্রহের আন্ডারগ্রাউন্ড নগরীর একজন, আরেকজন, ফিল্ডস, নিউইয়র্কের টেরেসট্রিয়াল বাসিন্দা।

'কেমন লাগল, পার্থ?' জিজ্ঞেস করল ফিল্ডস।

মাথা ঝাঁকাল পার্থ। স্বভাব সুলভ ভাঙ্গিতে ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'মনোযোগ দিয়ে তোমার বাজনা শুনেছি। মন্দ লাগে নি। ওটার নির্দিষ্ট একটা ছন্দ আছে, আছে মিষ্টিলয়। তবে খুব সুন্দর কিন্তু বলা যাবে না।'

কথাটা শুনে করুণা ফুটল ফিল্ডসের চোখে। মার্শিয়ান পার্থ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও কিছু বলল না। সে তার বিশাল শরীর নিয়ে চেয়ারে বসে রইল। প্রকাণ্ড শরীরের তুলনায় চেয়ারটাকে ছোটই লাগছে।

ফিল্ডস নিজের আসন ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল অধৈর্য ভঙ্গিতে, সঙ্গীর হাত চেপে ধরে বলল, 'এস! এখানটিতে বস তুমি!'

পার্থ ? অনুগতের মতো পালন করল নির্দেশ। বলল, 'তুমি কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাও দেখছি।'

'ঠিক ধরেছ। আমি জানি পৃথিবীবাসী আর মঙ্গলবাসীর মধ্যেকার সেন্স-ইকুইপমেন্টের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'তবে ব্যাপারটা কখনো উপলব্ধি করতে পারিনি আমি।'

সি এবং এক নোটে আঙুল দিয়ে চাপ দিল সে, মার্শিয়ানের দিকে তাকাল অনিসন্ধিৎসু চোখে।

'পার্থক্য থাকলেও,' বলল পার্থ, 'সেটা সামান্যই। ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বাজনাটা শুনলেই বলে দিতে পারতাম তুমি একই সুর দু'বার বাজিয়েছ।'

ফিল্ডস সি এবং জিতে চাপ দিল। 'এখন কেমন শোনাচ্ছে ?'

'এবার পার্থক্যটা বোঝা যাচ্ছে।'

'তোমরা, মার্শিয়ানরা আসলে মধুর কিছু শোনা থেকে বঞ্চিত। তোমরা জানওনা কি মিস করছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল পার্থ। 'যার কিছু নেই তার হারাবারও কিছু নেই।'

'কিন্তু তুমি যদি জানতে চাও সত্যি কি হয়েছে,' বলল ফিল্ডস। 'তোমরা কখনো সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করোনি। দেখনি খোলা বাগানে হাজারো ফুলের মৃত্যু। নীল আকাশের রং দেখে কখনো মুগ্ধ হবার সুযোগ পাওনি তোমরা, দেখনি সবুজ ঘাস কিংবা সোনালি শস্যের অপার সৌন্দর্য। তোমাদের পৃথিবীতে রয়েছে শুধু আলো-আঁধারির খেলা।' কি ভেবে শিউরে উঠল সে। 'তুমি ফুলের গন্ধ শোঁকোনি, জানলা এর গন্ধ মাহাত্ম্য। ভালো খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতাও নেই তোমার। তুমি না পার কোনো কিছুর স্বাদ নিতে, না গন্ধ শুকতে পার, না দেখতে পাও কোনো রং। তোমাদের এই নিরস পৃথিবীর জন্যে আমার করুণা হয়।'

'তুমি যা বলছ তা অর্থহীন, লিঙ্কন। আমাকে করুণা করতে হবে না। কারণ তোমার চেয়ে কোনো অংশে আমি কম সুখী নই।' ওঠে দাঁড়াল পার্থ, হাত বাড়াল ছড়ির দিকে-অন্ধ সে। ছড়ি ছাড়া চলতে পারে না।

'এ ধরনের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগে আমাদেরকে নিচু চোখে দেখ না,' বলল সে। 'আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই তুমি জান না। আর আমরা সেসব অজানা জিনিস নিয়ে গর্বও করি না।' কথা শেষ করে দরজার দিকে

পা বাড়াল পার্থ। মুখে বিকৃত এক টুকরো হাসি।

ফিল্ডস হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, ছুটল মার্শিয়ানের পেছনে। চেপে ধরল পার্থের কাঁধ। জোর করে ঘোরাল ওর দিকে। 'শেষ কথাটা কি যেন বললে তুমি ?'

অন্য দিকে মুখ ঘোরাল মার্শিয়ান। 'বাদ দাও, লিঙ্কন। তোমার করুণার কথা শুনে মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি কথাটা।'

তীব্র চোখে তার দিকে তাকাল লিঙ্কন। 'ব্যাপারটা তাহলে সত্যি না ? শোনা যায় মার্শিয়ানদের পৃথিবীর মানুষের মতো শুধু উপলব্ধি ক্ষমতাই নেই, আরো অনেক বেশি ক্ষমতা আছে যা তারা গোপন রাখতে চায়। ঠিক ?'

'হয়তো। কিন্তু মুখ ফস্কে একটা কথা বলে ফেলেছি বলে তুমি এভাবে আমাকে জেরা করছ কেন ?'

'জেরা করছি না। জানতে চাইছি। তোমাদের সিক্রেট সেন্স বা গোপন উপলব্ধি ক্ষমতার কথা জানতে চাই। বল আমাকে!' উদাস ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পার্থ জ্যান। 'ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করব আমি ? তুমি রংয়ের সংজ্ঞা আমাকে বলবে যে কিনা ব্যাপারটা বুঝতেই পারবে না ?'

'আমি সংজ্ঞা জানতে চাই না। ব্যবহার জানতে চাই। প্লীজ,' অপর কাঁধটাও এবার চেপে ধরল সে। 'কথা দিচ্ছি ব্যাপারটা গোপন রাখব।'

মার্শিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলল সশব্দে। 'এ জেনে খুব বেশি লাভ হবে না তোমার। তুমি জেনে কি সন্তুষ্ট বোধ করবে যে তুমি যদি আমাকে দুটো তরল বোঝাই পাত্র দেখাতে তাহলে আমি বলে দিতে পারতাম দুটোর কোনটা বিষাক্ত ? কিংবা তুমি যদি আমাকে তামার তার দেখাও আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারি ওটার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কিনা। কিংবা—যাক, অনেক বলে ফেলেছি। আর বলতে চাই না।'

'ব্যস হয়ে গেল ?' হতাশ শোনাল ফিল্ডসের কণ্ঠ।

'আর কি শুনতে চাও ?'

'যা বললে সবই কাজে লাগার মতো—কিন্তু এর মধ্যে সৌন্দর্য কোথায় ?'

অধৈর্য্য ভঙ্গিতে বলল পার্থ। 'তুমি ব্যবহারের কথা জানতে চেয়েছ। বললাম। এর মধ্যে সৌন্দর্য আশা করো কোত্থেকে ?'

ফিল্ডস কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। তাকে থামিয়ে দিল পার্থ। 'বুঝতে পারছি, তোমার সূর্যাস্ত নিয়ে আবার বকবক করতে চাইছ। কিন্তু সৌন্দর্যের তুমি কি বোঝ! তুমি জান যখন নগ্ন তামার তারে এ সি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে তখন তার সৌন্দর্য দেখতে কেমন লাগে ? জান, সোলেনয়েডের বিদ্যুতের মাঝ দিয়ে যখন চুম্বক প্রবাহিত হয় তখন কেমন দেখায় তার সৌন্দর্য ? তুমি কখন মার্শিয়ান পোর্টওয়েম শুনেছ ?'

বলতে বলতে তন্দ্রালু হয়ে উঠল পার্থের চোখ। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ফিল্ডস। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব কিছু গুণ থাকে। কিন্তু বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারটা কেন তোমরা গোপন রেখেছ। অথচ আমরা, পৃথিবীবাসীরা তোমাদের কাছে কিছু গোপন করিনি।'

'আমাদেরকে অকৃতজ্ঞ বল না,' চেঁচিয়ে উঠল পার্থ। মার্শিয়ান আইন অনুসারে অকৃতজ্ঞতা সবচেবড় অপরাধ। 'আমরা কারণ ছাড়া কখন কাজ করি না। আর নিজেদের স্বার্থেও আমরা এই অসাধারণ ক্ষমতা গোপন রাখিনি।'

ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটল ফিল্ডসের ঠোঁটে। 'তাহলে ব্যাপারটা প্রমাণ করে দেখাও।'

'দেখাব। মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে অপার এক সৌন্দর্য তুমি দেখতে পাবে। এই পাঁচ মিনিটে তুমি অর্জন করতে পারবে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফিল্ডসের। 'তুমি বলতে চাইছ পৃথিবীবাসী চাইলে মঙ্গলবাসীর উপলব্ধি ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে ?'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে,' স্বপ্নালু হয়ে উঠল পার্থ জ্যানের চোখ।

'আর ওই পাঁচ মিনিটের উপলব্ধিতে—'

হঠাৎ থেমে গেল সে, কটমট করে তাকাল ফিল্ডসের দিকে।

'তুমি কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছ এ কথা কাউকে বলবে না।'

বলে ছড়ি ঠুকে ঠুকে বেশ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পার্থ। লিঙ্কন

ফিল্ডস আর তাকে থামানর চেষ্টা করল না। সে গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

মাস দুয়েক পরে পার্থ জ্যানের আস্তানায় হাজির হয়ে গেল লিঙ্কন ফিল্ডস। আগমনের উদ্দেশ্য জানাল সে নিসংকোচে। বলল সে মার্শিয়ানদের পাঁচ মিনিটের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। মার্শিয়ানদের নীতির কথা জানা আছে তার। তাদের কোনো অনুরোধ করা হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। পার্থ জ্যানকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হল। কারণ— কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে হয় কৃতজ্ঞতা দিয়েই। পার্থ জ্যান তাকে তার ব্যক্তিগত "কনসার্ট" রুমে নিয়ে এল। বলল ফিল্ডসকে সে পোর্টওয়েম-এর একটা অংশ শোনাবে। তবে সেটা পাঁচ মিনিটের জন্যেই। সঙ্গীত শোনার জন্যে তাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানতে চাইল ফিল্ডস।

'আমরা নোভি লন-এর জন্যে অপেক্ষা করছি,' বলল পার্থ জ্যান। 'সে-ই পোর্টওয়েম বাজাবে। আর অপেক্ষা করছি আমার ব্যক্তিগত ডাক্তার ডোন ভোল-এর জন্যে। ওঁরা এসে পড়বেন শীঘ্রিই।'

ঘরের মাঝখানে নিচু একটা মঞ্চ। ওখানে জটিল সব মেকানিজম নিয়ে একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র রাখা। যন্ত্রের সামনের অংশটা চকচকে এলুমিনিয়ামে তৈরি। তাতে সাতটি ঝকঝকে কালো নবের সারি, নিচে পাঁচটি প্রকাণ্ড সাদা পেডাল। যন্ত্রের পেছনের অংশে অসংখ্য কর্ড আর তারের ছড়াছড়ি।

'অদ্ভুত একটা জিনিস', মন্তব্য করল ফিল্ডস। উঠে এল মঞ্চে। তার সঙ্গে যোগ দিল মার্শিয়ান। 'এটা খুব দামি। দশ হাজার মার্শিয়ান ক্রেডিট লেগেছে যন্ত্রটা বানাতে।'

'এটা কিভাবে কাজ করে।'

'টেরেসট্রিয়ান পিয়ানো থেকে এর খুব বেশি পার্থক্য নেই। ওপরের নবগুলোর প্রতিটি আলাদা ইলেকট্রিক সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করে। যে কোনো এক্সপার্ট পোর্টওয়েম বাদক নবে চাপ দিয়ে যে কোন প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবেন। ইলেকট্রিক কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ করছে নিচের পেডালগুলো।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ফিল্ডস, নব-এর ওপর হাত বোলাল দ্রুত। লক্ষ্য করল প্রতিটা নবে চাপ দেয়ার সময় চাবির চিহ্ন নিচের ছোট গ্যালভ্যানোমিটারটা লাফ মেরে উঠছে। এ ছাড়া ব্যতিক্রম কিছু ঠেকল না ওর কাছে।

'যন্ত্রটা সত্যি কাজ করে?'

হাসল মঙ্গলগ্রহবাসী। 'হ্যাঁ করে।' বলে বাটনগুলোতে চাপ দিল সে।

ঠিক তখন এক লোক ঢুকল ঘরে। পার্থ জ্যান অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে পিয়ানোর ওপর থেকে সরিয়ে নিল হাত। 'ইনি নোভি লন,' পরিচয় করিয়ে দিল সে। 'ইনি আমার বাজনা তেমন পছন্দ করেন না।'

আগন্তকের সঙ্গে হাত মেলাতে উঠে দাঁড়াল ফিল্ডস। দেখেই বোঝা যায় অনেক বয়স লোকটার। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে কাঁধ। মুখে অসংখ্য ভাঁজ।

'এই তা হলে সেই তারুণ—পৃথিবীবাসী,' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'আমি আপনার উদ্ধত্য অপছন্দ করি তবে পোর্টওয়েম শুনতে এসেছেন বলে সাধুবাদ জানাই। এটা দুঃখের বিষয় বলতে হবে যে আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতা অনুভব করার জন্যে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় আপনি পাবেন না। তবে পোর্টওয়েম যে শোনেনি তার বেঁচে থাকা বৃথা।'

পার্থ জ্যান হেসে উঠল। 'উনি বাড়িয়ে বলছেন, লিঙ্কন। ইনি মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদদের একজন। এঁর মতো আর কেউ পোর্টওয়েম ভালো বাজাতে পারেন না।' বুড়োকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল। 'যৌবনে ইনি আমার শিক্ষক ছিলেন। অনেক ধৈর্য নিয়ে বাজনা শিখিয়েছেন আমাকে।'

'কিন্তু কিছুই শিখতে পারনি তুমি, বোকা ছেলে,' দাবড়ে উঠল বুড়ো। 'ঢোকার সময় তোমার বাজনা শুনেছি। এখন পর্যন্ত দেখছি ফোর্টগাস কম্বিনেশনাটই ঠিক মতো আয়ত্বে আনতে পারনি।'

এমন সময় তৃতীয় মার্শিয়ান, পার্থ জ্যানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডান ভোল ঢুকল ঘরে। তার দিকে এগিয়ে গেল পার্থ।

'সব রেডি?'

'হ্যাঁ', ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল ডান ভোল। 'এবারের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখপ্রদ হবে না। ফলাফল কি হবে তা আগেই জেনে গেছি।' অবজ্ঞার চোখে দেখল সে লিঙ্কনকে। 'ইনিই কি সেইজন যিনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এসেছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিঙ্কন। টের পেল হঠাৎ তার কথা শুকিয়ে গেছে। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে সে ডাক্তারকে। অস্বস্তি লাগল দেখে ডাক্তার ছোট

একটা লিকুইড বোঝাই বোতল এবং হাইপডারমিক সিরিঞ্জ বের করেছে কেস খুলে।'

'কি করবেন আপনি?' জানতে চাইল লিঙ্কন।

'তোমাকে ইনজেকশন দেয়া হবে। এক সেকেন্ড লাগবে,' তাকে আশ্বস্ত করল পার্থ জ্যান। 'এ কেসের সেন্স-অর্গানগুলো মস্তিস্কের বাহ্যাংশের (Cortex) কতগুলো সেল ছাড়া কিছু নয়। এগুলো সচল হয়ে ওঠে হরমোনের সাহায্যে। এটা একটা সিনথেটিক প্রিপারেশন যা ডরম্যান্ট সেলগুলোকে উত্তেজিত করে তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। তোমাকেও একই ট্রিটমেন্ট দেয়া হবে।'

'আঃ!—তাহলে পৃথিবীবাসীরও একই করটেক্স সেল রয়েছে।'

'একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়। হরমোন ওগুলোকে সচল করে তুলবে। তবে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে। এর ওপর ওগুলো মিলিয়ে যাবে। আর কখনোই,কোনোভাবেই ওগুলোকে পুনরায় সচল করা সম্ভব হবে না।'

ডান ভোল তার শেষ মিনিটের কাজগুলো সেরে এগিয়ে গেল ফিল্ডসের দিকে। কোনো কথা না বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। হাইপডারমিক সিরিঞ্জ ঢুকে গেল বাহুতে।

ইনজেকশন নেয়ার পরে এক/দুই মুহূর্ত অপেক্ষা করল লিঙ্কন। তারপর শুকন হেসে বলল, 'কই, আমি তো কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না।'

'দশ মিনিট কিছুই অনুভব করবে না তুমি,' ব্যাখ্যা করল পার্থ।

'সময় লাগবে। বসে স্রেফ রিল্যাক্স কর। নোভি লোন বার ডেনিনের "ক্যানালস ইন দ্য ডেজার্ট" শুরু করে দিচ্ছেন। 'এটি আমার খুব প্রিয়। যখন হরমোন কাজ শুরু করে দেবে তখন নিজেকে সবকিছুর মাঝে আবিস্কার করতে থাকবে।'

নিজেকে খুব শান্ত লাগল লিংকনের। ওদিকে পাগলের মতো বাজিয়ে চলেছে নোভি লন। লিংকনের ডানে বসা পার্থ সুরের রাজ্যে ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে। এমনকি ডাক্তারও।

ওদেরকে লক্ষ্য করছে লিংকন। কিছুক্ষণ পরে ওর চোখ পিটপিট শুরু হয়ে গেল। এক মুহূর্ত মনে হল বুকের একটা জ্যোতিশ্চক্র মিউজিশিয়ান এবং তার যন্ত্রের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। চক্রটা ক্রমে বেড়ে চলল। এক সময়

ভরে উঠল ঘর। এরপর আর অসংখ্য বর্ণ যোগ দিল ওটার সঙ্গে। ঢেউ খেলতে শুরু করল বর্ণগুলো, আকারে বড় হচ্ছে, বিদ্যুৎ গতিতে বদলে যাচ্ছে রং। তবে থাকছে এক জায়গাতেই। লক্ষ লক্ষ রঙের উজ্জ্বল ঝালর তৈরি হচ্ছে। আবার ম্লান হয়ে আসছে। লিংকনের চোখের তারার নিঃশব্দে কেটে যাচ্ছে রং।

একই সাথে বাজনা শুনতে পাচ্ছে লিংকন। ফিসফিসানি থেকে এসে চড়া হয়ে উঠল আওয়াজ, কাঁপতে কাঁপতে সুর উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে। প্রতিটা বাজনা যেন আলাদাভাবে শুনতে পাচ্ছে লিংকন। প্রতিটি শব্দ আলাদা প্রত্যয়ে বাজছে ওর কানে। তারপর শব্দের দোসর হয়ে ভেসে এল গন্ধ। ফুলের গন্ধ। পাগল করা সুঘ্রাণ।

একটা কিছু ঘটছে, তবু লিংকনের মনে হচ্ছে এ আসলে কিছুই নয়। আর কিছু অদ্ভুত কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

আস্তে আস্তে শব্দ আর গন্ধ মিলিয়ে গেল। এ এক অচেনা অভিজ্ঞতা যার সাথে পরিচিত নয় ওর মস্তিষ্ক। হরমোনের প্রভাব ক্রমে বাড়ছে—হঠাৎ বিস্ফোরিত হল ওটা—.ফিল্ডস বুঝতে পারল অবশেষে চরম ক্ষণ এসে উপস্থিত।

ওটাকে সে দেখতে পাচ্ছে না—পাচ্ছে না শুনতে কিংবা গন্ধও টের পাচ্ছে না—অথবা অনুভবও করা যাচ্ছে না। তারপরও লিংকনের মনে হচ্ছে ওটা আছে। যদিও ওটার কোনো নাম সে জানে না। আসলে ওটার কোনো নাম দেয়া সম্ভব নয়, বুঝতে পারছে লিংকন।

কিন্তু ওটার উপস্থিতি টের পাচ্ছে সে।

ওর মস্তিষ্কে কি যেন দমাদম পিটছে। আনন্দের প্রকৃত ঢেউ ধাক্কা খাচ্ছে—কিছু একটা ওকে ওর ভেতর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে এক অচেনা ব্রহ্মাণ্ডে। সীমাহীন এক অসীমের মাঝে সেঁধিয়ে যাচ্ছে লিংকন। ওটা নয় কোনো দৃশ্য বা শব্দ তবে ওটা যে কিছু একটা তা উপলব্ধি করা যায়। ওটা অসীম, অনন্ত, অসংখ্য, আর প্রতিটা ঢেউয়ের সাথে দূরান্তে দিগন্ত যেন দেখা যাচ্ছে, অপূর্ব, অদ্ভুত একটা অনুভূতি গাঢ়, ঘন, নরম এবং নরম হয়ে আসছে।

হঠাৎ উপলব্ধির সূতোটা টাশ করে ছিড়ে গেল। নিজেকে কনসার্ট রুমে

আবার আবিষ্কার করল লিংকন ফিল্ডস। লাফিয়ে সিধে হল ফিল্ডস। পার্থের হাত চেপে ধরে বলল, 'পার্থ! উনি থামলেন কেন? বাজাতে বল!'

চোখে করুণা ফুটল পার্থের। 'উনি এখনো বাজিয়ে চলেছেন, লিংকন।'

হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল লিংকন। তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না কিছুই। নোভি লোনের আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছে কি-বোর্ডে আগের মতোই। তার চেহারায় আগের ভাবই ফুটে আছে। আস্তে আস্তে সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল লিংকন। চোখে ফুটে উঠল নির্জলা আতঙ্ক।

ধপ করে বসে পড়ল ও, গলা চিরে বেরিয়ে এল চিৎকার। হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল ও।

পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে! আর ফিরে আসার উপায় নেই!

হাসছে পার্থ জ্যান—ভয়ংকর হাসি, 'একটু আগে তোমার দিকে আমি করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম, লিংকন। এখন খুব আনন্দ লাগছে আমার। তুমি জোর করে কাজটা করিয়েছ আমাকে দিয়ে। তার প্রতিদানও পেয়েছ। তোমার সারাটা জীবন,' তার কণ্ঠ ফিসফিসানির মতো শোনাল, 'কেটে যাবে পাঁচ মিনিটের কথা মনে পড়ে। মনে পড়বে তুমি কি মিস করছ—যা তুমি আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। তুমি অন্ধ হয়ে গেছ, লিংকন। অন্ধ!'

মুখ তুলে চাইল পৃথিবীবাসী। হাসার চেষ্টা করল। বিকৃত দেখাল মুখ। কথা বলল না একটাও, ঘর থেকে বের হয়ে গেল অন্ধের মতো আন্দাজে ভর করে।

তার মস্তিষ্কে একটা কণ্ঠই বারবার বাড়ি খেতে লাগল—'তুমি স্বাভাবিক একজন মানুষ হয়ে গেছ! তুমি অন্ধ হয়ে গেছ! অন্ধ!'

অনুবাদ : অনীশ দাশ অপু

ড্রিমওয়ার্ল্ড

তেরো বছরের এডওয়ার্ড কেলার প্রায় চার বছর ধরে সায়েন্স ফিকশনের পোকা। মাথায় সারাক্ষণ খেলা করে মহাজাগতিক মহা মহা সব চিন্তা ভাবনা।

তার মা মারা যাবার পর থেকে ক্লারা খালাই এডওয়ার্ডের যাবতীয় লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মৃত বোনের স্মৃতি বুকে নিয়ে ছেলেটাকে মানুষ করতে গিয়ে ক্লারা খালা সহ্য আর অসহ্যের এক কঠিন দোটানায় ভুগছিলেন। ছেলেটাকে এমন সর্বক্ষণ কল্পনায় ডুবে ডুবে বড় হয়ে উঠতে দেখে তিনি মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন।

"বাস্তবতার সামনে একবার দাঁড়া এডি" মাঝে মধ্যেই রেগে উঠে বলতেন তিনি। সে মাথা নাড়িয়ে সায় একটু দিত বটে কিন্তু তার পর পরই শুরু করত—'আমি স্বপ্নে দেখলাম মঙ্গলের অধিবাসীরা আমাকে তাড়া করেছে বুঝলে ? আমার হাতে একটা বিশেষ মারণ রশ্মি ছিল কিন্তু তার আবার আনবিক শক্তি ইউনিটটা খুব ছোট আর...'

প্রতিদিনের সকালের নাস্তাতেই ডিম, টোস্ট, দুধ আর ঐ ধরণের কোনো না কোনো স্বপ্নের গল্প থাকবেই।

ক্লারা খালা কঠিন গলায় বলে, 'একদিন এডি তুই দেখবি যে তোর ঐ সব রাতের স্বপ্নের থেকে আর জেগে উঠতে পারবি না। পুরো আঁটকা পড়ে যাবি, তখন কি হবে ?'

বলে খালা তার মুখটা ওর চোখের একদম সামনে নামিয়ে এনে স্থির চোখে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এডি ক্লারা খালার সাবধান বানীটাতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সেরাতে সে বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে

থাকে। সে কখনই একটা স্বপ্নের ভিতর আটকা পড়তে চায় না। খুব বেশি দেরি হবার আগেই যে সব সময় ঘুম ভেঙে যায় এটাই তার খুব ভালো লাগে। যেমন যখন ডাইনোসরেরা তার দিকে তেড়ে আসতে থাকে।

হঠাৎ সে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে উঠোনে গিয়ে নামে। এবং সে বেশ বুঝতে পারে এটাও তার আরেকটা স্বপ্ন। হাল্কা ঝড় শুরু হয়ে সূর্যটা ঢাকা পড়ে যেতেই তার চিন্তাটা ভেঙে যায়। সে মুখ তুলে ওপর পানে তাকিয়েই চমকে ওঠে, মেঘ ছোঁয়া মানুষের মুখটা সে চিনতে পারে।

এটা আর কেউ না ক্লারা খালা। দৈত্যের মতো লম্বা, যে নাকি তার মাস্তুলের মতো একটা আঙ্গুল উঁচিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে ঝুঁকে তার মুখোমুখি হয়ে কি যেন বলতে শুরু করেন।

এডি ভয়ে পিছন ফিরেই ছুট লাগায়। কোত্থেকে যেন তার সামনে আরেকটা দৈত্যাকার ক্লারা খালা এসে হাজির হয়, তার গলা আবার মেঘ ডাকার মতো গুড় গুড় করে শব্দ করে।

সে আবার ঘুরে ছুটতে শুরু করে। তার হাঁপ ধরে যায়, হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সে এগুতে থাকে, ছুটতে থাকে বেরিয়ে যাবার জন্য।

এক সময় সে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছোয় এবং আতঙ্কে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দূরে শত শত খাম্বার মতো ক্লারা খালা তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রতিটা ক্লারা খালা তাকে পার হয়ে যাবার সময় ঝট্ করে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বজ্রপাতের মতো কড় কড়াৎ শব্দ তুলে বলতে থাকে

'বাস্তবতার মুখোমুখি হ' এডি, বাস্তবতার মুখোমুখি হ'।'

এডি নিজেকে যন্ত্রণা দেবার জন্য মাটির ওপর লাফিয়ে পড়ে। আর নিজেকেই বলতে থাকে, জেগে ওঠ জেগে ওঠ। এই স্বপ্নের মধ্যে ধরা পড়িস না।

যতক্ষণ না তার ঘুম ভাঙছে ততক্ষণ ভয়ঙ্কর বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জগৎ তাকে গ্রাস করে ফেলবে। আর সে দৈত্যাকার ক্লারা খালাদের ফাঁদেই আঁটকা পড়ে থাকবে।

অনুবাদ: আসরার মাসুদ

ইট'স সাচ আ বিউটিফুল ডে

২১১৭ সালের ১২ এপ্রিল সকাল বেলা মিসেস রিচার্ড হ্যান'শ ঘুম থেকে উঠতেই (অন্যান্য সাধারণ সকলের মতোই) তার মেক্কানো প্রায় গড়াতে গড়াতে চলে এল তাঁর ঘরে। হাতের ছোট ট্রেতে এক কাপ কফি। বিকেলে নিউইয়র্ক যাবার কথা মিসেস রিচার্ড হ্যান'শ-র। তার আগে বেশ কিছু কাজ সারতে হবে তাঁকে। এগুলোর জন্যে মেক্কানোর ওপর ভরসা করা যায় না।

মেক্কানো পিছিয়ে গেল। ডায়ামাগনেটিক ফিল্ডের আধ ইঞ্চি ওপরে তার আয়ত শরীর নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। দোল খেতে খেতে রান্না ঘরে ঢুকে গেল মেক্কানো। এখানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে মেক্কানোকে।

মিসেস হ্যান'শ তাঁর মৃত স্বামীর কিউবোগ্রাফের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চুপচাপ বিছানা ছাড়লেন। ছেলের পায়ের শব্দ ভেসে এল হলঘর থেকে। মিসেস হ্যান'শ-র একটিই ছেলে—রিচার্ড জনিয়র। তার দেখাশোনা করে রোবট মেক্কানো। মিসেস হ্যান'শ জানেন রিচার্ড টার্গোশাওয়ার সেরে নাস্তা খাবে। টার্গোশাওয়ারটা গত বছর বাথরুমে লাগিয়েছেন মিসেস হ্যান'শ। এতে দ্রুত গোসল করা যায়। খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় শরীর।

এ রকম সকাল বেলা সাধারণত ব্যস্ত থাকেন মিসেস হ্যান'শ। তবে স্কুলে যাবার আগে ছেলেকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হলে একটি চুমু খেলেই যথেষ্ট। তিনি শুনতে পেলেন মেক্কানো নরম গলায় রিচার্ডকে মনে করিয়ে দিচ্ছে স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে। তিনি নিচে নেমে এলেন।

রিচার্ডকে দেখতে পেলেন দাঁড়িয়ে আছে দোর গোড়ায়। চেহারায় বিরক্তির ছাপ।

'আম্মু,' মুখ তুলে চাইল রিচার্ড, 'আমি স্কুলের কো-অর্ডিনেটর ফোন করলাম। কিন্তু সাড়া পেলাম না কেন?'

যন্ত্রচালিতের মতো মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'দূর। কি যা তা বলছিস।'

'ঠিক আছে। তুমি চেষ্টা করে দেখ।'

মিসেস হ্যান'শ কয়েকবার নাম্বার ঘোরালেন। স্কুলের "ডোর" বা দরজা সাধারণ রিসেপশনের জন্যে সবসময় প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আজ কেন কাজ হচ্ছে না। আরেকটা কো-অর্ডিনেটের চেষ্টা চালালেন তিনি। কিন্তু কিছুই ঘটল না। "ডোর" অচল হয়েই রইল। ধূসর রঙের ব্যারিয়ারটা আগের মতোই থাকল। সন্দেহ নেই ডোরটা অচল হয়ে গেছে। অথচ পাঁচ মাস আগেও তাকে পরীক্ষা করে দেখে গেছে। এবার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করল মিসেস হ্যান'শ-র।

আজ কত কি পরিকল্পনা করে রেখেছেন তিনি। আর আজই কিনা এরকম ঝামেলা। তাঁর মনে পড়ে গেল মাস খানেক আগেও সাবসিডিয়ারি ডোর বসানর বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি এটা বাড়তি একটা খরচ বলে। কে জানত ডোরগুলো এরকম বাজে?

মিসেস হ্যান'শ ভিজি ফোনের দিকে পা বাড়ালেন। রাগে তাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলছে। ছেলেকে বললেন, 'ডিকি তুমি রাস্তায় যাও। উইলিয়ামাসদের ডোর ব্যবহার কর।'

রিচার্ড বলল, 'মা, শরীরটা খুব নোংরা লাগছে। ডোর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত বাসায় থাকি?'

ফোনের কমবিনেশন বোর্ডে হাত রেখে জবাব দিলেন মিসেস হ্যানস, 'তোমার জুতোয় ফ্লেক্সি লাগাও। নিজেকে আর নোংরা মনে হবে না। আর ওই বাড়িতে ঢোকার আগে শরীর ব্রাশ করে নিতে ভুলো না।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়, ডিকি। স্কুলে যেতেই হবে। এখন বেরিয়ে পড়। নইলে দেরী হয়ে যাবে।'

মেক্কানো ইতোমধ্যে এক হাতে ফ্লেক্সি নিয়ে চলে এসেছে, অপেক্ষা করছে রিচার্ডের জন্যে।

রিচার্ড স্বচ্ছ, প্লাস্টিকের আবরণটা তার জুতোয় পরল, তারপর চেহারায় বিরক্তির ছাপ নিয়ে হলঘরের দিকে এগোল। 'আমি জানিও না এ জিনিস কিভাবে কাজ করে,' বলল সে। 'শুধু বোতাম টিপবে,' পেছন থেকে বললেন

ওর মা। 'লাল বোতাম। যাতে লেখা আছে। ফর ইমার্জেন্সি ইউজ। আর সময় নষ্ট কর না। মেক্কানো তোমার সঙ্গে যাবে ?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' তীব্র গলায় বলল রিচার্ড। 'আমাকে কি ভেবেছ তুমি ? শিশু ? ফু।'

মিসেস হ্যান'শ ফোনের প্রয়োজনীয় কমবিনেশন টিপলেন। কোম্পানিকে খবর দেবেন।

আধা ঘণ্টা পরেই জো ব্লুম নামে এক তরুণ মেকানিক চলে এল। মিসেস হ্যান'শ তার সহজে নড়ান যায় সেই হাউজ-প্যানেল খুললেন। ছেলেটি গায়ের ধুলো ঝাড়ল। বাইরে থেকে এলে সবার গায়েই ধুলো পড়ে। জো ব্লুম জুতো থেকে ফ্লেক্সি খুলল। মিসেস হ্যান'শ তাঁর হাউজ-প্যানেল বন্ধ করলেন। ছেলেটি হাসি মুখে তাঁকে বলল, 'গুড মর্নিং, ম্যাম। আমি আপনার ডোর দেখতে এসেছি।'

'এসেছ খুশি হয়েছি,' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিলেন মিসেস হ্যানস। 'আমার দিনটাই আজ কুফা যাবে এই ডোরের জন্যে।'

'সরি, ম্যাম। সমস্যাটা কি ?'

'ডোর কাজ করছে না। কো-অর্ডিনেটর অ্যাডজাষ্ট করেও লাভ হচ্ছে না,' বললেন মিসেস হ্যান'শ। 'বাধ্য হয়ে আমার ছেলেকে প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে—ওই ওই জিনিসটা দিয়ে।'

জো ব্লুম যে প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকেছে সেদিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি।

হাসল রিপেয়ারম্যান। 'ওটাও একটা ডোর বৈ কিছু নয়, ম্যাম। হ্যান্ড-ডোর।'

'তবু ওটা অন্তত: কাজ করছে। আমার ছেলেকে বাইরের জীবাণু আর নোংরার মধ্যে খেতে হয়েছে।'

'আজ বাইরের আবহাওয়া মন্দ নয়, ম্যাম।' বলল সে।

'তবে মাঝে মাঝে আবহাওয়া খুব খারাপ থাকে এটি সত্য। সে যাক। আমি এসেছি আপনার ডোর ঠিক করতে। ঠিক হলেই চলে যাব।'

মেঝের ওপর বসে পড়ল সে, বড় একটা টুল বক্স খুলল। একটা পয়েন্ট ডি ম্যাগনেটাইজার দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেল খুলে ফেলল আধ মিনিটের

মধ্যে। তারপর কিছু ইলেকট্রোড বসাল ওটার মধ্যে। ওয়ালের নিডলগুলো পরীক্ষা করল। বুকে হাত বেঁধে তার কাজ দেখলেন মিসেস হ্যান'শ।

অবশেষে সে বলল, 'এই যে একটা জিনিস পাওয়া গেছে,' আঁকশি দিয়ে সে ব্রেক ভাল্ব খুলে ফেলল। ওটা দেখিয়ে বলল, 'ব্রেক ভাল্বটার জন্যেই ডোরটা ঠিকমতো কাজ করছিল না, ম্যাম। এ জিনিস হঠাৎ করেই নষ্ট হয়ে যায়।' সে বিকল্প একটা ব্রেক ভাল্ব বসাল কন্ট্রোল প্যানেলে। প্যানেল আগের জায়গায় বসিয়ে সিধে হল জো ব্লুম। 'এখন থেকে আবার ডোর কাজ শুরু করবে, ম্যাম', কয়েকটা কমবিনেশন নাম্বার টিপল সে। প্রতিবার ধূসর ডোর কুচকুচে কালো হয়ে উঠল। ব্লুম বলল, 'এখানে একটি সাইন করুন, ম্যাম। আর আপনার চার্জ নাম্বার লিখে রাখুন। ধন্যবাদ, ম্যাম।'

নতুন একটা কমবিনেশন দিল সে মিসেস হ্যান'শকে, তারপর স্যালুট মেরে ঢুকে পড়ল ডোর-এ। কালো অন্ধকারের মধ্যে শরীর ঢুকে যেতেই ওটা টুকরো হয়ে গেল। আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল সে। ডোর-এর ওপাশে সম্পূর্ণ যাবার পরে ডোর আবার ম্লান, ধূসর রঙ ধারণ করল।

আধ ঘণ্টা পরে, মিসেস হ্যান'শ তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করছেন আর বিড় বিড় করছেন সকালটা খুব বিশ্রিভাবে শুরু হয়েছে বলে, এমন সময় বেজে ওঠল ফোন। আর সত্যি কুফা একটা দিন শুরু হয়ে গেল তার জন্যে।

মিস এলিজাবেথ রবিনস বেশ সমস্যায় আছে। তার খুদে ছাত্র ডিকি হ্যান'শ পড়াশোনায় খুবই ভালো। কিন্তু আজকাল তার আচরণ ভারি অদ্ভুত ঠেকছে মিস রবিনসের কাছে। সে ঠিক করেছে এ ব্যাপারে দিকের মার সঙ্গে কথা বলবে, স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে নয়। সে ভিজি ফোনে কথা বলল মিসেস হ্যান'শ-র সঙ্গে। নিজের পরিচয় দেয়ার পরে মিসেস হ্যান'শ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি রিচার্ডের টিচার?'

'জ্বী,' মাথা ঝাঁকাল মিস রবিনস, 'আপনাকে জানান দরকার দিক আজ অনেক দেরিতে স্কুলে এসেছে।'

'তাই নাকি? কিন্তু ওর তো দেরি হবার কথা নয়। আমি দেখলাম ও স্কুলে যাচ্ছে।'

ভিজি ফোনে বিস্মিত দেখাল মিস রবিনসকে। 'আপনি ওকে ডোর ব্যবহার করতে দেখেছেন?'

মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'তা নয়। আমাদের ডোরটা কিছুক্ষণের জন্যে নষ্ট ছিল। আমি ওকে প্রতিবেশীর বাড়ি পাঠিয়েছি তাদের ডোর ব্যবহার করার জন্যে।'

'আপনি শিওর?'

'অবশ্যই শিওর। মিথ্যা বলতে যাব কেন আপনাকে?'

'না। না। মিসেস হ্যান'শ। তা বলছি না। মানে আপনি কি নিশ্চিত আপনার ছেলে প্রতিবেশীর ডোর ব্যবহার করেছে? ওর বাসা হারিয়েও ফেলতে পারে।'

'হাস্যকর কথা। আমাদের ম্যাপ আছে। রিচার্ড ডিষ্টিক্টএ-থ্রি'র প্রতিটি বাড়ি খুব ভালো ভাবে চেনে।'

মিস রবিনস বলল, 'তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে ডিকি আদৌ প্রতিবেশীর ডোর ব্যবহার করেছে কিনা। এক ঘণ্টা পরে আজ স্কুলে এসেছে ও। ওর ফ্লেক্সিতে ধুলো-ময়লা দেখে মনে হয়েছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসেছে দিক। কারণ ওর ফ্লেক্সিতে কাদামাটি লেগেছিল।'

'কাদা মাটি?' ভয়ানক অবাক হলেন মিসেস হ্যান'শ। 'কাদা মাটি আসবে কোত্থেকে? ডিকি কি বলেছে?'

মিস রবিনস বলল, 'ডিকি এর কোনো সন্তোসজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। মিসেস হ্যান'শ, আমার মনে হচ্ছে আপনার ছেলে অসুস্থ। ওকে ডাক্তার দেখান দরকার।'

'জ্বরটর হয়নিতো?' উৎকণ্ঠায় তীক্ষ্ণ শোনাল মার গলা।

'না। না। শারীরিক অসুস্থতার কথা বলছি না আমি। মানসিক অসুস্থতার কথা বলছি। ওর আচরণ, চাউনি,' ইতস্তত ভঙ্গিতে যোগ করল মিস রবিনস। '—আমার মনে হয় সাইকিক প্রোব দিয়ে ওর একটা রুটিন চেক আপ করা দরকার—'

কথা শেষ করতে পারল না রবিনস, খেঁকিয়ে উঠলেন মিসেস হ্যান'শ, 'আপনি কি বলতে চাইছেন রিচার্ড পাগল?'

'না। না। মিসেস হ্যান'শ। তবে—'

'আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি আমার ছেলে ঠিক আছে।' বলে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

মিস রবিনস দ্রুত ক্লাস রুমে ঢুকল। আজ ইংরেজি কমপোজিশনের ক্লাস। তবে পড়ানর মন আসছে না। সে ছাত্রদের নির্ধারিত হোমওয়ার্ক-এর অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতে বলল। মাঝে মাঝে টেপ চালাল। ছোট ভোকালাইজার চালিয়ে ছাত্রদের দেখিয়ে দিল কিভাবে ইংরেজি পড়তে হবে। তবে তার মন পড়ে আছে রিচার্ডের দিকে। চুপচাপ নিজের সিটে বসে আছে রিচার্ড। নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছে, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন নয়। মিস রবিনসের মনে হচ্ছে ছেলেটা আজ সকালে অস্বাভাবিক কোনো অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে এসেছে। ওর মাকে খবরটা দিয়ে ভালোই করেছে। তবে প্রোব সম্পর্কে কথা বলা ঠিক হয়নি। আজকাল সবাই প্রোব ব্যবহার করে। এতে অসম্মানের কিছু নেই।

রিচার্ডকে ডাকল সে। প্রথমবার শুনতে পেল না। দ্বিতীয় ডাকে লাফিয়ে ওঠে দাঁড়াল রিচার্ড।

মিস রবিনস তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে প্রাচীন কোনো যান ব্যবহার করতে দিলে কোনোটায় তুমি চড়তে চাইবে এবং কেন ?'

এ ধরনের প্রশ্ন মাঝে মাঝে করে মিস রবিনস। এতে ইতিহাসের সাথে যুক্ত থাকা যায়।

রিচার্ড মৃদু গলায় জবাব দিল, 'প্রাচীন কোনো যানকে বেছে নিতে বলা হলে আমি স্ট্রাটোলাইনার বেছে নিতাম। কারণ এই যানটি গতি ধীর হলেও এটি পরিচ্ছন্ন। আর এ স্ট্রাটোস্ফিয়ারে চলাফেরা করতে সক্ষম। জানের দরজা-জানালা বন্ধ থাকে বলে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় নেই। রাতের বেলা এ থেকে প্ল্যানেটেরিয়ামের মতোই আকাশের তারা দেখা যায়। নিচে তাকালে পৃথিবীকে ম্যাপের মতো দেখা যাবে, মেঘও দেখা যাবে—' এভাবে আরো বর্ণনা করে গেল সে।

মিস রবিনস বলল, 'তোমার উচ্চারণে সামান্য ত্রুটি আছে। "জান" নয় "যান", এ ছাড়া যা বলেছ মন্দ নয়। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বের মধ্যে পার্থক্য কি ? কে বলতে পারবে ?'

এভাবে ক্লাস চলল লাঞ্চ পর্যন্ত। কিছু ছেলে ক্লাসে বসে লাঞ্চ করল, কেউ কেউ বাড়ি গেল। রিচার্ড ক্লাসেই থাকল। সাধারণত লাঞ্চের সময় বাড়ি যায় সে। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না মিস রবিনসের।

বিকেলে ছুটি হল স্কুল। এক এক করে স্কুল ডোর-এ ঢুকে যে যার বাড়ি পৌঁছে গেল। শুধু রিচার্ড ছাড়া। রিচার্ড ক্লাসের ফায়ার ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেছে সবার অগোচরে। রিচার্ডকে নিয়ে আবার চিন্তায় পড়ে গেল মিস রবিনস। ছেলেটার সত্যি কিছু একটা হয়েছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে তখন। তবে মিসেস হ্যান'শকে আর ফোন করল না। সকাল বেলা মহিলার রুক্ষ আচরণ মোটেই ভালো লাগেনি রবিনসের।

ওই দিন আবার নিউইয়র্ক যাওয়া হল না মিসেস হ্যান'শ-র। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর রাগ নিয়ে বাড়িতে বসে থাকলেন তিনি। চিন্তা ছেলেকে নিয়ে আরো ক্ষোভ জাগছে মিস রবিনস নামের স্কুল টিচারটার ওপর।

স্কুল ছুটি হবার পরেও রিচার্ড বাড়ি ফিরছে না দেখে দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার জোগাড় হল মিসেস হ্যান'শ-র। একবার ভেবেছিলেন স্কুলে ফোন করবেন। কিন্তু যে স্কুলের শিক্ষক তার ছেলেকে পাগল ঠাওরে বসে আছে তার কাছে ফোন করতে মন চাইল না মিসেস হ্যান'শ-র। তিনি অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করে দিলেন। ঘনঘন সিগারেটে টান দিচ্ছেন। রিচার্ড স্কুলে তখনো বসে আছে কোনো কারণে? তাহলে কারণটা মিসেস হ্যান'শকে আগে ভাগে জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল তার।

স্কুলে কিছুতেই ফোন করবেন না বলে জিদ ধরেছিলেন মিসেস হ্যান'শ। কিন্তু ছেলের দুশ্চিতায় জেদ বজায় রাখতে পারলেন না তিনি। শুধু স্কুল নয়, পুলিশেও খবর দিতে হবে।

তবে ফোন করতে হল না। চলে এসেছে রিচার্ড। চোরের মতো মুখ করে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। দুশ্চিন্তা অকস্মাৎ পরিণত হল রাগে। গনগনে মুখে জানতে চাইলেন মিসেস হ্যান'শ, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি, রিচার্ড?'

কিন্তু ছেলে জবাব দেয়ার আগেই বুঝে ফেললেন কোথায় ছিল সে। রিচার্ডের জুতোর ধুলো (ফ্লেক্সি ছাড়া) হাতে ময়লা, শার্টেও ময়লার দাগ। মিসেস হ্যান'শ আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'তুই বাইরে গিয়েছিলি?'

'ইয়ে মানে আম্মু—' কথা জড়িয়ে গেল রিচার্ডের।

'স্কুল ডোরের কোনো সমস্যা?'

'না। আম্মু।'

'তুই বুঝতে পারছিস তোর জন্যে দুশ্চিন্তায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি?' জবাবের জন্যে খামোকাই অপেক্ষা করলেন তিনি। 'বেশ। তোর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে পরে কথা বলব। এখন যা। গোসল করে নে। পুরান জামা-কাপড় একটাও যেন গায়ে না দেখি। মেক্কানো!'

ডাকার আগেই মেক্কানো এসে হাজির। মিসেস হ্যান'শ ছেলেকে বললেন, 'জুতো এখানেই খোল। তারপর মেক্কানোর সঙ্গে যা।'

কোনো প্রতিশব্দ না করে মা'র আদেশ পালন করল রিচার্ড।

মিসেস হ্যান'শ বুড়ো আঙুল আর তর্জনি দিয়ে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে কাদা মাখা জুতো জোড়া তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। তারপর টিস্যু দিয়ে ভালো করে হাত মুছে ওটাও ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেললেন।

ডিনারে রিচার্ডকে সঙ্গ দিলেন না মিসেস হ্যান'শ। মেক্কানো দাঁড়িয়ে থাকল পাশে। এটা রিচার্ডের শাস্তি। এতেই বুঝতে পারবে মা খুব রাগ করেছেন ওর ওপর।

তবে ঘুমের সময় মা এলেন ছেলের কাছে। আদর করে জানতে চাইলেন, 'তোর আজ কি হয়েছিল রে, খোকা?' অনেক দিন পরে খোকা ডাকলেন তিনি ছেলেকে। চোখে পানি এসে গেল তাঁর।

কিন্তু রিচার্ড অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল। কঠিন গলায় বলল, 'ওই বাজে ডোর দিয়ে আমি আর যাতায়াত করতে চাই না, আম্মু।'

'কেন?'

গায়ের পিচ্ছিল চাদরে (পরিষ্কার এবং রোগজীবাণুমুক্ত। আর একবার ব্যবহারের পরে ফেলে দেয়া হয় এ চাদর) হাত বোলাতে বোলাতে রিচার্ড বলল, 'আমার ভালো লাগে না তাই।'

'তাহলে স্কুলে যাবি কিভাবে, খোকা?'

'সকাল সকাল উঠব,' বিড়বিড় করল রিচার্ড।

'কিন্তু ডোরে তো কোনো সমস্যা নেই।'

'কিন্তু ওগুলো আমার পছন্দ হয় না,' মা'র দিকে একবারও তাকাচ্ছে না ছেলে।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'আচ্ছা। এখন ঘুমো। কাল সকালে দেখা যাবে।'

ছেলেকে চুমো খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস হ্যান'শ। ফটোসেল বিমে হাত দিতেই ঘরের আলো কমে এল।

কিন্তু সে রাতে ভালো ঘুম হল না মিসেস হ্যান'শ-র। তার খোকার হঠাৎ ডোর পছন্দ না হবার কারণ কি? ডোর নিয়ে আগে কখনো ভাবেনি রিচার্ড। এখন এরকম করছে কেন? ওর আচরণ কেমন অসংলগ্ন ঠেকছে।

অসংলগ্ন? শব্দটা মনে আসতে মিস রবিনসের কথা মনে পড়ে গেল মিসেস হ্যান'শ-র। মিস রবিনস বলেছিল তার ছেলের মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মিস রবিনসের কথা মনে পড়তে চোয়াল কঠিন হয়ে এল মিসেস হ্যানসের। দুরো! কি সব যা তা ভাবছেন তিনি? তার ছেলের দরকার প্রশান্তিময় ঘুম। ভালো ঘুম দিলেই কাল সকালে উঠে ঠিক হয়ে যাবে সে।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখলেন বাসায় নেই রিচার্ড। মেক্কানো কথা বলতে না পারলেও অঙ্গভঙ্গি করে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। সে জানাল রিচার্ড সাধারণত যে সময়ে ঘুম থেকে ওঠে আজ তার আধঘন্টা আগে ওঠেছে। গোসল সেরে বেরিয়ে পড়েছে।

না, ডোর ব্যবহার করেনি সে।

সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে।

বিকেল ৩.১০ মিনিটে মিসেস হ্যান'শ-র ভিজি ফোন বেজে উঠল। মিস রবিনস। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন মিস রবিনস।'

রিচার্ডের শিক্ষয়িত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মিসেস হ্যান'শ, আমি রিচার্ডকে রেগুলার ডোর ব্যবহার করতে বলা সত্বেও সে ফায়ার ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, জানি না।'

সতর্ক গলায় মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'বাড়ি গেছে। আর কোথায় যাবে?'

আতঙ্কিত দেখাল মিস রবিনসকে, 'আপনি ব্যাপারটাকে সমর্থন করছেন?'

মিসেস হ্যান'শ ঠিক করলেন টিচারটাকে আজ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। তিনি গম্ভীর, বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার আপনার আছে। আমার ছেলে যদি ডোর ব্যবহার করতে না চায় সেটা তার এবং আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

যদ্দুর জানি স্কুলে এমন কোনো আইন নেই যে ডোর ব্যবহার করতেই হবে।'

মিস রবিনসের মুখ লাল হয়ে গেল। ফোন লাইন কেটে যাবার আগ মুহূর্তে সে বলে উঠল, 'আমি, হলে ওকে প্রোবে পাঠাতাম। অবশ্যই পাঠাতাম।'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র লাইন কেটে দিলেন মিসেস হ্যান'শ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছেলের পক্ষ নিয়ে ভাবলেন ঠিকই তো ডোর পছন্দ না হলে রিচার্ড ওটা ব্যবহার করবে কেন?

রিচার্ড বাড়ি ফিরল আবার আগের মতো চোর চোর মুখ করে। তবে মিসেস হ্যান'শ মেজাজ হারালেন না। এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন দেখলেন রিচার্ড ডোর ব্যবহার করছে। খুশি হলেন তিনি। ভাবলেন যাক, সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু দু'দিন পরেই ডোর বাদ দিয়ে আবার সদর দরজা ব্যবহার করল রিচার্ড।

এবার সাইকিয়াট্রিস্ট এবং প্রোবের কথা ভাবতে শুরু করলেন মিসেস হ্যান'শ। কিন্তু মিস রবিনসের চেহারা ভেসে ওঠতে প্রতিবারই নিজেকে দমন করলেন। যদিও ইদানিং—তাঁর মনে হচ্ছে মিস রবিনস হয় তো ঠিক কথাই বলেছে।

একদিন মিসেস হ্যান'শকে ভয়ানক আতঙ্কিত করে কাক ভেজা হয়ে বাসায় ফিরল রিচার্ড। ওই সময় আইয়োয়া থেকে বোনের সঙ্গে দেখা করে মাত্র বাড়িতে ঢুকেছেন মিসেস হ্যান'শ। ছেলের ওই দশা দেখে আঁতকে ওঠলেন তিনি, 'রিচার্ড হ্যান'শ।'

মুখ কাচুমাচু করে ব্যাখ্যা করল রিচার্ড। 'বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর আমিও ভিজে গেলাম।'

রাগের চোটে কয়েক মুহূর্ত কথা জোগাল না মিসেস হ্যান'শ-র মুখে। অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি। বললেন, 'তুই বাইরে গিয়েছিলি, না?'

রিচার্ড স্বীকার করল হ্যাঁ, 'আম্মু। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলাম। বুঝতে পারিনি বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।'

আর কিছু বললেন না মিসেস হ্যান'শ। রাগে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

দিন দুই পরে সর্দি লাগল রিচার্ডের। ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সে। মিসেস হ্যান'শ সিদ্ধান্ত নিলেন এবার রিচার্ডকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান দরকার।

স্যান ফ্রান্সিসকো মেডিকেল সেন্টারে মনোবিজ্ঞানী হ্যামিলটন স্লোনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন মিসেস হ্যান'শ।

রিচার্ডের গল্প শুনলেন তিনি ধৈর্য ধরে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে ব্যাপারটার শুরু হয় ডোর অচল হয়ে পড়ার পর থেকে, তাই না?'

'জ্বী, ডক্টর।'

'ডোর নিয়ে ওর ভেতরে কোনো ভীতি লক্ষ্য করেছেন?'

'অবশ্যই না। কেন ভয় থাকবে?' অবাক হলেন মিসেস হ্যান'শ।

'ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, মিসেস হ্যান'শ। কারণ ডোর যেভাবে কাজ করে, দৃশ্যটা ভীতিকর অবশ্যই। আপনি ডোর-এ পা দেয়া মাত্র আপনার অ্যাটমগুলো ফিল্ড এনার্জিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, স্পেসের আরেক অংশে এটার স্থানান্তর ঘটছে। তারপর আবার ওটা ম্যাটারে পরিণত হচ্ছে। আর ওই সময়টা আপনি জীবিত থাকছেন না।'

'এ সব জিনিস নিয়ে কেউ চিন্তা করে বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু আপনার ছেলে হয়তো চিন্তা করে। সে ডোর নষ্ট হয়ে যাবার দৃশ্য দেখেছে। সে হয়তো মনে মনে ভেবেছে, "আমি ডোর-এর মধ্যে অর্ধেক সেঁধিয়ে গেছি আর এ সময় ডোরটিও নষ্ট হয়ে গেল। তখন কি হবে?" '

'উদ্ভট কথা বলছেন আপনি, ডক্টর। রিচার্ড এখনো ডোর ব্যবহার করছে। স্কুলে যাবার সময় এক কি দুইবার সে ডোর ব্যবহার করে।'

'স্বইচ্ছায়? আনন্দের সাথে?'

মিসেস হ্যান'শ বিরক্ত গলায় বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় অনিচ্ছায় কাজটা করছে সে। তবে এসব কথা বলে কি কোনো লাভ হচ্ছে, ডক্টর? আপনি প্রোব ব্যবহার করতে চাইলে করেন। দেখুন সমস্যাটা কোথায়।'

ড. স্লোন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'শিশুদের জন্যে প্রোব ব্যবহার করা ঠিক হবে না। এটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটা অভিজ্ঞতা। এতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। তারপর ফলাফল পাঠাতে হয় সেন্ট্রাল সাইকো অ্যানালিটিক্যাল

ব্যুরোতে বিশ্লেষণের জন্যে। সেখানে কয়েক হপ্তা লেগে যেতে পারে। মিসেস হ্যান'শ, অনেক মনোবিজ্ঞানীরই ধারণা, প্রোব-অ্যানালিসিস থিওরী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত।'

ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন মিসেস হ্যান'শ। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কিছুই করার নেই।'

হাসলেন ড. স্লোন। 'একেবারেই নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।'

'ওর সঙ্গে কথা বলবেন? তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?'

'প্রয়োজন হলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনের জন্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে ছেলেটির সাথে আগে কথা বলা দরকার।'

'আমি মা হয়ে ওর পেট থেকে কিছু বের করতে পারলাম না। আর আপনি পারবেন?' ব্যঙ্গ মিসেস হ্যান'শ-র কণ্ঠে।

'এ রকম মাঝে মাঝে ঘটে,' জানালেন ড. স্লোন, 'শিশুরা কখনো কখনো অচেনা লোকের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে।'

ওঠে দাঁড়ালেন মিসেস হ্যান'শ। তাঁকে মোটেও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না। 'কবে আসতে চান আমার বাসায়?'

'আসছে শনিবার? তখন তো ওর স্কুল বন্ধ থাকবে, আপনি কি ব্যস্ত থাকবেন?'

'আমরা আপনার জন্যে রেডি হয়ে থাকব।'

ছোট রিসেপশন রুম থেকে পথ দেখিয়ে অফিস ডোর-এ মিসেস হ্যান'শকে পৌঁছে দিলেন ডা. স্লোন। তিনি তার বাড়ির কো-অর্ডিনেটর পাঞ্চ করলেন ডোর-এ। মহিলাকে ভেতরে ঢুকতে দেখলেন ড. স্লোন। প্রথমে আধা-মানুষ, তারপর শরীরের সিকি অংশ, তারপর একটা কনুই, সবশেষে একখানা পা অদৃশ্য হয়ে গেল ডোরের ওপাশে। দৃশ্যটা সত্যি রোমহর্ষক।

গন্তব্যে যাত্রার সময় ডোর যদি অচল হয়ে পড়ে তখন কি হবে, ভাবলেন স্লোন। মানুষের শরীরের অর্ধেক অংশ ডোর-এর এপাশে পড়ে থাকবে, বাকি অংশ ওপাশে? এরকম কোনো ঘটনা ঘটতে শোনেন নি তিনি। তবে ঘটা বিচিত্র নয়। ড. স্লোন নিজের অফিসে ফিরে এলেন। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে।

শনিবার নির্ধারিত সময়ে রিচার্ডদের বাড়িতে এলেন ড. শ্লোন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে, রিচার্ড ?'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রিচার্ডের। 'হাঁটব, স্যার ?'

'মানে বাইরে যাবে ?'

'আপনি—বাইরে যান ?'

'মাঝে মাঝে, হাঁটার ইচ্ছে হলে যাই।'

লাফিয়ে উঠল রিচার্ড। বলল, 'আমার ধারণা ছিল কেউ বাইরে যেতে চায় না।'

'আমি যাই। মানুষের সাহচর্য ভালো লাগে আমার।' বসে পড়ল রিচার্ড, অনিশ্চিত গলায় বলল, 'কিন্তু আম্মু!'

এতক্ষণ চুপচাপ ডক্টর আর ছেলের আলাপ শুনছিলেন মিসেস হ্যান'শ। বাইরে যাবার কথা শুনে আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন তিনি। আতঙ্ক বোধ করলেন। তারপরও জোর করে হাসলেন। বললেন,' ঠিক আছে, খোকা। যেতে পার। তবে সাবধানে থাকবে।'

তিনি দ্রুত একবার কটমট করে তাকালেন ড. শ্লোনের দিকে। শ্লোন খেয়াল করলেন না।

ড. শ্লোন মিথ্যা বলেছেন রিচার্ডকে। মাঝে মাঝে বাইরে যান না তিনি। কলেজ ছাড়ার পর থেকে তিনি বাইরে বের হননি। ওই সময় তাঁদের বিনোদনের জন্যে ছিল ইনডোর আলট্রাভায়োলেট চেম্বার, সুইমিংপুল এবং টেনিস কোর্ট। আউট ডোরের চেয়ে ইনডোর গেমস অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। আর বাইরে যাবার তাঁদের দরকারও পড়েনি।

কাজেই বাইরে যাবার পরে বাতাস যখন ছুঁয়ে ছিল তাঁকে, শিরশিরে একটা অনুভূতি হল চামড়ায়। ফ্লেক্সি জুতো খুলে সবুজ ঘাসে নিশব্দে নগ্ন পায়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

'ওই যে দেখুন,' হাসি মুখে বলল রিচার্ড। তখন অন্য রকম লাগছে তাকে। প্রথম পরিচয়ে খুবই গম্ভীর মনে হয়েছিল রিচার্ডকে।

একটা গাছের মগ ডালে শুধু নীলচে একটা ঝিলিক দেখলেন ড. শ্লোন। নড়ে ওঠল গাছের পাতা। জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পেলেন না তিনি।

'কি ওটা ?'

'একটা পাখি,' বলল রিচার্ড। 'নীল রঙের পাখি।'

'অবাক চোখে তার দিকে তাকালেন ড. স্লোন। হ্যান'শদের বাড়ি একটা উঁচু টিলার ওপর। মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে হালকা জঙ্গল, মাঝে মাঝে গাছের সারি, সূর্যের আলোর ঝিলমিল করছে ঘাস।

সবুজের মধ্যে লাল এবং হলুদ রঙের নানা আকৃতিও ফুটে আছে। ওগুলো ফুল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গুলোর যত্ন নেয় কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিচার্ড। 'জানি না। সম্ভবত মেক্কানো।'

'মেক্কানো?'

'রোবট। এদিকে প্রচুর আছে। অ্যাটমিক নাইফ দিয়ে ওরা ঘাস ছাঁটে। ওই যে একটা, দেখুন।'

আধ মাইল দূরে চকচকে ধাতব রোবটটাকে দেখতে পেলেন ড. স্লোন। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ঘাস বনের দিকে। কিছু একটা করছে সে। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। 'ওটা কি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন ড. স্লোন।

মুখ তুলে চাইল রিচার্ড। 'ওটা একটা বাড়ি। ফোলিকদের।'

'তুমি এখানকার বাড়ি ঘর সব চেন?' জানতে চাইলেন স্লোন।

'ম্যাপ দেখে চিনতে পারি। আমার সঙ্গে আসুন,' বলে দৌড়াতে শুরু করল রিচার্ড। দৌড়াতে দৌড়াতে একটা জলাধারার কাছে নিয়ে এল। 'ওই দেখুন পানি।'

'পানি?' সবুজের মধ্যে রূপালি একটা ফিতে চোখে পড়ল স্লোনের।

'হ্যাঁ। সত্যিকার পানি। যে পানি পাহাড় বেয়ে পড়ে। সারাক্ষণ পড়তেই থাকে। পাহাড়ে উঠলে দেখতে পাবেন। ওটাকে বলে নদী। নদীর তীরে প্রচুর গাছ আছে। ওখানে একটা বাড়িও আছে। হালকা সবুজ রঙের বাড়ি। সাদা রঙের ছাদ।'

'তাই নাকি?' বিস্মিত দেখাল স্লোনকে।

পায়ের নিচে ছোট ছোট প্রাণী দৌড়াদৌড়ি করছিল। সেদিকে তাকালেন ড. স্লোন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে রিচার্ড বলল, 'ওগুলোকে আপনি ধরতে পারবেন না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনি।'

একটা হলদে রঙের প্রজাপতি উড়ে গেল পাশ দিয়ে। ওপর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ড. স্লোন। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ছায়া পড়ল গায়ে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল। ওপর দিকে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। বিস্মিত দেখাল

তাঁকে। রিচার্ড বলল, 'ওটা মেঘ। একটু পরেই চলে যাবে। ওই ফুলগুলোকে দেখুন। ওরা কি সুন্দর গন্ধ ছড়ায়।'

হ্যান'শদের বাড়ি থেকে কয়েকশ গজ দূরে প্রচুর ফলের গাছ। মেঘ সরে গেল। আবার ঝকমক করে উঠল সূর্য। পেছন ফিরে তাকালেন ড. স্লোন। অনেক দূর চলে এসেছেন তাঁরা। এখন যদি রিচার্ড তাঁকে এখানে ফেলে রেখে দৌড়ে পালিয়ে যায় পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবেন না তিনি।

'তুমি দেখছি একজন এক্সপ্লোরার,' হারিয়ে যাবার ভয়টা জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিলেন ড. স্লোন।

লাজুক হাসল রিচার্ড। 'আমি যখন স্কুলে যাই এবং বাড়ি ফিরে আসি, সবসময় ভিন্ন রাস্তা ধরে যাতায়াত করি যাতে নতুন নতুন জিনিস চোখে পড়ে।'

'কিন্তু তুমি প্রতিদিন সকালে নিশ্চয়ই বাইরে যাও না। যাও কি? মাঝে মাঝে ডোরও ব্যবহার কর নিশ্চয়ই?'

রিচার্ড বলল, 'হ্যাঁ, করি। মাঝে মাঝে সকালে বৃষ্টি হলে ডোর ব্যবহার করতে হয়। ডোর ব্যবহার করতে ভালো লাগে না। কিন্তু কি করব? হপ্তা দুয়েক আগে আমার ঠাণ্ডা লেগে গেল—' বলে চুপ হয়ে গেল রিচার্ড। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তবে আম্মু আমাকে বকেনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. স্লোন, 'চল। ফেরা যাক।'

হতাশ দেখাল রিচার্ডকে। 'এখনই?'

'তোমার মা বসে আছেন আমাদের জন্যে।'

'তাও বটে,' বেজার মুখে বলল রিচার্ড।

ধীরে ধীরে হাঁটছে ওরা। রিচার্ড খুশি খুশি গলায় বলল, 'জানেন, আমাকে সেদিন স্কুলে একটা রচনা লিখতে দেয়া হয়েছিল। আমি কি ধরনের প্রাচীন যান (এবার ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারল সে) ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। আমি স্ট্রাটোলাইনারের কথা বলেছি। এই যানে চড়লে তারা, মেঘসহ আর অনেক কিছু দেখা যায়। আমি এরকম একটা যান চাই।

মিসেস হ্যান'শকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, 'রিচার্ড অ্যাবনরমাল নয় বলছেন, ডক্টর?'

'খানিকটা অস্বাভাবিক। তবে অ্যাবনরমাল নয়। ও বাইরে যেতে পছন্দ করে।'

'কিন্তু কি করে যাবে ? বাইরের জগৎ এত নোংরা, অস্বাস্থ্যকর।'

'এটা আসলে একেকজনের মানসিকতার ব্যাপার। একশো বছর আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা সবসময় বাইরেই থাকতেন। আজও, আমার ধারণা, লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান ডোর কি জিনিস তা জানে না।'

'কিন্তু আমার ছেলে অত্যাধুনিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত,' রাগী গলায় বললেন মিসেস হ্যান'শ। 'সে আফ্রিকান নয়—আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মতোও নয়।'

'সমস্যাটা সেখানেই, মিসেস হ্যান'শ। তার বাইরে যাবার ইচ্ছে প্রবল। অথচ সে বুঝতে পারে কাজটা তার জন্যে ঠিক হবে না। আর এ বিষয় নিয়ে সে আপনার বা তার টিচারের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়। ফলে বাধ্য হয়ে চুপচাপ থাকছে। আর এটার শেষ পরিণতি বিপজ্জনকও হতে পারে।'

'তাহলে আমরা ওকে বাধা দেব কিভাবে ?'

ড. স্লোন বললেন, 'ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। যেদিন আপনাদের ডোরটা অচল হয়ে গেল, বাইরে যাবার সুযোগ পেল রিচার্ড, ভালো লেগে গেল তার বাইরের পৃথিবী। তারপর স্কুলে যাবার নাম করে ঘনঘন বাইরে যেতে লাগল সে। ধরুন, আপনি শনি আর রোববার দু'ঘণ্টা করে ওকে বাইরে যাবার অনুমতি দিলেন। ধরুন সে বুঝতে পারল ফাঁকি না দিলেও সে এখন বাইরে যাবার সুযোগ পাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় না এরপর থেকে সে নিজেই ডোর ব্যবহার করবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং তাকে নিয়ে যেসব ঝামেলায় আপনাদের পড়তে হচ্ছে সেগুলোর আস্তে আস্তে অবসান ঘটবে ?'

'কিন্তু ওকি আদৌ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে ?'

ওঠে দাঁড়ালেন ড. স্লোন। 'মিসেস হ্যান'শ, আপনার ছেলের যতটুকু স্বাভাবিক থাকার দরকার ততটুকু সে আছে। এ মুহূর্তে সে বিভিন্ন ফলের স্বাদ নিচ্ছে। তবে আপনি ওর সঙ্গে সহযোগিতা করলে দেখবেন ওকে নিয়ে আর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। বয়স যত বাড়বে সমাজের চাহিদা এবং প্রত্যাশার ব্যাপারে ততই সচেতন হয়ে উঠবে রিচার্ড। নিজেকে মানিয়ে

চলতে শিখবে। আর আমাদের সবার মধ্যেই মেনে না চলার প্রবণতা কম বেশি কাজ করে। বড় হবার পরে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা হ্রাস পেতে থাকে। ওর ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবেন না। রিচার্ড তা হলে ঠিক হয়ে যাবে।'

দরজার দিকে পা বাড়ালেন ডক্টর।

মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'ওর তা হলে প্রোবের দরকার নেই?'

সজোরে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন স্লোন। 'অবশ্যই না। ওর এরকম কিছুর মোটেই দরকার নেই।'

দরজার কমবিনেশন বোর্ডে হাত দিতে গিয়েও থেমে গেলেন স্লোন। তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে মিসেস হ্যান'শ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, ড. স্লোন?'

বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে নিলেন স্লোন। ডোর-এর দিকে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালেন। নরম গলায় বললেন, 'জানেন, আজ কি সুন্দর একটি দিন? ঠিক করেছি আজ আমি বাইরে খানিক হেঁটে বেড়াব।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

দ্য উইপন টু ড্রেডফুল টু ইউজ

কার্ল ফ্র্যানটরের কাছে ভীষণরকম বিষণ্ণ ঠেকল চারপাশের সবকিছু। নিচে ঝুলে আসা মেঘ থেকে কুয়াশার মতো বৃষ্টি ঝুর ঝুর করে পড়ছে তো পড়ছেই, আশেপাশে ছড়ানো রবারের মতো ছোট ছোট লালচে-বাদামী উদ্ভিদ। মাঝেসাঝে বিলাপ করার মতো ডাক ছেড়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হপ-স্কচ পাখি।

কার্ল মাথা ঘোরাল আফ্রোদোপোলিশের ছোট্ট গম্বুজটার দিকে, ওটাই শুক্রগ্রহের বৃহত্তম শহর।

'ঈশ্বর,' বলল সে বিড়বিড় করে, 'ওই গম্বুজও বিশ্রী এই জায়গাটার চেয়ে ভালো লাগছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।'

এবার সে ফিরল ছোটখাট চেহারার শুক্রবাসী, অ্যান্টিলের দিকে, 'ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছুতে আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে, অ্যান্টিল?'

কোনো জবাব নেই। কার্ল লক্ষ করল, তার সবুজ গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে পানি, আরেকটা ফোঁটা চকচক করছে বড় বড় অপূর্ব লেমুরের মতো চোখে।

স্বর নরম হয়ে এল মানুষটার। 'সরি, অ্যান্টিল, আমি শুক্রের বিপক্ষে কিছু বলতে চাই না।'

অ্যান্টিল তার সবুজ মুখ ঘোরাল কার্লের দিকে, 'আমি ওই কথা ভাবিনি, বন্ধু। অপরিচিত এই জায়গা তোমার ভালো না লাগাটাই স্বাভাবিক। তবে আমি শুক্রকে ভালোবাসি, আমি কাঁদছি তার সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে।'

খানিক বিরতি দিয়ে আবার বলতে লাগল অ্যান্টিল, 'জানি আমার কথা

তোমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে, কিন্তু আমার কাছে শুক্র হল স্বর্গ, একটা সোনার দেশ—এর প্রতি আমার অনুভূতি আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না।'

'তবু অনেকে বলে যে একমাত্র মানুষই ভালোবাসতে পারে,' সহানুভূতি ঝরে পড়ল কার্লের স্বরে।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল শুক্রবাসী। 'আবেগ অনুভবের ক্ষমতার বাইরেও অনেক কিছু আছে, যেগুলো থেকে তোমাদের পৃথিবীবাসী আমাদের বঞ্চিত করেছে।'

দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করল কার্ল। 'আচ্ছা, অ্যান্টিল, শুক্র কি তোমার কাছেও নীরস মনে হয় না ? তুমি তো পৃথিবীতে গিয়েছ। পৃথিবীর চোখজুড়ান, প্রাণবন্ত রঙের সঙ্গে কি এই বাদামী আর ধূসরের কোনো তুলনা হতে পারে ?'

'আমার কাছে এখানকার রঙ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। তোমার চেয়ে আমার রঙ দেখার চোখ অনেক আলাদা*, সে-কথা বোধ হয় ভুলে গেছে। শুক্রের রঙ, অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার নেই।' মুগ্ধতায় কথা হারিয়ে গেল অ্যান্টিলের, কিন্তু কার্লের কাছে এই বাদামী আর ধূসরের কোনো বৈচিত্রই ধরা পড়ল না।

'একদিন,' স্বপ্নাচ্ছন্ন সুরে বলতে লাগল অ্যান্টিল, 'শুক্র আবার শুক্রবাসীদের হবে। মানুষেরা আমাদের আর শাসন করবে না, পূর্বপুরুষদের গৌরব আবার ফিরে আসবে আমাদের কাছে।'

কার্ল হাসল। 'অ্যান্টিল, তুমি যে গ্রীন ব্যান্ডসের সদস্যদের মতো কথা বলছ, এরা তো সরকারকে জ্বালিয়ে খেয়েছে। আমার ধারণা, হিংস্রতায় তোমার বিশ্বাস নেই।'

'সত্যিই নেই, কার্ল,' কিছুটা আতঙ্ক ভর করল অ্যান্টিলের চোখে, 'কিন্তু চরমপন্থীরা শক্তি সঞ্চয় করছে, আর আমার মাথায় ঘুরছে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির দুঃশ্চিন্তা। তবে—তবে পৃথিবীর বিরুদ্ধে যদি প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয়, তাদের সঙ্গে যোগদান আমাকে করতেই হবে।'

---

* শুক্রবাসীরা এমন হাজারো রঙ দেখতে পায়, যেগুলো দেখা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

'কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমার তো মতের মিল নেই।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, এই ভঙ্গিটা শিখেছে মানুষদের কাছ থেকে, 'হিংস্রতার পথ ধরে আমরা কিছু পাবো না। তোমাদের সংখ্যা যেখানে পাঁচ বিলিয়ন, সেখানে আমাদের মাত্র একশ মিলিয়ন। তোমাদের সম্পদ আর অস্ত্র আছে, আমাদের নেই। ফলে এরকম কিছু করা হবে বোকামি, আর তারপরেও যদি আমরা জয়লাভ করি, হয়তো আমরা রেখে যাব ঘৃণার এমন এক উত্তরাধিকার যে এই গ্রহে কখনোই আর শান্তি আসবে না।'

'তাহলে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে কেন?'

'আমি একজন শুক্রবাসী বলে।'

কার্ল এবার ফেটে পড়ল হাসিতে। 'দেশপ্রেম তো মনে হচ্ছে পৃথিবীর মতোই শুক্রতেও যুক্তির কোনো ধার ধারে না। যাক গে, চল এখন তোমাদের প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের দিকে এগোন যাক। আমরা কি ওটার কাছাকাছি এসেছি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল অ্যান্টিল, 'তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে একমাইলের আর কিছু বেশি হবে এখান থেকে। তবে মনে রেখ, ওখানকার কোনো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা চলবে না। অ্যাস-টাজ-জরের ধ্বংসাবশেষ আমাদের কাছে পবিত্র, কারণ, ওগুলো আমাদের খ্যাতিমান পূর্বপুরুষদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।'

চুপচাপ নরম মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল দু'জনে। অ্যান্টিলই আবার শুরু করল কথা।

'হতভাগ্য শুক্র।' স্বর তার বিষণ্নতামাখান। 'পঞ্চাশ বছর আগে এখানে মানুষ এল শান্তি আর প্রাচুর্যের আশ্বাস নিয়ে—আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা দেখলাম পান্নার খনি আর জুজুগাছ, লোভে তাদের চোখে চকচক করে উঠল। তারপর আরো মানুষ এল, ধীরে ধীরে বেড়ে গেল তাদের ঔদ্ধত্য। আর এখন—'

'এরকম করা মানুষের উচিত হয়নি, অ্যান্টিল,' বলল কার্ল, 'কিন্তু তুমিও বিষয়গুলো খুব বড় করে দেখছ।'

'বড় করে দেখছি! আমাদের ভোটাধিকার আছে? কোনো প্রতিনিধিত্ব আছে শুক্রের প্রভিনশিয়াল কংগ্রেসে? মানুষের সঙ্গে একই স্ট্র্যাটোকারে

ওঠা, একই হোটেলে খাওয়া, কিংবা একই বাসায় থাকার ব্যাপারে কি শুক্রবাসীদের বিরুদ্ধে আইন হয়নি ? সব কলেজ কি আমাদের জন্যে বন্ধ নয় ? শুক্রের সেরা আর সবচেয়ে উর্বরা অংশগুলো কি মানুষেরা অগ্রাধিকারের আওতায় নেয়নি ? পৃথিবীবাসীরা আমাদের আপন গ্রহে কি আমাদের জন্যে অধিকার বলে কিছু রেখেছে ?'

'তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য, আর আমি এজন্যে খুবই দুঃখিত, কিন্তু এরকম অবস্থা একসময় পৃথিবীতেও ছিল। সেখানেও তথাকথিত নিম্নস্তরের জাতির ধুয়ো তুলে অনেককে বঞ্চিত করা হয়েছে, তারপর নানা পথ পেরিয়ে আজ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমঅধিকার। পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষেরা কিন্তু তোমাদেরই পক্ষে। যেমন ধর, আমি কি কখন কোনো শুক্রবাসীর বিপক্ষে কোনো রকম সংস্কার দেখিয়েছি ?'

'না, কার্ল, তা দেখাওনি। কিন্তু কতজন বুদ্ধিমান মানুষ সেখানে আছে ? যুদ্ধ আর দুর্দশার লক্ষ লক্ষ বছর পেরিয়ে পৃথিবীতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি শুক্রবাসীরা ওরকম লক্ষ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে রাজি না হয় ?'

কার্ল ভ্রূ কোঁচকাল, 'ঠিকই বলেছ তুমি, কিন্তু অপেক্ষা তোমাদের করতেই হবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করার আছে তোমাদের ?'

'জানি না—আমি জানি না,' বলল অ্যান্টিল।

হঠাৎ কার্লের মনে হল, অ্যাস-টাজ-জরের এই ধ্বংসাবশেষ দেখতে না আসাটাই সবচেয়ে ভালো ছিল। এই একঘেয়ে চেহারার ভূখণ্ড আর তার পাশাপাশি অ্যান্টিলের যুক্তিপূর্ণ খেদ তার মনকে একেবারে দমিয়ে দিয়েছে। সে যখন সব বাতিল করে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছে, ঠিক সেই সময় শুক্রবাসী নির্দেশ করল সামনের এক স্তূপের দিকে।

'ওটাই প্রবেশ পথ,' বলল সে , 'বহু বছর ধরে অ্যাস-টাজ-জর তলিয়ে আছে মাটির নিচে, আর শুক্রবাসীরাই কেবল এটার কথা জানে। এখানে আসা তুমিই প্রথম মানুষ।'

'আমি এটা সম্পূর্ণ গোপন রাখব, অ্যান্টিল। তোমাকে তো কথা দিয়েছি আমি।'

'তাহলে এস।'

অ্যান্টিল বুনো লতাপাতা সরাতে বড় দুই পাথরের মাঝখানে দেখা গেল সরু একটা প্রবেশ পথ, কার্লকে ইশারা করল সে তাকে অনুসরণ করার জন্যে। হামাগুড়ি দিয়ে দু'জনে গিয়ে পৌঁছুল সরু, স্যাঁতসেঁতে একটা করিডরে। একটা অ্যাটোমাইট ল্যাম্প জ্বালল অ্যান্টিল, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল মুক্তোর মতো শাদা আলো।

'এসব করিডর আর গর্ত,' বলল সে, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা খুঁড়েছে তিনশ বছর আগে। তারা এই শহরটাকে একটা পবিত্র স্থান মনে করত। পরে আমরা এটাকে অবহেলা করেছি। অনেক দিন পর আমিই আজ এলাম এখানে। এটা হয়তো জাতি হিসেবে আমাদের অধঃপতনের একটা চিহ্ন।'

একশো গজেরও বেশি তারা এগোল সোজাসুজি, তারপর করিডরগুলো ছড়িয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক গম্বুজে। সামনের দৃশ্য দেখে ঢোক গিলল কার্ল। এখানকার স্থাপত্যের সঙ্গে একমাত্র পাল্লা দিতে পারে প্রাচীন এথেন্সের স্থাপত্য। তবে সবই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে অ্যান্টিল ঢুকে পড়ল আরেকটা গর্তে, মাটি আর পাথরের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সেটা আধ মাইল। আশেপাশে শাখার মতো হয়ে চলে গেছে আরো সব করিডর।

আবার তারা পৌঁছুল সবুজ পাথরে নির্মিত প্রসারিত একটা দালানে। ডানপাশটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, বাদবাকি অংশ প্রায় অক্ষত।

গর্বে ঝলমল করে উঠল শুক্রবাসীর চেহারা। 'এটাকে আধুনিক কালের হিসেবে শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের একটা যাদুঘর বলতে পার। এখানে তুমি দেখতে পাবে অতীত শুক্রের সংস্কৃতি আর মহান সব বৈশিষ্ট্য।'

উত্তেজিত কার্ল ঢুকে পড়ল ভেতরে, প্রথম মানুষ হিসেবে সে-ই দেখছে শুক্রের এসব অতীত গৌরব। কেন্দ্রীয় কলোনেড থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশকিছু গভীর চোরাকুঠুরি, সিলিং জুড়ে বিশাল এক চিত্রকর্ম।

চোরাকুঠুরিগুলোতে কার্ল ঘুরে বেড়াতে লাগল অভিভূত হয়ে। আশেপাশের চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যে মিশে থাকা অলৌকিকতা সেগুলোর সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করেছে।

কার্ল উপলব্ধি করল, শুক্রের চিত্রকর্ম বোঝার ক্ষমতা পুরোপুরি না থাকলেও সে একেবারে অন্ধও নয়। পৃথিবীর যত চিত্র কর্ম সে দেখেছে, তার কোনোটাই যেন সৌন্দর্যে এগুলোর পাশে দাঁড়ানর যোগ্যতা রাখে না।

'রঙ উপলব্ধির বিচারে,' বলল সে অ্যান্টিলকে, 'তোমাদের কাছে তো মিকেলেঞ্জেলোও হার মানে দেখছি।'

সুখে বুক ফুলে উঠল অ্যান্টিলের। 'প্রত্যেক জাতিরই রয়েছে তাদের নিজস্ব গুণাবলী। আমার ইচ্ছে হয় তোমাদের মতো শব্দের সূক্ষ্ম অংশগুলো শোনার, তাহলে সঙ্গীত হয়তো আমাকে তোমাদের মতোই আনন্দ দিত। ওভাবে শুনতে পাই না বলেই সঙ্গীত আমার কাছে বিরক্তিকর এক বিষয়।'

এগোল তারা, শুক্রের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই বেড়ে চলল কার্লের। একজায়গায় স্তূপ করা আছে সরু, লম্বা লম্বা হাজার হাজার ধাতব টুকরো। কার্লের মনে হল, এমন রহস্য হয়তো লুকিয়ে আছে সেগুলোর মাঝে, যার ভেদ জানার জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা প্রাণপাত করতে প্রস্তুত।

তারপর অ্যান্টিল যখন ছ'ইঞ্চি উঁচু একটা জিনিস দেখিয়ে বলল যে ওটা এক ধরনের অ্যাটমিক কনভার্টার, যা পৃথিবীর সর্বাধুনিক মডেলের চেয়ে কয়েক গুণ কার্যকর, তখন প্রায় ফেটে পড়ল কার্ল।

'তুমি পৃথিবীর কাছে এসব রহস্য ফাঁস করনি কেন? তারা তোমাদের এই অতীত অর্জনগুলোর কথা জানতে পারলে শুক্রবাসীরা উন্নত জাতির মর্যাদা পেত।'

'তারা আমাদের অতীত জ্ঞানকে ব্যবহার করত নিঃসন্দেহে,' তিক্ত স্বরে বলল অ্যান্টিল, 'কিন্তু শুক্রবাসীদেব ওপর দমননীতি কখনোই ত্যাগ করত না। আশা করি গোপনতা রক্ষার কথাটা ভুলে যাবে না তুমি।'

'না, কিন্তু আমার মনে হয তুমি একটা ভুল করছ।'

'আমার মনে হয় না,' চোপকুঠুরি থেকে বেববার জন্যে ঘুরল অ্যান্টিল, কিন্তু কার্ল তাকে থামতে বলল।

'ওই ছোট্ট ঘরটাতে যাবে না?' জানতে চাইল সে।

পাঁই করে ঘুরল অ্যান্টিল, 'ঘর? কোন ঘরের কথা বলছ তুমি? এখানে কোনো ঘর নেই।'

বিস্ময়ে ভ্রূ ওপরে উঠে গেল কার্লের. চুপচাপ হাত তুলে দেখাল সে পেছনের দেয়ালের সরু ফাটলটাকে।

বিড়বিড় করে কি যেন বলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল শুক্রবাসী, সরু সরু আঙুল তার ঢুকে গেল ফাটলে।

'আমাকে সাহায্য করো, কার্ল, এই দরজা খোলার জন্যে তৈরি হয়নি। এরকম কোনো দরজার উল্লেখ নেই কোথাও। অ্যাস-টাজ-জরের ধ্বংসাবশেষের কথা আমার চেয়ে বেশি সম্ভবত আমাদের জাতির আর কেউ জানে না।'

দু'জন মিলে ঠেলতে লাগল দেয়ালটা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন খানিক পিছিয়ে গেল সেটা, তারপর হঠাৎ তাদের একরকম ছুঁড়ে ফেলল ফাঁকা, ছোট্ট ওপাশের একটা ঘরে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল তারা চারপাশে।

মেঝের ওপর পড়ে থাকা মরচের গুঁড়ো দেখাল কার্ল। 'তোমার পূর্বপুরুষেরা ঘরটাকে বেশ ভালোভাবেই বন্ধ করেছিল, কিন্তু মহাকালের কাছে হার মেনে ভেঙে গেল দরজার মরচে ধরা কব্জাগুলো। তুমি নিশ্চয় ভাবছ, তারা এখানে লুকিয়ে রেখেছে ভীষণ গোপন কোনো জিনিস।'

অ্যান্টিল নাড়াল তার সবুজ মাথা। 'শেষ সেবার এসেছিলাম, দরজার কোনো চিহ্ন এখানে ছিল না। যাই হোক—' অ্যাটোমাইট ল্যাম্পটা ওপরে তুলে ধরে ঘরটায় দ্রুত দৃষ্টি বোলাল সে। 'এখানে তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

তার ধারণা সঠিক। সাধারণ চেহারার আয়তাকার একটা সিন্দুক কেবল মোটা মোটা ছ'টা পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। বহু দিন বন্ধ থাকায় পুরো ঘরে বিশ্রী একটা গন্ধ।

সিন্দুকটাকে সরাবার চেষ্টা করল কার্ল। একচুলও নড়ল না, কিন্তু তার হাতের চাপে সরে গেল ওপরের ঢাকনা।

'দেখ, অ্যান্টিল,' নির্দেশ করল সে ভেতরের একটা খোপের দিকে। সেখানে পড়ে আছে বর্গাকার চকচকে কাচের মতো একটা জিনিস, আর ফাউন্টেন পেনের মতো পাঁচটা ছ'ইঞ্চি লম্বা লম্বা সিলিন্ডার।

আনন্দে চিৎকার ছাড়ল অ্যান্টিল। চকচকে আবরণ সরিয়ে জিনিসটাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে গভীর মনোযোগে। কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ল কার্লও। জিনিসটার সারা গায়ে ছড়ান রঙ-বেরঙের সব বিন্দু, এগুলো দেখে অ্যান্টিলের চরম উল্লসিত হবার কারণটা সে ঠিক বুঝতে পারল না।

'এটা কি, অ্যান্টিল?'

'আমাদের পূর্বপুরুষের আনুষ্ঠানিক ভাষা। এ-যাবৎ এই ভাষার

টুকরো-টাকরা পেয়েছি আমরা এখানে-সেখানে, কিন্তু এমন পূর্ণাঙ্গভাবে কোথাও নয়। এটা একটা বিরাট আবিষ্কার।'

'তুমি এটার পাঠোদ্ধার করতে পারবে?' জানতে চাইল কার্ল।

'মনে হয় পারব। এটা একটা মৃত ভাষা, যার আমি খুব সামান্যই জানি। রঙ-নির্ভর একটা ভাষা এটা। প্রত্যেকটা অক্ষরকে বোঝান হয়েছে দু'টো কিংবা তিনটে রঙিন বিন্দু একত্রিত করে। কোনো মানুষের এই ভাষা সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও স্পেকট্রোস্কোপ ছাড়া সে সম্ভবত পড়তে পারবে না।'

'এখন এটা নিয়ে কাজ করতে পারবে?'

'পারব মনে হয়, কার্ল। অ্যাটোমাইট ল্যাম্পের আলোয় কাজ করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তবে কাজটা করতে একটু সময় লাগতে পারে, তাই এই ফাঁকে তুমি বরং জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দালানের ভেতরে আছ, তোমার হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই।'

আরেকটা অ্যাটোমাইট ল্যাম্প নিয়ে চলে গেল কার্ল। প্রাচীন লিপির ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব ধীরে ধীরে তার পাঠোদ্ধার করতে লাগল অ্যান্টিল।

দু'ঘন্টা পর ফিরে কার্ল দেখল, অ্যান্টিল তখনো প্রায় একই রকমভাবে ঝুঁকে আছে। তবে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আতঙ্কিত একটা দৃষ্টি, কার্লের জোর পদশব্দে ফিরেও তাকাল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে।

একলাফে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কার্ল। 'কী ব্যাপার অ্যান্টিল, কী হয়েছে?'

ধীরে মাথা ঘোরাল সে, চোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি। তার হালকা কাঁধ দু'টো ধরে নির্দয়ভাবে ঝাঁকাতে লাগল কার্ল।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শুক্রবাসী। সিলিন্ডারের মতো জিনিস পাঁচটা নিয়ে সে তার থলেতে রাখল খুব সাবধানে। তারপর রাখল পাঠোদ্ধার করা বর্গাকার স্ল্যাবটাও।

সবশেষে সিন্দুকের ঢাকনাটা যথাস্থানে টেনে এনে, কার্লকে বাইরে যাবার ইশারা করল সে। 'এক্ষুনি রওনা দিতে হবে আমাদের। এখানে খুব বেশি থাকা হয়ে গেছে।' তার শঙ্কিত স্বর অস্বস্তি জাগাল কার্লের মনে।

ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে, আবার তারা ফিরে এল শুক্রের স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর। চারদিকে এখনো দিনের আলো, তবে গোধূলি নামার খুব

বেশি দেরি নেই। খিদের একটা মোচড় অনুভব করল কার্ল। রাত নামার আগেই আফ্রোদোপোলিশে পৌঁছুতে হলে পা চালাতে হবে। স্লিকারের কলারটা তুলে দিয়ে, ক্যাপটা কপালের ওপর আরো টেনে দিল কার্ল।

কয়েক মাইল এগোনর পর দূরে ফুটে উঠল শহরের গম্বুজ। বাসী হ্যাম স্যান্ডউইচ চিবুতে চিবুতে, যথা শিগগির শহরের উষ্ণতায় ফেরার কথা ভাবছিল কার্ল। ওদিকে দু'একবার তার দিকে তাকান ছাড়া একটা কথাও বলেনি শুক্রবাসী।

বেশির ভাগ মানুষের চেয়ে শুক্রবাসীদের প্রতি কার্লের একটা আলাদা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তারপরেও এদের অতি আবেগ তার ঠিক পছন্দ নয়।

অ্যান্টিলের আতঙ্কিত চেহারাটার কথা ভেবে আবার অস্বস্তিবোধ করল কার্ল। আতঙ্কিত হয়েছিল সে অদ্ভুত স্ল্যাবটার পাঠোদ্ধার করার পর। শুক্রের অতীত বিজ্ঞানীরা রহস্যের কোনো বার্তা রেখে গেছে সেখানে?

সামান্য ইতস্তত করে কার্ল জানতে চাইল, 'স্ল্যাবটায় কি লেখা ছিল, অ্যান্টিল? তুমি সঙ্গে করে নিয়ে আসায় মনে হল, নিশ্চয় আকর্ষণীয় কিছু হবে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটার গতি আর বাড়িয়ে দিল অ্যান্টিল। এই আচরণে মনে মনে একটু আহত হল কার্ল, বাকি রাস্তায় আরো কিছু বলার চেষ্টা করল না সে।

আফ্রোদোপোলিশে পৌঁছে নীরবতা ভঙ্গ করল শুক্রবাসী। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মনে হল, নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে শেষমেষ যেন কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

'কার্ল,' বলল সে, 'আমরা বন্ধু ছিলাম, তাই বন্ধু হিসেবেই তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। আগামী সপ্তাহে তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছ। আমি জানি, তোমার বাবা প্ল্যানেটারি প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের উচ্চপদে আছেন। অদূর ভবিষ্যতে তুমিও সম্ভবত উচ্চপদস্থ হবে। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তোমার সর্বশক্তি ব্যয় করবে, যেন পৃথিবী শুক্রের প্রতি তার আচরণ সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে। তাহলে আমিও শুক্রের সবচেয়ে বড় গোত্রের একজন উত্তরাধিকারী হিসেবে সমস্ত হিংস্রতা দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল কার্লের। 'মনে হচ্ছে এসবের পেছনে কিছু একটা আছে। তুমি ঠিক কি বলতে চাও?'

'খুব শিগগির পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শুক্র বিদ্রোহ করবে। সেক্ষেত্রে আমাকে শুক্রের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে, এবং আমি পক্ষ নিলে শুক্র আর অসহায় থাকবে না।'

কথাগুলো শুনতে মজাই লাগল কার্লের। 'শোনো, অ্যান্টিল, তোমার দেশপ্রেম প্রশংসনীয়, তোমার খেদের পেছনেও যুক্তি আছে, কিন্তু অতি নাটকীয়তা আর উৎকট স্বাদেশিকতা একেবারেই পছন্দ নয় আমার। সর্বোপরি, আমি বাস্তববাদী।'

ভীষণ এক আন্তরিকতা ঝরে পড়ল শুক্রবাসীর স্বরে। 'বিশ্বাস করো, কার্ল, চূড়ান্ত বাস্তব কথাই বলেছি আমি। শুক্রের বিদ্রোহ শুরু হলে পৃথিবীর নিরাপত্তা আমি দিতে পারব না।'

'পৃথিবীর নিরাপত্তা!' কথাটার গুরুত্বই যেন কার্লকে একেবারে স্তব্ধ করে দিল।

'হ্যাঁ,' বলল অ্যান্টিল, 'কারণ, এদের চাপে আমি হয়তো শেষমেষ পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হব।' কথা শেষ করেই গম্বুজের বাইরের নিজ ছোট্ট গ্রামে যাবার জন্যে ঝোপের ভেতরে হারিয়ে গেল শুক্রবাসী।

পাঁচ বছর কেটে গেল বিক্ষোভ আর অশান্তির মাঝ দিয়ে। পরিস্থিতি বার বার বিপদ সঙ্কেত দিল, কিন্তু আফ্রোদোপোলিশ, ভেনুসিয়া এবং গম্বুজ-ঢাকা অন্যান্য শহরগুলোর প্রভুরা শুক্রবাসীদের গ্রাহ্যই করল না।

শক্তি সঞ্চয় করল গ্রীন ব্যান্ডস, তারপর সবাই মিলে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ল সুসংগঠিত বিদ্রোহে।

অপ্রস্তুত ছোট শহরগুলো প্রথমেই হার মানল। তারপর একে একে দ্রুত পতন হল নিউ ওয়াশিংটন, মাউন্ট ভালকান, সেন্ট ভেনিসসহ সমগ্র পূর্ব প্রদেশের। পৃথিবীবাসী ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই শুক্রের অর্ধেক তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।

হঠাৎ এই জরুরী অবস্থায় অবরোধ করা শহরগুলোতে পৃথিবী পাঠাল অস্ত্র এবং অন্যান্য সরবরাহ, তারপর হারান ভূখন্ড পুনরুদ্ধারের জন্যে সজ্জিত করতে লাগল বিশাল একটা স্পেস ফ্লীট।

পৃথিবী বিরক্ত হল, কিন্তু আতঙ্কিত নয়। ভাবল, আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত শহরগুলো ধীরেসুস্থে আবার দখল করে নিলেই চলবে, আর যেগুলো এখনো দখলে আছে, সেগুলো চিরকালই দখলে থাকবে।

কিন্তু শুক্রের অগ্রযাত্রা থামল না। স্থানীয় অধিবাসীর ছোট একটা দল এসে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করল ভেনুসিয়া সিটির কাছে। তৎক্ষণাৎ সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করল ভেনুসিয়া, আর এই সংবাদ পৃথিবীতে পৌঁছামাত্র শুক্রবাসীদের নিয়ে তারা শুরু করল হাসাহাসি।

তারপর হঠাৎ করেই একদিন বন্ধ হয়ে গেল সংবাদ। ভেনুসিয়া সিটির পতন হল।

তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল বার বার। এমনকি আফ্রোদোপোলিশের পাঁচ লাখ মানুষ তাদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র নিয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করল মাত্র পাঁচশ শুক্রবাসীর কাছে।

তবুও পুরো ঘুম ভাঙল না পৃথিবীর, কিন্তু ইনার কাউন্সিলে কূটনীতিকদের ভ্রূ কুঁচকে গেল শিক্ষামন্ত্রীর পুত্র কার্ল ফ্র্যানটরের আজব বর্ণনা শুনে।

রিপোর্ট শেষ হতে রেগেমেগে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সমরমন্ত্রী জ্যান হিয়ারসেন।

'তুমি কি ভেবেছ, আধপাগলা এক শুক্রবাসীর আজেবাজে কথাকে গুরুত্ব দিয়ে, শুক্রের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করব আমরা তাদেরই শর্ত অনুসারে? এটা এক কথায় অসম্ভব। ওই পশুগুলোর দরকার কেবল শক্ত মার। আমাদের ফ্লীট তাদের মহাবিশ্ব থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'নিশ্চিহ্ন করা অত সহজ না-ও হতে পারে, হিয়ারসেন,' দ্রুত পুত্রের পক্ষে কথা বলে উঠল পাকা-চুলো সিনিয়র ফ্র্যানটর। 'আমরা অনেকেই মনে করি, শুক্রবাসীদের ব্যাপারে নেয়া সরকারের সব পদক্ষেপই ভুল। কোন ধরনের অস্ত্র তারা খুঁজে পেয়েছে কে জানে!'

'রূপকথা!' বলল হিয়ারসেন। 'তুমি তো ওই সবুজগুলোকে মানুষ মনে করছ দেখছি। তারা হল জানোয়ার, সুতরাং আমাদের দেয়া সুযোগ-সুবিধে নিয়ে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মনে রেখ, আমরা তাদের সঙ্গে যে-আচরণ করছি, অতীত পৃথিবী মানুষের কিছু কিছু জাতির সঙ্গেই সেই আচরণ করেনি। যেমন, রেড ইন্ডিয়ান।'

বিরক্তিতে আবার ফেটে পড়ল কার্ল ফ্র্যানটর। 'আপনারা যা-ই বলুন, আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। অ্যান্টিলের হুমকি শুনতে যতই অর্থহীন মনে হোক, সেটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই— বিশেষ করে, শুক্রের ক্রমাগত বিজয়ের পর সেটাকে আর যা-ই হোক অর্থহীন বলা চলে না। আপনারা অ্যাডমিরাল ফন ব্লামডর্ফের সঙ্গে একজন দূত হিসেবে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিন। তাদের আক্রমণ করার আগে ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখে আসি।'

এই প্রথম মুখ খুলল প্রেসিডেন্ট জুল ভেবুক। 'ফ্র্যানটরের প্রস্তাবে যুক্তি আছে। বেশ, সেই ব্যবস্থাই হবে। কারো কোনো আপত্তি আছে?'

কেউ আপত্তি তুলল না, কেবল গজগজ করতে লাগল হিয়ারসেন। এক সপ্তাহ পর স্পেস ফ্লীটের সঙ্গে কার্ল ফ্র্যানটর রওনা দিল শুক্রগ্রহের উদ্দেশে।

পাঁচ বছরের অনুপস্থিতির পর শুক্রকে অনেকটাই অচেনা ঠেকল কার্লের। স্যাঁতসেঁতে মাটি, একঘেয়ে বাদামী আর ধূসর রঙ আগের মতো থাকলেও বদলে গেছে শুক্র।

আগে মানুষের সামনে মাথা নিচু করে থাকত শুক্রবাসীরা, এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আফ্রোদোপোলিশ এখন স্থানীয় অধিবাসীদের দখলে, আর তার ভূতপূর্ব সরকারের অফিসে বসে আছে অ্যান্টিল।

প্রথমে কথাই খুঁজে পেল না কার্ল। 'ও, তাহলে শান্তিবাদীই আছে সবকিছুর পেছনে,' বলল সে অবশেষে।

'ওটা ছিল সময়ের দাবি,' জবাব দিল অ্যান্টিল। 'কিন্তু তুমি! পৃথিবীর মুখপাত্র হিসেবে তুমি আসবে ভাবিনি।'

'কয়েক বছর আগে আমার কাছেই তুমি বলেছিলে অর্থহীন এক হুমকির কথা, তাই আমাকেই আসতে হল। তবে আমি খালিহাতে আসিনি।' ওপরে অপেক্ষমান স্পেস ফ্লীটটার দিকে ইশারা করল সে।

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ?'

'না। আমি এসেছি তোমার উদ্দেশ্য আর শর্ত শুনতে।'

'খুবই সহজ শর্ত আমাদের। শুক্র স্বাধীনতা চায়, পরিবর্তে তোমরা পাবে বন্ধুত্ব আর অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ।'

'আর আশা করছ, কোনো রকম সংঘর্ষ ছাড়াই পৃথিবী সব দাবি মেনে নেবে।'

'হ্যাঁ, আশা করছি। পৃথিবী মেনে নেবে নিজেরই স্বার্থে।'

বিরক্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিল কার্ল, 'ঈশ্বরের দোহাই, অ্যান্টিল, ওসব রহস্যময় ইঙ্গিতের সময় পার হয়ে গেছে। যা বলার সোজাসুজি বল। আফ্রোদোপোলিশ এবং অন্যান্য শহরকে এত সহজে পরাজিত করলে কিভাবে?'

'আমরা এটা চাইনি, কার্ল, কিন্তু আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।' যন্ত্রণা প্রকাশ পেল অ্যান্টিলের স্বরে। 'আমাদের দেয়া আত্মসমর্পণের সহজ শর্ত না মেনে তারা চালাতে লাগল টোনাইট গান। ফলে আমাদের ব্যবহার করতে হল—সেই অস্ত্র। পরে তাদের বেশির ভাগকেই মেরে ফেলতে হয়েছে আমাদের—দয়াপরবশ হয়ে।'

'বুঝতে পারলাম না। কোন অস্ত্রের কথা বলছ?'

'অ্যাস-টাজ-জরের ধ্বংসাবশেষে যাবার কথা মনে পড়ে, কার্ল? গোপন সেই ঘর; প্রাচীন সেই লিপি; সিলিন্ডারের মতো পাঁচটা ছোট ছোট জিনিস।'

মাথা নাড়াল কার্ল। 'একটু একটু মনে পড়ছে।'

'অস্ত্রটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কার্ল,' বলল অ্যান্টিল। 'এটা আবিষ্কার করেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা, কিন্তু কখনো ব্যবহার করেনি। তারা এটা লুকিয়ে রেখেছে, তবে ধ্বংস করে ফেললেই সবচেয়ে ভালো হত। ধ্বংস করেনি বলেই আমি এটা খুঁজে পেয়েছি, আর শুক্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমাকে এটা ব্যবহার করতেই হবে।'

এবার স্বর তার নেমে গেল ফিসফিসানিতে। 'সাধারণ চেহারার সে-সিলিন্ডারগুলো তুমি দেখেছ, কার্ল, ওগুলো শক্তির এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, যার ফলে মগজকে মন থেকে আলাদা করে ফেলা সম্ভব।'

'কী?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কার্লের মুখ। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'এ-কথা নিশ্চয় জান যে মগজ আসলে মনের আসন। মনের কার্যকলাপ খুবই রহস্যময়, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরাও উদঘাটন করতে পারেনি; তবে এটা জানা গেছে যে মন তার কাজের মাধ্যম হিসেবে মগজকে ব্যবহার করে।'

'হুঁ। তোমার অস্ত্র মগজ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, ফলে মন হয়ে পড়ে অসহায়—নিয়ন্ত্রণহীন পাইলটের মতো।'

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল অ্যান্টিল। তারপর হঠাৎ জানতে চাইল, 'ডিসেরিব্রেটেড পশু দেখেছ কখনো?'

'হ্যাঁ, একটা কুকুর—আমাদের কলেজের বায়ো কোর্সে।'

'আজ তোমাকে একটা ডিসেরিব্রেটেড মানুষ দেখাব।'

শুক্রবাসীকে অনুসরণ করে গিয়ে একটা এলিভেটরে উঠল কার্ল। এলিভেটর যখন নামতে লাগল নিচে, তার মনের মধ্যে শুরু হল তোলপাড়। যুগপৎ আতঙ্ক আর ক্রোধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে লাগল সে, পাশের শুক্রবাসীটাকে হত্যা করার প্রায় অদম্য এক ইচ্ছে জাগল। এক রকম ঘোরের মাঝে নামল সে এলিভেটর থেকে, অ্যান্টিলের পিছু পিছু চলল অন্ধকারাচ্ছন্ন এক করিডরের মাঝখানে দিয়ে, দু'পাশে ছোট ছোট সেল।

'ওই যে,' অ্যান্টিলের নির্দেশ অনুসরণ করে সে দেখতে পেল একটা মানুষকে।

মানুষ হয়েও ওটা অমানুষ। চুপচাপ বসে আছে ওটা মেঝের ওপর, ভাবলেশহীন বড় বড় চোখ সারাক্ষণ শূন্য দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ, ঝোলান ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বমন আটকাল কার্ল।

'তাকে ঠিক ডিসেরিব্রেটেড বলা যাবে না।' স্বর নামাল অ্যান্টিল। 'তার মগজের কোনো ক্ষতি হয়নি, সেটাকে কেবল বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।'

'ওটা বেঁচে আছে কীভাবে, অ্যান্টিল? মরছে না কেন?'

'অটোনমিক সিসটেম অক্ষত আছে বলে। তাকে দাঁড় করিয়ে দাও, পড়ে যাবে না। ধাক্কা দাও, ভারসাম্য ঠিক করে নেবে। তার হৃৎস্পন্দন আছে। সে শ্বাস নেয়। তার মুখে খাবার ঢুকিয়ে দিলে সে গিলবে, কিন্তু সামনে খাবারের থালা রাখলেও তা মুখে না তুলে অনাহারে মারা যাবে। এটাও এক-ধরনের জীবন, তবে এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। কারণ, এই বিচ্ছিন্নকরণ চিরস্থায়ী।'

'ওহ্, কী ভয়ঙ্কর!'

'তোমার ধারণার চেয়েও এটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। আমি নিশ্চিত যে দেহের খোলসেই অক্ষত সেই মনটা লুকিয়ে থাকে কোথাও। দেহের ভেতরে

থাকা সত্ত্বেও দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে-মন অক্ষম, তার যন্ত্রণাটা কল্পনা করতে পার ?'

কার্ল হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। 'অবর্ণনীয় এই হিংস্রতা দিয়ে তুমি পৃথিবীকে পরাজিত করতে পারবে না। তোমার অস্ত্র অবিশ্বাস্য ধরনের নৃশংস হলেও আমাদের ডজন খানেক অস্ত্রের চেয়ে মারাত্মক নয়। তোমাকে চরম মূল্য দিতে হবে।'

'কার্ল, "ডিসকানেকশন ফিল্ড"-এর ভয়ঙ্করত্বের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ ধারণাও তোমার নেই। আয়তন, এমনকি সময়েও এটা সীমাবদ্ধ নয়, ফলে এটার পাল্লা অসীম। তুমি কি জান যে এই অস্ত্রের মাত্র একবারের আঘাতে পুরো আফ্রোদোপোলিশের সমস্ত উষ্ণ-রক্তের প্রাণী জীবন্মৃত হয়ে যাবে ?' চড়ে গেল অ্যান্টিলের স্বর। 'তুমি কি জান যে সারা পৃথিবীকে এই ফিল্ডের আওতায় এনে মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষকে আমি স্তব্ধ করে দিতে পারি ?'

খসখসে এক অপরিচিত স্বরে কার্ল বলল, 'শয়তান! একমাত্র তুমিই কি এই নারকীয় ফিল্ডের কথা জান ?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল অ্যান্টিল। 'হ্যাঁ, কার্ল, একমাত্র আমিই জানি। তবু আমাকে হত্যা করে কোনো লাভ হবে না। কারণ, অন্যেরা জানে কোথায় পাওয়া যাবে প্রাচীন সেই লিপি, আর, আমার মতো পৃথিবীর প্রতি সহানুভূতি তাদের কিন্তু নেই। না, কার্ল, তোমার হাত থেকে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ, আমার মৃত্যুর অর্থ তোমার সাধের পৃথিবীর শেষ।'

একেবারে ভেঙে পড়ল কার্ল। শুক্রবাসীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহও আর নেই। 'স্বীকার করছি,' বিড়বিড় করতে লাগল সে, 'আমি স্বীকার করছি। পৃথিবীকে কি বলতে হবে ?'

'বলবে আমার শর্তের কথা, আর বলবে যদি চাই তাহলে আমি কি করতে পারি।'

পিছিয়ে গেল কার্ল, যেন শুক্রবাসীর স্পর্শেও ঘটবে নিশ্চিত মৃত্যু, 'তাদের বলব আমি কথাগুলো।'

'তাদের এ-কথাও বলবে যে শুক্র প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। আমাদের অস্ত্র আমরা ব্যবহার করতে চাই না, কারণ, ব্যবহার করার পক্ষে এই অস্ত্র

বড় বেশি ভয়ঙ্কর। তারা যদি আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তাহলে আমরাও আমাদের অতি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র পাঁচটাকে সূর্য বরাবর ছুঁড়ে ধ্বংস করে দেব।'

একইভাবে আবার বিড়বিড় করে উঠল কার্ল। 'তাদের বলব আমি কথাগুলো।'

অ্যাডমিরাল ফন ব্লামডর্ফ তার নামের মতোই আচরণেও প্রুশিয়ান। ফলে কার্লের রিপোর্ট পেয়ে সে যে আগুনের মতো তেঁতে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক।

'বোকা কোথাকার,' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আবার আমার কাছে এসেছ তুমি রহস্যময় সেই অস্ত্রের গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে। কোনোরকম প্রমাণ ছাড়া ওই সবুজ শয়তানটার সব কথা তুমি মেনে নিলে। তুমি হুমকি দিতে পারনি, ধোঁকা দিতে পারনি, মিথ্যে বলতে পারনি?'

'সে হুমকি দেয়নি, ধোঁকা দেয়নি, মিথ্যেও বলেনি,' কার্লও জবাব দিল তাতানো স্বরে। 'সে বলেছে নির্জলা সত্য। যদি ডিসেরিব্রেটেড সেই মানুষটাকে আপনি দেখতেন—'

'তোমার গল্পের ওটাই হল সবচেয়ে দুর্বল অংশ। একটা সত্যিকারের পাগলকে দেখিয়ে বলল, "এটাই আমাদের অস্ত্র!" আর তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা মেনে নিলে! বকবক করা ছাড়া আর কিছু তারা করেছে? প্রদর্শন করেছে অস্ত্রের ক্ষমতা? এমন কি অস্ত্রটা তোমাকে দেখিয়েছে?'

'প্রশ্নই ওঠে না। অস্ত্রটা মারাত্মক। সেটার ক্ষমতা প্রদর্শনের নামে তারা কোনো শুক্রবাসীকে হত্যা করতে পারে না। এখন অস্ত্র দেখানর প্রসঙ্গে বলব—আপনি কি আপনার গোপন অস্ত্র শত্রুকে দেখাবেন? এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। অ্যান্টিল এত আত্মবিশ্বাসী কেন? এত সহজে সে পুরো শুক্র দখল করে নিল কিভাবে?'

'স্বীকার করছি, আমি এটার ব্যাখ্যা দিতে পারব না, কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয় যে তাদের ব্যাখ্যাটাই সঠিক? যা-ই হোক, এই বিষয়ে আর একটা কথাও বলতে চাই না। আমরা এবার আক্রমণ চালাব। তাদের মুখোমুখি হব আমি টোনাইট প্রজেকটাইল নিয়ে। দেখতে পাবে, নিজেদের ধোঁকা কিভাবে তাদের নিজেদেরই হজম করতে হয়।'

'কিন্তু, অ্যাডমিরাল, আমার এই রিপোর্ট প্রেসিডেন্টকে দিতেই হবে আপনার।'

'অবশ্যই দেব, তবে আফ্রোদোপোলিশকে একেবারে গুঁড়ো করে দেবার পর।'

চালু করে দিল সে সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং ইউনিট। 'অ্যাটেনশন, অল শিপস! ব্যাটল ফরমেশন! পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত টোনাইট নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব আফ্রোদোপোলিশের ওপর।' এবার ঘুরল সে তার আর্দালির দিকে। 'ক্যাপ্টেন লারসেনকে আফ্রোদোপোলিশকে জানিয়ে দিতে বল যে শাদা পতাকা ওড়ানর জন্যে তারা পনেরো মিনিট সময় পাবে।'

এই ঘোষণার পর কার্ল ফ্র্যানটরের সময় কাটতে লাগল ভয়াবহ উত্তেজনার মাঝে। দু'হাতে মাথা গুঁজে বসে রইল সে, প্রত্যেক মিনিটের শেষে ক্রোনোমিটারের ঈষৎ ক্লিক শব্দ তার কানে আছড়ে পড়তে লাগল বজ্রপাতের মতো। নিজের অজান্তেই শব্দগুলোকে গুনতে লাগল সে ফিসফিস করে—৮—৯—১০. ঈশ্বর!

নিশ্চিত মৃত্যুর আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি! ফন ব্লামডর্ফের ধারণাই কি তাহলে ঠিক? ধোঁকা দিয়েছে শুক্রবাসীরা?

ছুটে এসে স্যালুট দিল একটা আর্দালি। 'শুক্র এইমাত্র জবাব দিয়েছে, স্যার।'

'আচ্ছা,' সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়ল ফন ব্লামডর্ফ।

'তারা বলেছে, "আক্রমণ না করার জন্যে ফ্লীটকে একান্ত অনুরোধ জানান হচ্ছে। আক্রমণ করলে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যে আমরা দায়ী থাকব না।"'

'এইটুকুই?' চিৎকার ছাড়ল অ্যাডমিরাল।

'জ্বী, স্যার।'

অ্যাডমিরাল এবার আগুন হয়ে গেল। 'শেষ পর্যন্ত ধোঁকা দিয়ে চলেছে শয়তানের দল।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল নির্দিষ্ট পনেরো মিনিট, মহাশক্তিশালী ফ্লীট একযোগে আক্রমণ চালাল দ্বিতীয় গ্রহের ওপর। টেলিভাইজরে দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে ক্রূর একটা হাসি ফুটে

উঠল ফন ব্লামডর্ফের মুখে, তারপরে হঠাৎ করেই নিখুঁতভাবে সজ্জিত ফ্লীটে শুরু হল এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

বিস্ময়ে চোখ ঘষল অ্যাডমিরাল। পাগল হয়ে গেছে যেন ফ্লীটের অর্ধেক। প্রথমে দুলতে লাগল শিপগুলো, তারপর গতিপথ পরিবর্তন করে ছুটে চলে গেল বিভিন্ন দিকে।

ফ্লীটের সুস্থ অর্ধেক মারফত সংবাদ এল, লেফট উইং তাদের রেডিও কলের কোনো জবাব দিচ্ছে না।

আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল আফ্রোদোপোলিশের ওপর। নতুন আদেশ জারি হল পাগলের মতো ছুটে বেড়ান শিপগুলো উদ্ধার করার। পায়চারি করতে করতে চুল ছিঁড়তে লাগল ফন ব্লামডর্ফ। কার্ল ফ্র্যানটর কেবল বলল, 'এটাই তাদের অস্ত্র,' তারপর আবার ডুবে গেল নীরবতায়।

আফ্রোদোপোলিশ সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইল।

পুরো দু'ঘন্টার চেষ্টায় বেশকিছু শিপ উদ্ধার করা হল, কিন্তু বিশটা শিপের কোনো ব্যবস্থাই করা গেল না। সেগুলোর কিছু কোথাও গিয়ে প্রদক্ষিণ শুরু করল, কিছু ছুটে চলে গেল অজানা মহাশূন্যে, আবার কিছু নেমে এসে বিধ্বস্ত হল শুক্রের মাটিতে।

উদ্ধার করা লেফট উইংয়ের শিপগুলো নামানোর পর যারা গিয়ে সেগুলোতে উঠল, তাদের সবাই পাথরের মতো জমে গেল ভয়াবহ আতঙ্কে। প্রত্যেক শিপে পঁচাত্তরজন করে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে—মানুষ হয়েও যারা এখন স্রেফ মানুষের খোলস।

সংবিৎ ফিরে পেতে তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেল চিৎকার দিয়ে। অন্যেরা মুখ ফিরিয়ে নিল বমন আটকানর জন্যে। একজন অফিসার পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল প্রথম দৃষ্টিতেই, অ্যাটোমো পিস্তল বের করে প্রত্যেক ডিসেরিব্রেটেডের ওপর মারণরশ্মি চালাল সে।

সংবাদটা পেতে যেন পাথর হয়ে গেল অ্যাডমিরাল ফন ব্লামডর্ফ। চোয়াল ঝুলে পড়ল তার, সমস্ত গর্ব উধাও হয়ে গেছে। একটা ডিসেরিব্রেটেডকে তার সামনে আনার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল সে।

কার্ল ফ্র্যানটর তার দিকে তাকাল লাল চোখে, 'তো, অ্যাডমিরাল, এবার প্রমাণ পেয়েছেন ?'

কিন্তু অ্যাডমিরাল কোনো জবাব দিল না। নিঃশব্দে পিস্তল বের করল সে, তারপর কেউ বাধা দেয়ার আগেই গুলি চালাল নিজের মাথায়।

কার্ল ফ্র্যানটর আবার একদিন গিয়ে দাঁড়াল প্রেসিডেন্ট আর তার মন্ত্রীদের সামনে, যাদের সবাই এখন নিস্তেজ আর আতঙ্কিত। কার্ল তার রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, এখন কোন নীতি অনুসরণ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ডেবুক তাকাল তাদের দেখাতে নিয়ে আসা ডিসেরিব্রেটেডের দিকে। 'আমরা শেষ হয়ে গেছি,' বলল সে। 'আমাদের অবশ্যই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। এখন আমরা তাদের করুণার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু একদিন—' তাঁর চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল প্রতিশোধের আগুন।

'না, মিঃ প্রেসিডেন্ট!' ধ্বনিত হল কার্লের তীক্ষ্ণ স্বর। 'ওই একদিন বলে কিছু থাকা চলবে না। শুক্রবাসীদের অতি সাধারণ পাওনা মিটিয়ে দিতেই হবে আমাদের—স্বাধীনতা। যা হবার তা হয়ে গেছে—আমাদের যারা মারা গেছে, তারা প্রায়শ্চিত্ত করেছে অর্ধ শতাব্দীর শুক্র দাসত্বের। আজকের পর থেকে সূচিত হবে এক নতুন দিন, সৌরজগত চালিত হবে নতুন এক রীতিতে।'

মাথা নামিয়ে সামান্য ভেবে আবার মাথা তুলল প্রেসিডেন্ট। 'তুমি ঠিকই বলেছ,' সিদ্ধান্ত দিলেন তিনি, 'প্রতিশোধের কোনো ভাবনা থাকা চলবে না।'

দু'মাস পর শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হল। শুক্রগ্রহ হয়ে গেল স্বাধীন এবং সার্বভৌম। আর চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পরপরই আলোর একটা ঘূর্ণি ছুটে গেল সূর্য বরাবর। সেই অস্ত্র, যা ব্যবহার করার পক্ষে বড় বেশি ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ: খসরু চৌধুরী

আ পারফেক্ট ফিট

আয়ান ব্রাডস্টোন বিষণ্নমনে শহরের ভেতর দিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটছিলেন, একটা বড় দোকানের খোলা দরজার সামনে মানুষের জটলা দেখে থেমে পড়লেন তিনি। প্রথমেই তাড়নাবোধ করলেন ঘুরে পালানর। কিন্তু তিনি তা পারলেন না। কী এক আকর্ষণ তাকে ধীরে ধীরে ভিড়টার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

তাঁর কৌতূহল নিশ্চয় তাঁর মুখে এক বড় প্রশ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল, যে কারণে তাঁকে দেখে কোণার একজন উৎফুল্লভাবে বিষয়টা ব্যাখ্যা করল। 'থ্রি-ডি চেস। এটা একটা হট গেম।'

খেলাটা কীভাবে খেলতে হয় জানেন ব্রাডস্টোন। আধডজন লোক জড় হয়ে ঘুরতে থাকে, সবার চেষ্টা থাকে কম্পিউটারকে টেক্কা দেবার। সম্ভাবনাগুলো নষ্ট করছিল তারা। ছ'জন উডপুশার মিলে বানাল একজন উডপুশার। সে নকশাটার অসহ্য উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাল, তারপর ওটার খুব কাছে আনল চোখ দুটো। এরপর বিরক্তভাবে ফিরে দাঁড়িয়ে চেসবোর্ডের উপরে ঘুঁটি রাখল। আটটা চেসবোর্ড বা দাবার বোর্ড একটার উপর আরেকটা রেখে পেরেক দিয়ে গাঁথা হয়েছে।

দাবার বোর্ডগুলো সাধারণ। ঘুঁটিগুলো প্লাস্টিকের। 'হেই,' বিস্ফোরিত কণ্ঠে চিৎকার দিলেন তিনি।

বোর্ডগুলোর পাশের যুবকটা আত্মরক্ষামূলক ভাবে বলল, 'আর বেশি কাছে আনা যাবে না। আমি নিজের মতো করে সেট করেছি যাতে আমরা ফলো করতে পারি। সাবধান। নাড়া দিয়ে নিচে ফেলবেন না।'

ব্রাডস্টোন বললেন, 'এখন যে অবস্থায় আছে, এই অবস্থায় থাকবে?'

'হ্যাঁ। আমরা খেলোয়াড়রা দশ মিনিট ধরে তর্ক করে ঠিক করেছি।'

অবস্থানটার দিকে উৎসুকভাবে তাকালেন ব্রাডস্টোন। উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যদি ঘুঁটিটাকে সরিয়ে বিটা-বি-৬ থেকে ডেল্টা-ডি-৬-এ নাও, তাহলে তুমি জিতবে।'

বোর্ডটার দিকে গভীরভাবে তাকাল যুবকটা। 'আপনি নিশ্চিত ?'

'অবশ্যই নিশ্চিত। কম্পিউটার কী করে সেটা কোনো বিষয় না, এতে তোমার রাণী রক্ষা পাবে।'

আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল যুবকটা। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'হেই, এখানকার লোকেরা বলছে আপনি দু দিক দিয়েই ঘুঁটিটাকে মারতে যাচ্ছেন।'

ভেতরের গ্রুপ থেকে জমাট দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল ; একটা কণ্ঠ বলল, 'আমি সেটাই ভাবছিলাম।'

অন্য আরেকজন বলল, 'আমিও তাই ভেবেছি। ওরকম খেলতে গেলে রাণী অরক্ষিত হয়ে পড়বে। এরকম আমি আর দেখিনি।' দ্বিতীয় কণ্ঠের মালিক তাঁর দিকে ফিরল। 'আপনি! আপনিই সেই লোক যে এমন বুদ্ধি দিয়েছেন। আপনি খেলবেন ? চালবেন ঘুঁটি ?'

পিছিয়ে গেলেন ব্রাডস্টোন, তাঁর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। 'না-না-আমি খেলতে পারি না।' তিনি ঘুরেই দ্রুত হাঁটা শুরু করলেন।

তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তাঁর ক্ষিধে লাগে।

মাঝে মাঝে তিনি গলির মধ্যে ফলের দোকানগুলোতে যান। বর্তমানে টাকা পয়সার লেনদেন সবই কম্পিউটারের মাধ্যমে হয়। ব্রাডস্টোন যখন সতর্ক থাকেন, একটা আপেল কিংবা একটা কমলা নিয়েই সটকে পড়েন।

এটা একটা ভীতিকর বিষয়। যে কোনো সময় তাঁর ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ধরা পড়েন, তাকে জিনিসের মূল্য দিতে হবে। তাঁর টাকা আছে—প্রচুর পরিমাণে আছে—কিন্তু কীভাবে তিনি মূল্য পরিশোধ করবেন ?

যদিও প্রত্যেকদিন ডজন খানেক উপলক্ষে তাঁকে অর্থ প্রদান করতে ক্রেডিট স্থানান্তর করতে হয়। এটা তাঁর কাছে সীমাহীন অপমানকর মনে হয়।

নিজেকে রেস্টুরেন্টের বাইরে আবিষ্কার করলেন তিনি। ভেসে আসা খাবারের ঘ্রাণ তাকে আবার ক্ষিধের কথা মনে করিয়ে দিল। সতর্কতার সাথে

জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন। বেশ কিছু লোক খাচ্ছে। অনেক লোক। একজন বা দু'জনের জন্যে পরিবেশটা মানানসই নয়। তিনি তাঁদের মাঝখানে গিয়ে খেতে পারবেন না।

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল, আর তখুনি দেখতে পেলেন জানালা দিয়ে একমাত্র তিনিই উঁকি মারেননি। একটা ছেলেও একই কাজ করছে। বয়স প্রায় দশ বছর হবে, তবে তাকে ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে না।

ব্রাডস্টোন গলার স্বরটাকে মোলায়েম করে ডাক দিলেন, 'এই যে, বালক। ক্ষিধে পেয়েছে?'

কিশোর ছেলেটা সন্দেহের চোখে তাঁর দিকে তাকাল, সরে গেল কোণার দিকে। 'না!'

কাছে আসার চেষ্টা করলেন না ব্রাডস্টোন। যদি আসেন, নিঃসন্দেহে ছেলেটা দৌড় দেবে। তিনি বললেন, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি নিজের জন্যে কিছু অর্ডার দেবার মতো যথেষ্ট বড় হয়েছ। একটা হ্যামবার্গার কিংবা যে কোনো কিছুর অর্ডার তুমি দিতে পার, আমি নিশ্চিত।'

সন্দেহের জায়গা দখল করে নিল গর্ব। ছেলেটা বলল, 'নিশ্চিত! যে কোনো সময়!'

'কিন্তু তোমার নিজের কোনো কার্ড নেই, ঠিক? আর তাই তুমি সম্পূর্ণ অর্ডার দিতে পারছ না। ঠিক?'

ছেলেটা বাদামি চোখে তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। ব্রাডস্টোন বললেন, 'কী বলবে বল। আমার কার্ড আছে। অর্ডার দেবার জন্যে তুমি এটা ব্যবহার করতে পার। হ্যামবার্গার বা তোমার যা ইচ্ছে তাই নিতে পার। তোমার কী চাই বল। তুমি আমার জন্যেও কিছু নিতে পার। চমৎকার টি-বোন স্টিক, সেদ্ধ আলু, কিছু স্কোয়াশ আর কিছু কফি। আর দু'টুকরো আপেলের পিঠা। তুমি একটা নেবে।'

'আমি বাড়ি নিয়ে তারপর খাব,' বলল ছেলেটা।

'তাহলে এস! তুমি তোমার বাবার কিছু টাকা বাঁচাও। তুমি এখানে সেটা তারা জানে, আমি নিশ্চিত।'

'আমরা অনেক সময় এখানে খেতে আসি।'

'যখন আস তখন খাও। এখানে আবার খাও। শুধু এখন তুমি কার্ডটা

হ্যান্ডেল করতে পারবে। নিজে পছন্দ করতে পারবে—বড়দের মতো। চল প্রথমে তুমি এগোও।'

ব্রাডস্টোনের পেটে শিরশির অনুভূতি বোধ হল। ছেলেটাকে দিয়ে তিনি একটা কাজ করাচ্ছেন, বাচ্চাদের জন্যে এটা দোষের হবে না। তবে কেউ যদি, এ দিকে লক্ষ্য করতে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা বিশ্রি হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ ভুল বুঝবে সে।

যদি সেরকম সম্ভাবনা থাকে, ব্রাডস্টোন ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু প্রত্যেকে তাঁর দিকে তাকাবে অবজ্ঞার চোখে, তিনি নিজের জন্যে একটা ছোট্ট ছেলেকে কিছু আনতে প্ররোচিত করেছেন, অথচ নিজে তা পারেননি।

কিশোর ছেলেটা ইতস্তত করল, তারপর ঢুকল রেস্টুরেন্টে। সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করলেন ব্রাডস্টোন। একটা টেবিলে বসল ছেলেটা, ব্রাডস্টোন তার বিপরীত দিকে বসলেন।

হাসলেন ব্রাডস্টোন, কার্ডটা ছেলেটার হাতে দিলেন। বিরক্তিকরভাবে কার্ডটা হাতের মধ্যে ঝনঝন করে উঠল। কার্ডটা শক্ত, ঝকমকে ধাতুর তৈরি যে সেদিকে তাকিয়ে তার চোখের পেশিগুলো গোল হয়ে উঠল। সে তাকিয়ে রইল কার্ডটার দিকে।

'যাও, খোকা। পছন্দমতো খাবার আন,' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'তোমার যা মন চায় নিয়ে এস।'

ছেলেটা মিথ্যে বলেনি। কন্ট্রোলের উপরে আঙুলগুলো নেড়ে ছোট কম্পিউটারটা নিখুঁতভাবে হ্যান্ডেল করতে লাগল সে।

'আপনার জন্যে স্টিক, জনাব। সেদ্ধ আলু। স্কোয়াশ। আপেলের পিঠা। কফি—আপনি কি সালাদ খেতে চান, জনাব?' তার কণ্ঠটা ধীরে ধীরে চড়তে লাগল। 'আমার মা সব সময় সালাদের অর্ডার দেন, তবে আমি ওটা পছন্দ করি না।'

'আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। মিক্সড গ্রিন সালাদ। ওরা কি এটা দেয়? ভিনেইগ্রেট ড্রেসিং। ওরা দেয় ওটা? তুমি ওটা হ্যান্ডেল করতে পারবে?'

'ভিন—কী যেন বললেন—আপনার দেখার দরকার নেই—সম্ভবত এটাই।'

শেষে ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং-এর কথা বললেন ব্রাডস্টোন। তবে ইতোমধ্যে যথেষ্ট হয়েছে।

ছেলেটা এমন সহজে ও দক্ষতার সাথে কার্ডটা ঢোকাল যে ব্রাডস্টোনের মনে ঘৃণা উথলে উঠল, তা সত্ত্বেও লাফাতে লাগল তাঁর পাকস্থলী।

কার্ডটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিল ছেলেটা। 'আমার মনে হয় আপনার অনেক টাকা আছে,' গুরুত্বের সাথে বলল সে।

ব্রাডস্টোন বললেন, 'তুমি কি অঙ্কটা দেখেছ?'

'আরে না। আপনি বাবার মতো এভাবে তাকাবেন না, আমি বলতে চাইছি, এত খাবার আনার পরও কার্ড বাতিল হয়নি।'

হতাশায় ভেঙে পড়ার মতো অনুভূতি হল ব্রাডস্টোনের। ছেলেটা টাকার অঙ্কটা পড়েনি, আর তিনি পরিমাণটা জানার জন্যে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারবেন না। শেষ মেষ তাকে কোনো ব্যাংকে যেতে হবে, তাদের ভিন্ন কোনো পথে প্ররোচিত করে চেষ্টা করতে হবে অঙ্কটা জেনে নেবার।

তিনি আলাপ জমানর চেষ্টা করলেন। 'তোমার নাম কী, খোকা?'

'রেগিন্যাল্ড।'

'বাড়িতে এখন কী পড়ছ তুমি, রেগি?'

'অধিকাংশই গণিত। কারণ বাবা বলেছেন গণিত করতে পারলে আমাকে ডাইনোসর দেবেন, যেহেতু আমি ডাইনোসর চাই। যদি আমি গণিতে লেগে থাকি তাহলে আমি ডাইনোসর পাব। আমি আমার কম্পিউটারে ডাইনোসরের চলাচলের গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম করেছি। আপনি কি জানেন ব্রোনটোসোরাস কীভাবে ভূমিতে হাঁটে? ওরা ওদের ঘাড়ে ভারসাম্য বজায় রাখে, আর তাই ভারের কেন্দ্র থাকে নিতম্বে। ওরা পানিতে নামার আগ পর্যন্ত মাথাটাকে জিরাফের মতো সোজা রাখে। তাহলে—এখানে আমার হ্যামবার্গার আছে। আর আপনার খাবারগুলোও আছে।'

সব কিছুই চলে এসেছে মুভিং বেল্টে করে, ঠিক জায়গা মতো এসে থেমেছে।

ব্রাডস্টোন সতৃষ্ণভাবে তাকালেন খাবারগুলোর দিকে, ভাবলেন কম্পিউটারের কাজ কারবার।

রেগিন্যাল্ড সম্পূর্ণ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'আমি কাউন্টারে হ্যামবার্গার খাব।'

নড়ে উঠলেন ব্রাডস্টোন। 'আশা করি এটা চমৎকার হ্যামবার্গার, রেগি।' তার কাছ থেকে বেশি আর চাওয়ার নেই ব্রাডস্টোনের, তাকে খেতে দিলেন তিনি। কেউ একজন কিচেন থেকে এল, নিঃসন্দেহ যে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ টেকনেশিয়ান। রেগিন্যান্ডের সাথে বন্ধু সুলভ আলাপ শুরু করেছে। এটা স্বস্তির ব্যাপার।

এই পোশা নিয়ে প্রশ্নের কিছু নেই। আপনি যখন একজন কম্পিউটার টেকনেশিয়ানের সাথে কথা বলবেন সে এমন ভাব দেখাবে যেন বিশ্বটা তার কাঁধের উপর অবস্থান করছে। তবে ব্রাডস্টোন তাঁর খাবারের দিকেই মন দিলেন—এই প্রথম সম্পূর্ণ খাবারটা তিনি একটা মাসে স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করলেন।

খাবার সম্পূর্ণ শেষ করার পরে চারদিকে আবার তাকালেন তিনি। অনেক্ষণ হল গিয়েছে ছেলেটা। ব্রাডস্টোন বিষণ্ন মনে ভাবলেন, ছেলেটার এতটুকু দয়া নেই, সৌজন্যবোধ নেই, সহানুভূতি নেই। অবশ্য সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানর মতো যথেষ্ট বড় সে নয়, সে তার সমস্ত বয়ঃসন্ধিকাল ব্যস্ত রাখছে কম্পিউটার নাড়াচাড়া করে।

বয়ঃসন্ধি!

জায়গাটিতে এখন খুব বেশি ভিড় নেই। কম্পিউটার টেকনেশিয়ান এখন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত কম্পিউটারের খুঁটি নাটি পর্যবেক্ষণ করছে।

ক্ষনিকের জন্যে প্রবল যন্ত্রনার সাথে ব্রাডস্টোন ভাবলেন, টেকনোলজিস্টদের পেশা কার্যত বিশ্বব্যাপি। সব সময় তারা প্রোগ্রাম বানাচ্ছে, রি প্রোগ্রাম করছে, অ্যাডজাস্ট করছে, ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষ নিরীক্ষা করছে যা বিশ্বের প্রত্যেকটা মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে—প্রায় প্রত্যেকের।

এ সব ভাবনায় ব্রাডস্টোনের মনের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা জেগে উঠল। কম্পিউটার টেকনেশিয়ানের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। বললেন, 'পল, আমার ধারণা এই শহরে আইনজীবী আছে?'

'আপনার ধারণা ঠিক।'

'তুমি ভালো একজনের পরামর্শ আমাকে দিতে পার না। পার কি?'

নরম সুরে কম্পিউটার টেকনেশিয়ান বলল, 'পোস্ট অফিসে গিয়ে আপনি টাউন ডাইরেকটরির খোঁজ করতে পারেন। ওখানে আপনি কেবল আইনজীবীর জায়গায় টোকা মারবেন।'

'আমি ভালো একজন চাই। চালাক চতুর।' হাসলেন তিনি, আশা করলেন লোকটাও তাঁর কথায় হাসবে। কিন্তু হাসল না লোকটা। কম্পিউটার টেকনেশিয়ান বলল, 'ওখানে সব কিছুরই বর্ণনা দেয়া আছে। আপনার প্রয়োজনের কথা জানাবেন আর তখন আপনি বয়স, ঠিকানা, কেসলোড, ফি-এর পরিমাণ সব কিছুই জানতে পারবেন। আপনি যে ধরনের চান না কেন পাবেন, যদি আপনি ঠিকমত চাবি ঘোরাতে পারেন। ওটা এভাবেই কাজ করে। গত সপ্তাহে আমি পরীক্ষা করেছি।'

'আমি ও রকম কিছু বোঝাতে চাইনি, বুদ্ধু। আমি তোমার ব্যক্তিগত সুপারিশ চেয়েছি। তুমি জান?'

মাথা নাড়ল কম্পিউটার টেকনেশিয়ান। 'আমি ডাইরেকটরি নই।'

ব্রাডস্টোন বললেন, 'জাহান্নামে যাও। তোমার সমস্যাটা কী? একজন আইনজীবীর নাম বল। যে কোনো আইনজীবী। এমন কোনো আইন জানা কি আছে যা কম্পিউটার ছাড়াই প্রয়োগ করা যায়?'

'ডাইরেকটরি ব্যবহার করলে সেটা জানতে পারবেন। আপনি আপনার কার্ড দিয়েইতো সেটা করতে পারেন। সমস্যা কোথায়? আপনি কি জানেন না কার্ড কীভাবে ব্যবহার করতে হয়? কিংবা আপনি—' তার চোখ দুটো কী ভেবে হঠাৎ বড় বড় হয়ে উঠল। 'হায়—সন অব এ—সে কারণেই আপনি রেগিকে পাঠিয়েছেন আপনার খাবারের অর্ডার দিতে! শুনুন আমি জানতাম না—'

ব্রাডস্টোন কুঁচকে গেলেন। তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন, আর এটা করতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন কাছে দাঁড়ান বিশালদেহী লাল মুখ ও টেকো মাথার এক লোকের সাথে।

বিশালদেহী লোকটা নরম গলায় বলল, 'এক মিনিট। আপনিই কি কিছুক্ষণ আগে আমার ছেলেকে হ্যামবার্গার কিনে দিয়েছেন?'

ইতস্তত করলেন ব্রাডস্টোন, তারপর মাথা নাড়ালেন শুকনো মুখে।

'আমি এর দামটা আপনাকে দিতে চাই। সব ঠিক আছে। আমি জানি আপনি কে, আর আমি আপনার কার্ড হ্যান্ডেল করব।'

কম্পিউটার টেকনেশিয়ান কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ল। 'যদি আপনি একজন আইনজীবী চান, মিস্টার গোল্ড হলেন একজন আইনজীবী।'

আগ্রহ দেখা গেল ব্রাডস্টোনের চোখে।

গোল্ড বলল, 'আমি একজন আইনজীবী, যদি আপনি একজন আইনজীবীই খোঁজেন। কথা হল, আমি আপনাকে কীভাবে চিনি। আমি আপনার ব্যাপারগুলো গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করেছি। আর যখন রেগি এসে খাবার খাওয়ার গল্প করল, কম্পিউটার ব্যবহার করার কথা বলল, তার বর্ণনা শুনে মনে হল লোকটা আপনিই হবেন। আর এখন দেখছি আমার ধারণা ঠিকই।'

ব্রাডস্টোন বললেন, 'আমরা কি নিরিবিলি কথা বলতে পারি?'

'আমার বাসা এখান থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ।'

লিভিং রুমটা বিলাসবহুল নয়, তবে আরামদায়ক। ব্রাডস্টোন বললেন, 'আপনার কি একজন রিটেইনার দরকার? আমি খরচ দিতে পারব।'

'আমি জানি আপনার অনেক টাকা আছে,' বলল গোল্ড। 'প্রথমে আমাকে বলুন, আপনার সমস্যাটা কী।'

ব্রাডস্টোন চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বলতে শুরু করলেন ধরা গলায়। 'আপনি যদি আমার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার বিষয়টা নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তিযোগ্য। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে প্রথমে এ ধরনের স্বাক্ষ্য দিচ্ছি। সম্মোহন ও সরাসরি স্নায়ু-ব্যবস্থার মিশ্রণ সম্প্রতি একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাস্তির ধরণটা যেটা আমি সাক্ষ্যে বলেছি, বুঝতে পারছি না। এটা তুলে নেয়া উচিত।'

গোল্ড বলল, 'আপনি অনেক নিয়মের মধ্য দিয়ে গেছেন, আর আপনি যে দোষী তার কোনো উপযুক্ত কারণ নেই—'

'তাহলে দেখুন। আমরা কম্পিউটার আবৃত একটা বিশ্বে বাস করছি। আমি কোথাও একটা কাজ করতে পারি না—আমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারি না—আমি খেতে পারি না—আমি আনন্দ উপভোগ করতে পারি না—আমি কোনো কিছুর জন্যে দাম পরিশোধ করতে পারি না, কিংবা কোনো কিছু চেক

করতে পারি না—যা কিছুই করি, কম্পিউটার ব্যবহার ছাড়াই করি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি এতে মানিয়ে নিয়েছি, আর তাই আমার চোখ দুটোকে আঘাত না করেতো আমি কম্পিউটারের দিকে তাকাতে অক্ষম বা আমার আঙুলগুলোতে ফোস্কা না তুলে আমি কম্পিউটারকে ছুঁতে অক্ষম। এমনকি আমি আমার ক্যাশকার্ড হ্যান্ডেল করতে পারি না, কিংবা আমি এটার ব্যবহারের কথা চিন্তাও করতে পারি না। এসব করতে গেলেই আমার বমি বমি ভাব আসে।'

গোল্ড বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেসব জানি। আমি এও জানি যে আপনার শাস্তির মেয়াদের জন্যে আপনাকে প্রচুর টাকা দিতে হবে। সাধারণ জনগণ আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এবং উপকারী হবে। আমার বিশ্বাস তারা তা করবে।'

'আমি তা চাই না। আমি তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই না। আমি বড়দের বিশ্বে অসহায় শিশু হিসেবে থাকতে চাই না। আমি চাই না শিক্ষিতদের জগতে অশিক্ষিত হয়ে থাকতে। আমার শাস্তির সমাপ্তি টানতে সাহায্য করুন। এক মাস নরক বাসই যথেষ্ট। আরো এগার মাস আমি নরকে বাস করতে পারব না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল গোল্ড। 'বেশ, আমার তত্ত্বাবধানে আপনি থাকবেন, এতে আমি আপনার বৈধ প্রতিনিধি হব। পরে যেটুকু পারি আপনার জন্যে করার চেষ্টা করব। আপনাকে বলে রাখা ভালো, এতে বিরাট সাফল্য নাও হতে পারে।'

'কেন ? আমার সব কিছুকে পাঁচ হাজার ডলারে রূপান্তর করেছি।'

'রূপান্তর করার পরিকল্পনাতো দূরের ব্যাপার। ওটা করার আগেই আপনি ধরা পড়েছিলেন। এটা ছিল বুদ্ধিমান কম্পিউটারের চাতুরি। দাবা খেলায় আপনার দক্ষতার দাম আছে, কিন্তু সেটা এখন অপরাধ। সব কিছুই কম্পিউটার নির্ভর এমনকি বর্তমানে কম্পিউটার ছাড়া আপনি এক পাও ফেলতে পারবেন না। কম্পিউটার যতই প্রতারণা করুক না কেন এটা সভ্যতার অপরিহার্য কাঠাম, সেটা ভাঙা ভয়ংকর অপরাধ এবং এটাকে নিরুৎসহীত করা উচিত।'

'উপদেশ দেবেন না।'

'উপদেশ দিচ্ছি না। আমি ব্যাখ্যা করছি। আপনি সিস্টেম ভাঙার চেষ্টা

করেছেন এবং সেজন্যে আপনাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। ভুল বোঝার অবকাশ নেই। একা হয়ে পড়েছেন আপনি। যদি আপনি দেখেন যে আপনার জীবনটা দুঃসহ, এবং যার কারণে আপনি ক্লান্ত, কোনো রকমে প্রত্যেকের কাছে সেটা দমন করুন।'

'কিন্তু একবছর অনেক বেশি সময়।'

'অন্য কারো উপর যেন একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে না পারে সেটাকে শক্ত বাঁধা দেবে। আমি চেষ্টা করব কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি আইন কী বলবে।'

'কী?'

'বলতে চাইছি আপরাধকে প্রতিজ্ঞা করতে যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে আপনারটাই উপযুক্ত।'

অনুবাদ: মিজানুর রহমান কল্লোল

ব্যাটল হাইম্

তখন আর আশা করার মতো কিছু বাকি নেই। সিবেলিয়াস হপকিন্স সোজা-সাপ্টা জানাল।

'আমাদেরকে মঙ্গলের সম্মতি পেতেই হবে, আর এখনো আমরা সেটা পাইনি, মোদ্দা কথা এটাই।'

বিষণ্ণতা এমনভাবে ছেয়ে ফেলল যে সবারই যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

'মঙ্গলবাসীদের স্বায়ত্বশাসন দেয়া আমাদের উচিৎ হয়নি।' রালফ কলোডী বলল।

'মানলাম', হপকিন্স বলে। 'কিন্তু কে আর যাচ্ছে আঠাশ বছর আগে গিয়ে ইতিহাস বদলে আসতে। নিজেদের রাজ্য কেমন করে চালাবে তার সর্বময় ক্ষমতা এখন মঙ্গলের হাতে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।'

'আমরা তাহলে অন্য একটা জায়গা খুঁজে বের করব।' বলল বেন ডিভারস। এই দলের মধ্যে সেই কনিষ্ঠ, বেন এখনো নিজের কোনো রকম ভালো-মন্দ চিন্তা না করেও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'অন্য কোনো জায়গার চিন্তা বাদ দাও,' নির্লিপ্তভাবে হপকিন্স বলে। 'হাইপার স্পেস নিয়ে পরীক্ষা করার ভয়াবহতা যদি তোমরা না জেনে থাক তাহলে স্কুলে ফিরে যাও। তোমরা পৃথিবীতে এটা করতে পারবে না, সেরকম অবস্থায় আসতে চাঁদেরও দেরি আছে। অমন কিছু করার জন্য মহাশূন্য উপনিবেশগুলো এতই ছোট যে সেগুলো মঙ্গলের তুলনায় অন্তত তিন ধাপ পিছনে রয়েছে। আর আগামী বিশ বছরের মধ্যে অন্তত মঙ্গলকে ছাড়িয়ে অন্য কোথাও পৌঁছানও সম্ভব না। কিন্তু মঙ্গল সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। এটা

এখনো আসলে খালি। এখানকার মধ্যাকর্ষণ যেমন কম আবার বায়ুমণ্ডলও পাতলা। ঠাণ্ডাও আছে, সবকিছুই হাইপারস্পেসিয়াল ফ্লাইট-এর জন্য অনুকূল ছিল শুধু উপনিবেশবাসীরা ছাড়া।'

'এটা তুমি হলফ করে বলতে পার না,' তরুণ ডিভারস বলে। 'মানুষ খুবই অদ্ভুত। আমরা যদি ঠিক মতো খেলতে পারি তাহলে এরাই দেখবে খোদ মঙ্গলেই হাইপারস্পেসিয়াল পরীক্ষার জন্য মত দিচ্ছে।'

'ঠিকভাবে খেলব কিভাবে?' হপকিন্স বলল। 'বিপক্ষ দল তো সবসময় কি এক গেঁয়ো সুর দিয়ে পুরো মঙ্গল ছেয়ে রেখেছে, কি যেন তার শব্দগুলো:

না না না হাজার বার না!
তুমি আমার সোহাগ কিনতে পারবে না!
না না না হাজার বার না!
মরে গেলেও আমি তবু হ্যাঁ বলব না।'

সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, 'মঙ্গল ছেয়ে আছে এই সুরে। এটা মঙ্গলবাসীদের মাথা ফুটো করে ঢুকে গেছে। তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে "না"-তে ভোট দেবে এবং তার অর্থ আমরা হাইপারস্পেসিয়াল পরীক্ষা করতে পারব না। আর তার মানে আমরা আগামী দশ বছরেও নক্ষত্র মণ্ডলীর দিকে যাত্রা করতে পারব না, হয়তো আমাদের এ প্রজন্মে না-আমাদের জীবদ্দশায়তো হবেই না।'

ডিভারস ভ্রু কুঁচকিয়ে চিন্তা করতে করতে বলল, 'আচ্ছা আমরা আমাদের মতো যুক্তিপূর্ণ একটা সুর ব্যবহার করতে পারি না?'

'কী সুর?'

'মঙ্গলের বেশিরভাগ বাসিন্দা ফরাসি বংশদ্ভুত। আমরা তাদের জাতীয় চেতনা নিয়ে কাজ করতে পারি।'

'কেমন জাতীয় চেতনা? সবাই এখানেতো ইংলিশ বলে।'

'সেটা কখনোই জাতীয় চেতনাকে রুখতে পারবে না,' ডিভারস বলল। যদি তুমি ফ্রান্সের পুরনো জাতীয় সঙ্গিত বাজাও, সেটা তাদের স্মৃতির পুকুরে ঢেউ তুলতে থাকবে। তুমি জান এটা হল একটা রণ-স্তুতি। আর রণ-স্তুতি

সব সময় রক্তে ঝড় তোলে, বিশেষ করে এখন যখন কোথাও কোনো যুদ্ধ নেই।'

হপকিন্স বলল, 'কিন্তু শব্দগুলোর কোনো মানে বোঝা যায় না। তোমার কি সেগুলো মনে আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ডিভারস। 'কিছু কিছু—

'আলন্স, ইনফ্যান্টস ডে লা প্যাটরী,
'লা জোর ডে গ্লোইর ইস্ট অ্যারাইভ
'কন্টার নুস ডে লা ট্র্যউনি
'ল'টেনডারড স্যাংলেন্ট ইস্ট লীভ।'

সে প্রচলিত সুরে গেয়ে শোনাল।

হপকিন্স বলল, 'হাজারে একজন মঙ্গলবাসীও এটার মানে জানে না।'

ডিভারস বলল, 'তাতে কী? শুধু বাজালেই হল। এমন কি তারা যদি শব্দগুলো নাও বোঝে তারা জানে যে এটা ফ্রান্সের রণ-স্তুতি, আর এটা তাদের রক্তে আলোড়ন তোলে। পাশাপাশি এটা একটা জয়-গান। নিরতিশয় এটা ওই ফালতু "না, না" এর চেয়ে ভালো। আমি তোমাদের বলছি শোনো এই রণ-স্তুতি তাদের মন থেকে ঝেঁটিয়ে ওই না না বের করে দেবে।'

'হয়তো এতে তুমি কিছু পাবে,' বলল হপকিন্স। 'এবং আমরা যদি এর সাথে কিছু জোরাল শ্লোগান জুড়ে দিতে পারি যেমন "নক্ষত্র মণ্ডলীর পথে মানবতা!", "চলো যাই নক্ষত্রের পানে।", "আমাদের সবচেয়ে নিম্ন গতি হোক আলোর গতি।" আর সব সময় সেই সুরে।'

কলোডী বলল, 'তুমি জান "লা জোর ডে গ্লোইর" মানে আমার মনে হয় "গৌরবময় দিন"। আমরা এরকম একটা ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি "নক্ষত্রে পৌছানর দিনটি হবে গৌরবময়।" আমরা যদি "গৌরবময় দিন" -এর উপর জোর দেই তাহলে মঙ্গলবাসীরা হয়তো "হ্যাঁ"তে ভোট দেবে।'

'সত্যি সত্যি ব্যাপারটা যদি ঘটে তাহলে ভালো,' বিষণ্ণভাবে হপকিন্স বলল, 'কিন্তু এই মুহূর্তে এ ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। চেষ্টা করে দেখা যাক যদি কিছু হয়।'

এর পরই শুরু হল সেই যুদ্ধের সুরের বিশাল ভোটা-ভুটি। মঙ্গলের উপনিবেশের প্রত্যেকটা ডোমে, অলিম্পাস থেকে সমস্ত ম্যারিনার্স ভ্যালী এবং সুদূর আগ্নেয়গিরীর জ্বালামুখ পর্যন্ত দুটো সুর বাজতে লাগল। একটা হল "না, না, হাজার বার না—" আর অন্য দিকে "আলন্স, ইনফ্যান্টস ডে লা প্যাটরী—"

রণ-স্তুতির সেই আলোড়িত সুর যে কাজ করছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিপরীত গানের সুর ঝড়ো গতিতে উল্টো দিকে কাজ করছিল। হপকিন্স আশ্বস্ত হল "হ্যাঁ" ভোটের সম্ভাবনা বাড়ছে এই ভেবে। নিশ্চিত পরাজয় থেকে একটু আশার আলো দেখা আর কি।

হপকিন্স বলল, 'ভেবে দেখ আমাদের কিছুই সরাসরি না। তাদের খুবই মোটা দাগের "না-না!-না! আমাদের হল অন্তরে অনুভব করার ব্যাপার, কিন্তু দিয়ে? লা জোর ডে গ্লোইর?"'

ডিভারস মুচকি হাসল, 'ভোটের জন্য অপেক্ষা করি না কেন?' হাজার হলেও এটা যেহেতু তারই পরিকল্পনা।

তারা তাই করল।

পাঠকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ভোটের দিন কী ঘটল? তারা কি না ভোট দিল, না হ্যাঁ ভোট দিল?

ভোটের দিন সন্ধ্যে বেলা হপকিন্স দেখল সে কথা বলতে পারছে না। হ্যাঁ-এর পক্ষে ভোট পড়েছে নব্বই ভাগ আর এ নিয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

মঙ্গলের অধিবাসীরা তাদের গ্রহে সেই কাজের অনুমতি দিয়েছে যা মানুষ জাতিকে নক্ষত্রমণ্ডলীতে পৌঁছে দেবে।

অবশেষে হপকিন্স বলল 'হল কী? আমরা ঠিক কী করলাম?'

'সেটা হল সুর,' সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল ডিভারস। 'আমি এটা ঠিকই ধরেছিলাম, কিন্তু আমি আমার চিন্তা-ভাবনা ব্যাখ্যা করতে চাই না। কারণ আমি চাই না এ বিষয়ে অপর পক্ষ কিছু জানুক। এমন না যে এখানকার কাউকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি চাই না কোনো সুচতুর উপায়ে এই সুরটা নিরপেক্ষ হয়ে যাক।'

'এই সুরের মধ্যে এমন কী ছিল যা এত পার্থক্য তৈরি করল ?' হপকিন্স জানতে চাইল।

'এটা ছিল একটা অবচেতন বার্তা। হয়তো শব্দগুলো বোঝার মতো ফ্রেঞ্চ এখানকার উপনিবেশবাসীরা জানে না, কিন্তু তাদের রণ-স্তুতির নাম জানা ছিল। প্রতিবার এই সুর শোনার সাথে সাথে তাদের মাথার ভিতরে গিয়ে এটা বাজতে থাকে, আর প্রতিবারই তারা এটা গুন গুন করেছে।'

'তাতে কী হল ?'

'এটাই হল,' দাঁত বের করে হাসল ডিভারস, 'অর্থাৎ মঙ্গলবাসীরা হ্যাঁ বলেছে!'

অনুবাদ: সাজ্জাদ কবীর

ডেথ অব এ ফয়

একজন ফয়ের পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করাটা ছিল চূড়ান্ত রকমের অস্বাভাবিক একটা ঘটনা। তাদের গ্রহে (যার নাম পৃথিবীবাসীদের কণ্ঠে উচ্চারণ করতে গেলে শোনায় অনেকটা সোরটিবাকেস্ট্রিটে-র মতো) তারাই শ্রেষ্ঠ প্রাণী। এবং আপাত বিবেচনায় তারা অমরও বটে।

প্রত্যেক ফয়ই অবশ্য পালাক্রমে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বেছে নেয়, এবং আমাদের এই ফয়টি মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল ব্যর্থ প্রেমের কারণে, অবশ্য যদি আপনারা সেটাকে প্রেম বলতে আপত্তি না করেন, যেখানে পাঁচ জন ফয় বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রথমে এক বছর ধরে মানসিক নৈকট্য উপভোগ করে থাকে। দৃশ্যত সে আসলে কয়েক মাস চেষ্টা করেও এই নৈকট্য উপভোগের ব্যাপারটাতে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেনি এবং সে দুঃখেই তার হৃদয়টা কিম্বা বলা যায় হৃদয়গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, যেহেতু তাদের হৃৎপিণ্ড আছে মোট পাঁচটা।

প্রত্যেক ফয়েরই রয়েছে পাঁচটা বড় বড় হৃৎপিণ্ড, আর একটা প্রচলিত ধারণা হল যে সেই কারণেই নাকি তারা আপাত বিচারে অমর প্রায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত সার্জন মাউডি ব্রিসকোয়ি ঐ হৃৎপিণ্ডগুলো পেতে খুব আগ্রহী। তার প্রধান সহকারী ডাওয়ানেকে তিনি বলেন, 'এটা কেবল তাদের আকার আর সংখ্যার জন্যই হতে পারে না, এর মাঝে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো শারীরবৃত্তীয় বা জৈব রাসায়নিক ব্যাপার আছে। আমাকে অবশ্যই ওগুলো পেতে হবে।'

'আমি জানি না যে আমরা ওগুলো পাব কিনা,' বলে ডাওয়ানে জনসন।

'আমি তার সাথে খুব আন্তরিকভাবেই কথা বলেছি, মৃত্যুর পরে অঙ্গচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে ফয়দের যে ধর্মীয় বিধি নিষেধগুলো আছে সেগুলো

কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়েছি। ঘর থেকে অনেক দূরে কোনো ফয়ের মৃত্যু যে কত বেদনাদায়ক সেটাও বিবেচনা করতে হয়েছে। আর মাউডি, আমাকে তার সাথে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে।'

'মিথ্যে ?'

'আমি তাকে বলেছি যে মৃত্যুর পর পৃথিবীর বিখ্যাত গীর্জা গায়ক দল হ্যারল্ড জে গ্যাসেনবাউমের পরিচালনায় তার জন্য অন্ত্যেষ্টিকালীন শোকস্তব গাইবে। আমি তাকে বলেছি যে পৃথিবীতে বিশ্বাস করা হয় যে এর ফলে তার আত্মা তৎক্ষণাৎ মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে ফিরে যাবে তার গ্রহ সোরটিব...কি যেন ছাতার নামটা। তবে শর্ত হল যে তাকে তোমার মানে কিনা মাউডির নামে একটা ছাড়পত্রে সই করে যেতে হবে যাতে তুমি তার হৃৎপিণ্ডগুলো নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে পার।'

'সে ঐ সব ঘোড়ার ডিম বিশ্বাস করেছে এটা তুমি বলতে চাও ?' বলল মাউডি।

'আরে! তুমি তো জানই আজকাল বুদ্ধিমান প্রাণীদের মিথ এবং বিশ্বাসের প্রতি সবার বেশ ভক্তি ভাবের কেমন একটা চল উঠেছে। কাজেই আমাকে বিশ্বাস না করাটা তার পক্ষে তেমন শোভন হত না। তাছাড়া প্রত্যেক ফয়েরই পার্থিব বিজ্ঞানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রয়েছে, আর আমার মনে হয়েছে আমরা যে তার হৃৎপিণ্ডটা চেয়েছি তাতে এই ফয়টা বেশ যেন কৃতার্থই হয়েছে। সে কথা দিয়েছে যে আমার পরামর্শটা বিবেচনা করে দেখবে। আর আমি আশা করি যে সে একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবে কেন না সে বড়জোর আর একটা দিন বাঁচবে এবং এর মধ্যেই আমাদেরকে তার কাছ থেকে আন্তঃনাক্ষত্রিক আইন অনুযায়ী অনুমতি আদায় করে নিতে হবে, এবং হৃৎপিণ্ডগুলোও পেতে হবে তাজা অবস্থায় আর...আহ্ ঐ বুঝি তার সঙ্কেত এল।'

ডাওয়ানে জনসন নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে যায়।

'হ্যাঁ ?' সে ফিশ ফিশ করে জিজ্ঞেস করে। এর মধ্যেই সে হলোগ্রাফিক রেকর্ডারটাও চালু করে দিয়েছে, বলা যায় না যদি ফয়টা অনুমতি দিয়ে ফেলে।

ফয়ের বিশাল, গ্রন্থিল গাছের মতো শরীরটা বিছানায় পড়ে ছিল নিথর হয়ে। তার ফুলে ওঠা চোখগুলো বেরিয়ে আসার সময় পিটপিট করে ওঠে

(পাঁচটার প্রতিটাই), প্রত্যেকটা চোখ একটা করে ছোট্ট শুঁড়ের মাথায় বসান, সবগুলো ডাওয়ানের দিকে ঘুরে যায়। ফয়ের কণ্ঠস্বরটা বড় অদ্ভুত, আর তার ঠোঁট বিহীন গোল মুখটা একটুও নড়ে না, কিন্তু কথার প্রতিটা শব্দ শোনা যায় একদম পরিষ্কার ভাবে। তার চোখে স্বাভাবিকভাবেই একটা ফয় সুলভ ভাব ফুটে উঠেছিল, এবং সে বলল, 'ডাওয়ানে মাউডিকে বল আমার হৃদয়টা আমি তার জন্যই রেখে গেলাম। আমাকে ব্যবচ্ছেদ করো হ্যারল্ডের গায়ক দলের জন্য। আর সোরটিবাকেনস্ট্রিটের সকল ফয়কে জানিয়ে দাও যে শীঘ্রি আমি ওখানে পৌঁছে যাব—'

অনুবাদ: আসরার মাসুদ

হোয়াট ইফ

নরম্যান এবং লিভি ট্রেনে উঠতে দেরী করে ফেলল। কোনো মতে একটি সিট পেল ওরা। সামনের বগিতে সিটটা। ওতেই উঠে পড়ল ওরা।

নিউইয়র্ক যাচ্ছে নরম্যান এবং লিভি। আশা করছে কেউ ওদের বিরক্ত করতে আসবে না। দু'জনে গল্প করে দিব্যি কাটিয়ে দেয়া যাবে সময়।

লিভিকে বিয়ে করে সুখি নরম্যান। সে প্রায়ই বলে, 'আমরা পরস্পরের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছি, লিভি।'

লিভি শুনে হাসে। বলে, 'সে দিন স্ট্রিটকারে যদি তুমি না থাকতে তা হলে তোমার সঙ্গে পরিচয়ই হত না। তাহলে কি করতে?'

'ব্যাচেলর থাকতাম। আর কি করতাম? কিংবা এখনো হতে পারত জর্জেট অন্য কোনোদিন তোমার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিত।'

'এমন ঘটনা নাও ঘটতে পারত।'

'ঘটতে পারত।'

'না। ঘটত না। কারণ জর্জেটের তোমার প্রতি আকর্ষণ ছিল। আর ওকে তো জান। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে ওস্তাদ।'

'কি আবোল তাবোল বকছ।'

লিভি তারপর তার প্রিয় প্রশ্নটি করে বসে, 'নরম্যান, যদি এমন হত তুমি এক মিনিট দেরি করে আসতে স্ট্রিটকার কর্নারে এবং পরের গাড়িটাতে উঠে পড়তে, তা হলে কি হত?'

'আর যদি এমন হত মাছগুলোর গায়ে ডানা লেগে গেছে আর ওরা উড়ে গেছে পাহাড়ে, তা হলে কি হত? শুক্রবার ডিনারে তা হলে কি যেতাম?'

কিন্তু স্ট্রিটকার মিস হয়নি নরম্যানের আর মাছেদের গায়ে ডানাও লেগে

যায়নি। কাজেই কোনো সমস্যারও সৃষ্টি হয়নি। ওরা বিয়ে করেছে। দাম্পত্য জীবন চলছে পাঁচ বছর। আর প্রতি শুক্রবার ডিনারে মাছও খাচ্ছে। এখন নিউইয়র্কে চলেছে এক হপ্তা কাটাতে।

এসব কথা ভাবছিল লিভি, হঠাৎ দেখল ছোটখাট একটা লোক প্যাসেজ ধরে আসছে ওদের দিকে। এ আবার উদয় হল কোথেকে ? ভাবল লিভি। তবে লোকটাকে পাত্তা দিল না সে। বাতাসে অবিন্যস্ত হয়ে যাওয়া চুল বাঁধতে লাগল আয়নায় তাকিয়ে। ওর ঠোঁট দুটো টসটসে। নরম্যান প্রায়ই বলে ওর ঠোঁটে যেন স্থায়ী চুম্বনের ভঙ্গি আঁকা রয়েছে।

চুল বেঁধে মুখ তুলে চাইল লিভি। ছোটখাট মানুষটা বসেছে ওদের বিপরীত দিকে। চোখে চোখ পড়তে লোকটা দাঁত বের করে হাসল। মাথার হ্যাটটা দ্রুত খুলে ঢেকে দিল পাশে রাখা কালো বাক্সটাকে। এটা তার হাতে ছিল। লোকটার মাথার চুল পাকা। মাঝখানে চকচকে টাক। ওদিকে চোখ পড়তে হেসে ফেলল লিভি। কিন্তু কালো বাক্সে দৃষ্টি যেতে মুছে গেল হাসি। কনুই দিয়ে ধাক্কা মারল সে নরম্যানকে।

খবরের কাগজ পড়ছিল নরম্যান। চাইল মুখ তুলে। 'কি ব্যাপার ?' সে ছোটখাট মানুষটাকে খেয়াল করেনি। লিভি স্বামীর কানে কানে বলল, 'ওই লোকটার বাক্সের দিকে তাকাও।'

বলে নিজেই আবার বাক্সের দিকে নজর ফেরাল লিভি। কালো বাক্সে সাদা অক্ষরে লেখা, 'হোয়াট ইফ।'

খাটো মানুষটি লিভির দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। মাথা ঝাঁকাল বারকয়েক, বাক্সের লেখার দিকে ইঙ্গিত করে নিজের প্রতি ইশারা করল।

নরম্যান বলল, 'ওটা নিশ্চয়ই লোকটার নাম।'

লিভি বলল, 'দূর। ওটা কোনো মানুষের নাম হতে পারে ?'

নরম্যান খবরের কাগজটা সরিয়ে রাখল এক পাশে। 'আচ্ছা, নাম হতে পারে কি পারে না দেখাচ্ছি তোমাকে।' সে সামনের দিকে ঝুঁকে এল। 'মিস্টার ইফ ?'

ছোটখাট মানুষটি আগ্রহ নিয়ে তাকাল তার দিকে।

'ক'টা বাজে মিস্টার ইফ?'

লোকটা তার ভেস্ট পকেট থেকে একটা বড়সড় ঘড়ি বের করল। দেখাল ডায়াল।

'ধন্যবাদ, মিস্টার ইফ,' বলল নরম্যান। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে ফিসফিস করল, 'দেখলে তো!'

আবার পড়ায় মন দিতে যাচ্ছিল নরম্যান, লক্ষ্য করল ছোটখাট মানুষটি তার কালো বাক্সটি খুলছে। ওরা দু'জনেই আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল লোকটির কাণ্ড।

৬ ইঞ্চি লম্বা, ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং ইঞ্চিখানেক পুরু ধূসর কাঁচের একটা স্ল্যাব বের করল সে বাক্স খুলে। কাঁচটার কিনারাগুলো ঢালু, কোনা গোলাকার, কোনো আকার নেই। তারপর একটা ছোট তারের স্ট্যান্ড বের করল সে, গ্লাস স্লাবের সাথে ফিট করল। জিনিসটা হাঁটুর ওপর রেখে গর্বের দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

লিভি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'হেভেনস, নরম্যান। ওতে ছবি দেখা যাচ্ছে।'

নরম্যান ঝুঁকে দেখল। তারপর তাকাল লোকটির দিকে।

'কি এটা? নতুন ধরনের টেলিভিশন?'

মাথা নাড়ল লোকটি। লিভি বলল, 'না, নরম্যান। ওতে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে।'

'কি?'

'দেখতে পাচ্ছ না? ওই সেই স্ট্রিটকার যেখানে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওই যে তুমি পেছনের সিটে বসে আছ কালো ফেডোরা পরে সেটা তিন বছর আগে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আর ওই যে আমি আর জর্জেট যাচ্ছি। কেন, দেখছ না তুমি?'

বিড়বিড় করল নরম্যান। 'এ দৃষ্টি ভ্রম ছাড়া কিছু নয়।'

'কিন্তু দৃশ্যটা দেখতে তো পাচ্ছ, তাই না! এ জন্যেই লোকটা এটার নাম দিয়েছে "হোয়াট ইফ"। ও আমাদেরকে দেখাচ্ছে যদি এমন হত তবে কেমন হত।'

ছোটখাট মানুষটির গ্লাস স্ল্যাবে দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে। লিভির পরিষ্কার মনে আছে স্ট্রিটকারটা হঠাৎ মোড় ঘুরলে ভারসাম্য হারিয়ে সে নরম্যানের কোলের ওপর বসে পড়েছিল। ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ে লিভি। তার বিব্রত ভাব কাটানর জন্যে তার সঙ্গে কথা শুরু করে দেয় নরম্যান। জর্জেটের পূর্ব

পরিচিত ছিল নরম্যান। তবে লিভির সাথে আর পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। গাড়ি থেকে নামার সময় নরম্যান জেনে গেছে কোথায় কাজ করে লিভি।

লিভির মনে আছে নরম্যানের কাছ থেকে যখন বিদায় নিচ্ছে সে জর্জেট কেমন হিংসুটে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল তার দিকে। বলছিল, 'নরম্যানের বোধহয় তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।' লিভি বলেছিল, 'আরে দূর। লোকটা স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। তবে ও খুব সুদর্শন, না?'

আর সেই স্ট্রিটকারটিকেই পর্দায় দেখতে পাচ্ছে লিভি। এমন সময় স্পিকারে ভেসে এল, "নেক্সট স্টপ, প্রভিডেন্স!" ট্রেনের গতি কমে আসতে শুরু করেছে। ছোটখাট লোকটি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

লিভি বলল, 'আমাদেরকে আরেকটু দেখাবেন?'

বাধা দিল নরম্যান। 'দাঁড়াও, লিভি। এসব দেখে কি লাভ?'

লিভি বলল, 'আমাদের বিয়ের দিনটি দেখতে চাই। দেখাবেন মিস্টার ইফ!'

ছোটখাট মানুষটি মাথা ঝাঁকাল সায় দেয়ার ভঙ্গিতে।

গ্লাসের স্ল্যাব আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। অল্প আলোকিত। আলোকে রেখাগুলোর রূপান্তর ঘটল শারীরিক কাঠামোতে। একটা অরগানের মিউজিক ভেসে এল লিভির কানে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নরম্যান বলল, 'ওই যে আমি। ওই তো আমাদের বিয়ে হচ্ছে। এবার তুমি খুশি তো?'

ট্রেনের শব্দ আবার ম্লান হয়ে এল, লিভি শুনল সে বলছে, 'হ্যাঁ। ওখানে তুমি আছ। কিন্তু আমি কোথায়?'

লিভি শুনেছিল নরম্যানের সঙ্গে জর্জেটের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। সে জর্জেটের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। কেন জানে না। স্ট্রিটকারে নরম্যানের সঙ্গে দেখা হবার পরে হঠাৎ করেই যেন জর্জেট উধাও হয়ে গিয়েছিল ওর চোখের সামনে থেকে। তবে নরম্যানের সাথে যতবার দেখা করেছে লিভি, হাজির থেকেছে জর্জেট।

নরম্যানকে সে পাবে না ধরেই নিয়েছিল লিভি। কারণ জর্জেট ছিল তার

চেয়ে ঢের বেশি সুন্দরী। মন খারাপ হত লিভির। সে এখন যেন শুনতে পাচ্ছে সেই কথাগুলো, 'আমি ঘোষণা করছি—'

ট্রেনের কু ঝিক ঝিক শব্দ ফিরে এল আবার। এক মহিলা তার বাচ্চা নিয়ে প্যাসেজ ধরে আসছে। কয়েকটি কিশোরী মেয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে হাসছে। এক কন্ডাক্টর দ্রুত চলে গেল সামনে দিয়ে।

তবে এসব কিছুই দেখছে না লিভি। সে স্থির তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। তারপর বলল, 'তুমি ওকেই বিয়ে করেছিলে।'

নরম্যান এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর হালকা গলায় বলল, 'করিনি, অলিভিয়া। তুমিই আমার একমাত্র স্ত্রী। ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করো।'

লিভি ঘুরল ওর দিকে। 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে—কারণ আমি তোমার কোলে গিয়ে পড়েছিলাম। না পড়লে জর্জেটকে বিয়ে করতে তুমি। ও তোমাকে না চাইলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে।'

নরম্যান বলল, 'শোনো, লিভি। তুমি আমাকে অযথাই ভুল বুঝছ। আমি যা করিনি তার জন্যে দোষ দিচ্ছ। আসলে এ সবই ঘটছে এক বোকা যাদুকরের ফালতু দৃশ্য দেখে।'

'কিন্তু তুমি করেছ।'

'কিভাবে জানলে?'

'তুমি নিজেই তো দেখেছ।'

'আমার ধারণা ওটা ছিল এক ধরনের সম্মোহন।' হঠাৎ রেগে গেল নরম্যান। সে ছোটখাট মানুষটির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'এখান থেকে কেটে পড়ুন, মিস্টার ইফ। বেরিয়ে যান। ভালোয় ভালোয় না গেলে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

লিভি ওকে ধাক্কা দিল কনুই দিয়ে। 'থাম! থাম বলছি! এসব কি শুরু করেছ!'

ছোটাখাট মানুষটি তার সিটের কোনায় জড়োসড়ো হয়ে বসল। কালো ব্যাগটা রাখল পেছনে। তার দিকে একবার তাকাল নরম্যান, তারপর লিভির দিকে। মিনিট পনেরো কিছু বলল না সে। ট্রেন ইতোমধ্যে নিউ লন্ডন ছাড়িয়ে এসেছে। নরম্যান নীরবতা ভেঙে ডাকল, 'লিভি!'

জবাব দিল না লিভি। তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। তবে কিছুই দেখছে না।

আবার ডাকল নরম্যান, 'লিভি! কথা বল!'

নিষ্প্রাণ গলায় বলল লিভি, 'কি ?'

নরম্যান বলল, 'এসবের কোনো মানে হয় না। বুঝতে পারছি না লোকটা এসব ঘটাচ্ছে কি করে। তবে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা উচিত তোমার। ধর, আমি যদি জর্জেটকে বিয়ে করতাম তুমি কি একা থাকতে ? আমার তথাকথিত বিয়ের সময় শুনেছিলাম তোমারও নাকি বিয়ে হতে যাচ্ছিল।'

'আমি বিয়ে করিনি।'

'তুমি কি করে জান ?'

'তাহলে আমি বলতাম। আর আমার মনের কথাও ফুটে উঠত ওই পর্দায়। আর বিয়ে করলেও সে ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর অধিকার ছিল না।'

'তা হয়তো ছিল না। তবে আমার কথা হল বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে "যদি হতে পারত" ধরনের চিন্তা স্রোতে গা ভাসান কি ঠিক হচ্ছে ?'

লিভির নাকের পাটা ফুলে উঠল। কিছু বলল না।

নরম্যান বলল, 'শোনো! উইনির বাড়িতে নববর্ষ উদযাপনের দিনটির কথা মনে আছে তোমার ?'

'আছে। এক কেস অ্যালকোহল ঢেলে দিয়েছিলে তুমি আমার গায়ে।'

'আমি বলতে চাইছি আমাকে বিয়ে করার অনেক আগে থেকে উইনি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'তাতে কি ?'

'জর্জেট তারো ভালো বন্ধু, নয় কি ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তা হলে ওই লোককে সেই পার্টির দৃশ্য দেখাতে বল যদি সত্যি আমি জর্জেটকে বিয়ে করে থাকি। বাজি ধরে বলতে পারি তা হলে ওখানে তোমাকেও তোমার স্বামী অথবা বাগদত্তার সঙ্গে দেখা যাবে।'

ওকে ইতস্ততঃ করতে দেখে নরম্যান বলল, 'তুমি ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছ ?'

গনগনে চেহারা নিয়ে লিভি বলল, 'মোটেই না! আর আমি বিয়ে করে থাকলেই বা কি।'

নরম্যান ছোটখাট মানুষটির দিকে তাকাল। তাকে কিছু বলে দেয়ার প্রয়োজন হল না। গ্লাস স্ল্যাব তার কোলে চলে এসেছে। নরম্যান বলল, 'রেডি ?'

মাথা ঝাঁকাল লিভি। ট্রেনের আওয়াজ ক্রমে আবার ম্লান হয়ে আসতে লাগল।

আবার কল্পনার জগতে ফিরে গেল ওরা। লিভি নিজেকে আবিষ্কার করল উইনির বাড়ির দোর গোড়ায়। আজ নববর্ষ। বাইরে তুষার পড়ছে। লিভি মাত্র ওর কোট খুলেছে, এমন সময় সবাই ওকে দেখে "হ্যাপি নিউ ইয়ার" বলে চিৎকার করে উঠল। ওকে উদ্দেশ্য করে জর্জেট বলল, 'তোমার সাথে কেউ আসেনি, অলিভিয়া ?'

লিভি জবাব দিল, 'মনে হয় ডিক কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে।'

জর্জেট কষ্টার্জিত হাসি হাসল। 'বেশ। নরম্যান আছে এখানে। তোমাকে আর একাকীত্বে ভুগতে হবে না, ডিয়ার।'

খানিক পরে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল নরম্যান। হাতে ককটেল শেকার। লিভিকে দেখে এগিয়ে গেল। 'আরে, এতদিন কোথায় ছিলে ? মনে হচ্ছে বিশ বছর ধরে তোমাকে দেখি না। কি ব্যাপার ? ডিক কি কার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না নাকি ?'

'আমার গ্লাসটা ভরে দাও, নরম্যান,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল জর্জেট।

'তুমিও একগ্লাস নেবে, লিভি ?' জর্জেটের দিকে তাকাল না নরম্যান।

'আমি তোমার জন্যে একটা নিয়ে আসছি,' বলে ঘুরল সে। আর তক্ষুণি ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

কার্পেটের কোনায় বেঁধে গিয়েছিল নরম্যানের জুতো। হোঁচট খেল সে। হাত থেকে ছিটকে গেল ককটেল শেকার। বরফ ঠাণ্ডা মদটা একেবারে গোসল করিয়ে দিল লিভিকে।

ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল লিভি। হাঁপাচ্ছে। নরম্যান বারবার "জঘন্য" বলে চিৎকার শুরু করে দিল। আর জর্জেট ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আশা করি তোমার জামাটা খুব বেশি দামি নয়, লিভি।'

ঘুরল লিভি। এক দৌড়ে চলে গেল শোবার ঘরে। ঘর খালি। বিছানার ওপর কতকগুলো কোট। ওগুলোর মাঝ থেকে নিজেরটা খুঁজছে লিভি, নরম্যান ঢুকল ঘরে। বলল, 'লিভি, জর্জেট কি বলল তার দিকে কান দিও না। আমি সত্যি দুঃখিত। আমি দাম—'

'ঠিক আছে,' বলল লিভি। তাকাচ্ছে না নরম্যানের দিকে, 'দোষটা তোমার ছিল না। আমি এখন বাড়ি যাব। কাপড় পাল্টাব।'

'আবার আসবে না?'

'জানি না। তবে মনে হয় না।'

'দেখ, লিভি...' নরম্যানের উষ্ণ আঙুলের স্পর্শ পেল সে কাঁধে—

লিভি নিজের ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি টের পেল। যেন মাকড়সার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে এবং—

—এবং ট্রেনের শব্দ ফিরে এল আবার।

সাঝ নেমেছে। ট্রেনের আলো জ্বলছে। নরম্যান তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখ ঘঁষতে ঘঁষতে বলল, 'কি হল?'

লিভি বলল, 'ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ করেই।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে দেখলাম।'

'বাস্তব জীবনেও আমি তাই করেছি।'

'কিন্তু বাস্তব জীবনে আমি তোমার স্ত্রী। এবার তোমার হুমড়ি খেয়ে পড়ার কথা ছিল জর্জেটের ওপর। ব্যাপারটা অদ্ভুত, না?' ও নরম্যানের কথা ভাবছে; নরম্যানের হাত ওর কাঁধের ওপর...

নরম্যানের দিকে তাকাল সে। সন্তুষ্টির গলায় বলল, 'দেখলে তো আমার বিয়ে হয়নি।'

'না। হয়নি। কিন্তু ডিক রিনহার্ডটের সঙ্গে তুমি প্রেম করতে?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে বিয়ে করার কথা ভাবনি, লিভি?'

'জেলাস, নরম্যান?'

নরম্যানকে হতবুদ্ধি দেখাল। 'কেন হবে? ওই গ্লাসের দৃশ্যের জন্যে? অবশ্যই না।'

'মনে হয় না ওকে আমি বিয়ে করতাম। তবে এসব এখন বাদ দাও। বাস্তব জীবন নিয়ে ভাব। কি হতে পারত এ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।'

নরম্যান ওর হাত চেপে ধরল। 'না, লিভি। আরেক বার। এই মুহূর্তে আমরা কি করছি খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। ঠিক এ সময়টাতে। যদি এ সময়ে আমি জর্জেটকে বিয়ে করতাম।'

সামান্য ভীত দেখাল লিভিকে। 'তার দরকার নেই, নরম্যান।' সে আর কিছু দেখতে চায় না। সে এই জীবন নিয়েই সুখি থাকতে চায়। নিউ হেভেন নিয়ে আর মাথা ব্যথা করতে চায় না।

কিন্তু নরম্যানের পীড়াপীড়িতে রাজি হতেই হল লিভিকে। তবে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে রাখল সে। ভাবল, কল্পনার কোনো কিছু ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

নরম্যান ছোটখাট মানুষটিকে বলল, 'নিন। শুরু করুন।'

হলদে আলোয় আবার কাজ শুরু হয়ে গেল। তবে এবার সব কিছু ধীরে ধীরে হচ্ছে মনে হল। ঝাপসা স্ল্যাব পরিষ্কার হয়ে এল, যেন বাতাসের ঝাপটায় কেটে গেল মেঘ। নরম্যান বলল, 'কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। এখানে শুধু আমাদের দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছি।'

ঠিকই বলেছে নরম্যান। ছ'জন মানুষ বসে আছে ট্রেনে। ট্রেন ঝিকঝিক করে ছুটে চলেছে। দৃশ্যটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লিভি। সিদ্ধান্তে নিল আর কখনো কল্পনা নিয়ে খেলবে না।

নরম্যানকে বলল, 'যদি হত বা হতে পারত এমন অনেক ঘটনাই মানুষ কল্পনা করে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। শুধু ভুল বোঝাবুঝিই হয়। বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি?'

মাথা ঝাঁকাল নরম্যান।

লিভি বলল, 'পৃথিবীতে এরকম "যদি হত"র মতো লাখ লাখ ঘটনা হয়তো আছে। কিন্তু আমার সেসব নিয়ে আর কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি আর কখনো জানতে চাইব না যদি এমন হত তাহলে কেমন হত।'

নরম্যান বলল, 'রিল্যাক্স, ডিয়ার। এই নাও তোমার কোট,' বলে স্যুটকেসের দিকে হাত বাড়াল।

লিভি বলে উঠল, 'আরে, মিস্টার ইফ গেলেন কোথায়?'

নরম্যান ঘুরল। দেখল ওদের বিপরীত দিকের সিটখানা খালি। হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে ছোটখাট মানুষটি। 'কি জানি। কোথাও হয়তো নেমে গেছে।' বলল নরম্যান।

'চলন্ত ট্রেন থেকে কোথায় নামবে? তাছাড়া হ্যাটটাও নিয়ে যায়নি।' বলে ঝুঁকল লিভি।

নরম্যান বলল, 'কিসের হ্যাট?'

লিভি খামোকাই মেঝে হাতড়ে বেড়াল। কিছুই ঠেকল না হাতে। 'এটা তো এখানেই ছিল—স্পর্শও পেলাম যেন।' সিধে হল সে, 'ওহ্, নরম্যান। যদি—'

নরম্যান ওর ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপ দিল। 'ডার্লিং...'

লিভি বলল, 'দুঃখিত। নাও, স্যুটকেসগুলোতে একটু হাত লাগাও।'

অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ

ট্রেন্ডস

অফিসে ঢুকে দেখলাম ডেস্কে ধ্যানী বকের মতো বসে আছে জন হারম্যান। এটি খুবই সাধারণ একটি দৃশ্য। হারম্যান উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে হাডসন নদীর দিকে। বুকে হাত বাঁধা, চোখে ভ্রুকুটি-ইদানিং এরকম চেহারায় দেখা যায় হারম্যানকে।

আমি ধপ করে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে। '"ক্ল্যারিয়ন" পত্রিকায় আজকের সম্পাদকীয়টা পড়েছেন, বস?'

আমার দিকে ঘুরল হারম্যান। লাল টকটকে চোখ। 'না। পড়িনি। কি লিখেছে? ঈশ্বরের প্রতিহিংসা আমার ওপর নেমে আসবে একথাই লিখেছে তো?' বিদ্রুপাত্মক শোনাল তার কণ্ঠ।

'তারচেও বেশি, বস', বললাম আমি, 'শুনুন। পড়ছি:

'আগামীকাল জন হারম্যানের স্বর্গকে অপবিত্র করার দিন। আগামীকাল বিশ্ব মতামত অগ্রাহ্য করে এই মানুষটি ঈশ্বরকে অবমাননা করার ফন্দি করেছেন।

'মানুষকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে বা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। এর মধ্যে একটি হল নক্ষত্রলোকে যাত্রা। আদমের মতো জন হারম্যানেরও শখ হয়েছে গন্ধম ফল ভক্ষণ করার। আর আদমের মতোই তিনি ভোগ করবেন শাস্তি।

'তবে এসব কথা মুখে বললেই শুধু চলবে না। আমরা যদি তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিহিংসার শিকার হতে দিই, তাহলে এ জন্যে তিনি একা কষ্ট ভোগ করবেন না, গোটা মানব জাতিকে ঈশ্বরের প্রতিহিংসার বলি হতে হবে। হারম্যানের শয়তানী কার্যকলাপকে সমর্থন করা মানে আমাদের নিজেদেরকে অপরাধের সঙ্গে সমৃদ্ধ করা, আর স্বর্গ থেকে অভিশাপ পতিত হবে সবার ওপরেই।

'কাজেই এটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে যে হারম্যানকে তাঁর আগামীকালের

তথাকথিত রকেট যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে অস্বীকৃতি জানালে তা সহিংসতার দিকে রূপ নিতে পারে। যদি রকেট যাত্রা বন্ধ করা না হয় বা কারাগারে অবরুদ্ধ করা না হয় হারম্যানকে, আমাদের ক্রুদ্ধ জনতা আইন নিজের হাতে তুলে নিলে তা অস্বাভাবিক কিছু হবে না—'

রাগে লাফিয়ে উঠল হারম্যান, এক ঝটকায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। গনগনে গলায় বলল, 'এটা সরাসরি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার সামিল। পড় এগুলো।'

পাঁচ/ছ'টা খাম ছুঁড়ে দিল সে আমার দিকে। এক নজর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম ওর ভেতর কি আছে।

'আবারও মৃত্যুর হুমকি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। বাড়িতে পুলিশ প্রহরা আর জোরদার করতে হয়েছে আমাকে। কাল নদীর পাড়ের টেস্টিং-গ্রাউন্ডে যাব। এ জন্যে মোটর সাইকেল পুলিশ এসকর্টের ব্যবহারও নিতে হয়েছে।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে ঘরে পায়চারি শুরু করে দিল হারম্যান। 'আমার কি করা উচিত বুঝতে পারছি না, ক্লিফোর্ড। প্রায় দশ বছর প্রমিথিউসের ওপর কাজ করেছি আমি। প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিসের জন্যে? কতগুলো বোকা আন্দোলনকারী আমার বিরুদ্ধে পাবলিক সেন্টিমেন্ট বৃদ্ধি করতে চাইছে। ওদের আমি ভয় পাব? কখনো না।'

'আপনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে আছেন, বস?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম আমি। আমার কথা শুনে খুবই রেগে গেল হারম্যান।

'"সময়ের আগে এগিয়ে আছি" বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি? এটা ১৯৭৩ সাল। পৃথিবী গত অর্ধশতাব্দী ধরে মহাশূন্য অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ স্বপ্ন দেখত, গল্প করত কবে তারা পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে যাবে। পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞান এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশে একটু একটু করে এগিয়েছে। আর এখন...এখন আমি অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছি। আর এ সময়ে আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

'২০ এবং ৩০-এর দশক ছিল নৈরাজ্য, অধঃপতন এবং কুশাসনের

বছর,' বললাম আমি। 'ওই সময়টাকে আপনি ক্রাইটেরিয়া হিসেবে ধরতে পারেন না।'

'জানি। জানি। তুমি ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করছ। আমার বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন, দাদা করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তারপরও ওই সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছিল। মানুষের মনে তখন সাহস ছিল, তারা স্বপ্ন দেখত, দুঃসাহসী ছিল। কিন্তু তখনকার মানুষেরা মন কুসংস্কারে ভরা। তারা মহাশূন্য অভিযাত্রাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। বলে এটা "ঈশ্বরের প্রতি বিরোধিতা।"'

ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে ফেলল হারম্যান, তাকাল অন্য দিকে। তার চোখে পানি এসে গেছে। হঠাৎ শিরদাঁড়া টানটান করল হারম্যান, আগুন ঝরছে চোখ দিয়ে। 'কিন্তু আমি ওদেরকে দেখিয়ে ছাড়ব। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে থোড়াই কেয়ার করে এগিয়ে যাব। কারণ এখন আমার ফিরে আসার উপায় নেই।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, বস,' বললাম আমি, 'মাথা গরম করলে কোনো ফায়দা হবে না।'

'ঠিক বলেছ। এসব নিয়ে আর মাথা গরম করব না। ভালো কথা, শেলটন কোথায়?'

'ইন্সটিটিউটে। আমাদের জন্যে বিশেষ ফটোগ্রাফিক প্লেট পাঠানর ব্যবস্থা করছে।'

'অনেকক্ষণ হল গেছে, না?'

'জ্বী। বস, একটা কথা। ওর মতিগতি আমার ভালো ঠেকছে না।'

'আরে দূর। ও আমার সঙ্গে দু'বছর ধরে কাজ করছে। কোনো ঝামেলা হয়নি।'

'ঠিক আছে।' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম আমি। 'আমার কথা শুনতে না চাইলে শুনবেন না। তবে ওকে দেখলাম অটিস এলড্রেজের প্যামপ্লেট পড়ছে। ওগুলোতে আপনার বিরুদ্ধে কি লেখা আছে জানেনই তো।'

'জানি,' নাক কোঁচকাল হারম্যান। 'ও সব পাত্তা দিই না আমি।'

'শেলটন বলল ফুটপাতে কুড়িয়ে পেয়েছে ন্যাক প্যামপ্লেটটা। কৌতূহল নিরসনের জন্যে পড়েছে। কিন্তু ওকে ওয়ালেটের পকেট থেকে প্যামপ্লেট বের করে পড়তে দেখেছি আমি। তাছাড়া ও প্রতি রোববার গির্জায় যায়।'

'তাতে কি? আজকাল সবাই গির্জায় যাচ্ছে। তবে ওর ওপর সন্দেহ হলে নজর রেখ।'

কিন্তু এরপর আমরা কাজের চাপে শেলটনের কথা ভুলে গেলাম। আর এই ভুলে যাওয়াটাই কাল হল।

টেস্টের আগে তেমন কিছু করার ছিল না। আমি পাশের ঘরে গিয়ে হারম্যানের ফাইনাল রিপোর্টগুলোতে চোখ বুলাতে লাগলাম। কোনো ভুলটুল থাকলে তা শুধরে দেয়ার দায়িত্ব আমার। তবে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। বার বার অতীতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

মহাশূন্য অভিযানের গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। মাস ছয় আগে হারম্যান যখন ঘোষণা করল প্রমিথিউসের কাজ প্রায় শেষ, বিজ্ঞানী মহল উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তাদের উৎসাহ বেশিদিন থাকেনি। একুশ শতকের পাঠকের কাছে ব্যাপারটা হয়তো আশ্চর্যের মনে হবে, তবে এটাই সত্য ১৯৭৩ সালে মহাশূন্য অভিযান করতে গিয়ে নানা আপত্তির মুখে পড়তে হয়েছে আমাদেরকে। ওই সময় মানুষের চিন্তাভাবনাগুলো খুব একটা উন্নত ছিল না। ধর্ম নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি চলছিল, গির্জাও হারম্যানের রকেট যাত্রার বিরোধিতা করেছে। এরপর পত্রিকাওলারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগে। হারম্যানের কাছে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে চিঠি আসতে শুরু করে। একা রাস্তায় বেরুন তার জন্যে নিরাপদ ছিল না। তবে সবচে' খারাপ অবস্থায় পড়ে সে ওটিস এলড্রেজ এবং তার ইভানজেনিক্যাল সোসাইটিকে নিয়ে।

এলড্রেজ এক অদ্ভুত চরিত্র—সেই প্রতিভাবানদের একজন যারা খুব দ্রুত ওপরে ওঠে আসে। ঈশ্বর তাকে দান করেছেন দুর্দান্ত একখানা জিভ। দারুণ কথা বলতে পারে এলড্রেজ। কথা বলে সম্মোহন করে রাখতে পারে জনতাকে। কমপক্ষে কুড়ি হাজার মানুষ তার এক কথায় যে কোনো সময় দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। গত চার মাস ধরে হারম্যানের পেছনে

লেগে আছে সে। আর গত চার মাস ধরে গোটা পৃথিবীই যেন মারমুখী হয়ে আছে তার প্রতি।

তবে সহজে দমবার পাত্র নয় পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা হারম্যান। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন যত দানা বেঁধে উঠছিল, ততই নিজের অবস্থানে সুদৃঢ় হয়ে উঠছিল হারম্যান।

হঠাৎ ডোরবেলের শব্দে চিন্তার সূতাটা ছিঁড়ে গেল আমার। দেখলাম লম্বা-চওড়া এক লোক পুলিশ সার্জেন্ট ক্যাসিডির সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি হাওয়ার্ড উইনস্টিড ইন্সটিটিউট প্রধান। হারম্যান দ্রুত বেরিয়ে গেল তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে। এরপর দু'জনে অফিসে ঢুকল। ওদের পেছন পেছন আমিও গেলাম। কৌতূহল নিয়েই। উইনস্টিড যতটা না বিজ্ঞানী তারচে' বেশি রাজনীতিবিদ।

উইনস্টিডকে মনে হল অস্বস্তিতে ভুগছে। হাসি খুশি ভাবটা চেহারা থেকে উধাও। হারম্যান ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে দেখে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাল উইনস্টিড। আবহাওয়া নিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। তারপর হঠাৎ করেই আসল প্রসঙ্গে চলে এল সে।

'জন,' বলল উইনস্টিড, 'অভিযাত্রা কয়েক দিনের জন্যে বন্ধ রাখলে কেমন হয়?'

'তুমিও অভিযাত্রা বাতিল করার কথা বলতে এসেছ! কিন্তু করব না। আর এটাই আমার শেষ কথা।'

হাত তুলে বাধা দিল উইনস্টিড। 'দাঁড়াও, জন। দাঁড়াও। উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথাটা আগে বোঝার চেষ্টা করো। ইন্সটিটিউট তোমাকে মুক্ত হাতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমি জানি। এও জানি খরচাপাতির অর্ধেকের বেশি গেছে তোমার নিজের পকেট থেকে। তবু এটা তুমি চালিয়ে যেতে পারবে না।'

'পারব না নাকি?' বিদ্রূপের সুরে জনতে চাইল হারম্যান। 'শোনো, জন। তুমি তোমরা বিজ্ঞানকে জান কিন্তু মানুষের স্বভাব চেন না। আমি চিনি। এটা "পাগলা দশক" নয়। সে স্বীকার করো আর নাই করো। ১৯৪০ সাল থেকে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।' বলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম বক্তৃতা দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে উইনস্টিড।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, তোমার জানা আছে গোটা পৃথিবী ধর্ম থেকে

সরে এসে সভা-সম্মেলনের স্বাধীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ওই সময় মানুষ ছিল নিরাপদময়, স্বপ্ন হারা, উদাস এবং কৃত্রিম। এলড্রেজ এদেরকে আখ্যায়িত করেছে "ধূর্ত এবং পাপী" বলে। এ সত্বেও বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটছিল। অনেকে ওই সময়টিকে "স্বর্ণযুগ" বলে আখ্যায়িত করেছে।

'যাহোক, ওই সময়ের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথাও তোমার জানা আছে। সময়টা ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগ আর আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের কাল; আত্মঘাতী, মস্তিষ্কশূন্য, উন্মাদ কাল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা আরো তুঙ্গে উঠে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও মানুষকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনতে শুরু করে।

'"পাগলা দশক" নিয়ে লোকের মনে বিরক্তির সীমা ছিল না। তারা এ যুগটার পুনরাবৃত্তি দেখতে চায়নি। আমরা এখন দ্বিতীয় ভিক্টোরিয়ান যুগে বাস করছি। আর মানব ইতিহাস সময়ের পেন্ডুলামের মতো দুলে দুলে যায়। আর এই দুলুনিটা ক্রমে ধর্ম এবং সত্ত্বা-আলোচনা ইত্যাদির দিকে এগিয়েছে।

'গত পঞ্চাশ বছরে অনেক কিছুই অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, শুধু বিজ্ঞান বাদে। কিন্তু ওটিস এলড্রেজের ভাষ্য বিজ্ঞানই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক এনে দিয়েছে। তারা বলে বিজ্ঞান সংস্কৃতিকে পেছনে ফেলে চলে গেছে, টেকনোলজি ছাপিয়ে গেছে সমাজবিজ্ঞানকে, আর এই ভারসাম্যহীনতা এত বাইরে এসেছে যে পৃথিবী প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন। আর ব্যক্তিগতভাবে আমিও মনে করি এ ব্যাখ্যা তেমন ভুল নয়।

'তবে এমন একটা সময়ে তুমি যা করতে যাচ্ছ তা জনতাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যে তাদেরকে শান্ত করে রাখাই মুশকিল হয়ে যাবে। তাই তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি, জন। এ পাগলামী ছাড়। নইলে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে তোমার।'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল ঘরে। তারপর জোর করে মুখে হাসি ফোটাল হারম্যান। 'কাম, উইনস্টিড। তুমি দেখছি দেয়ালে ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছ। তুমি কি বলতে চাইছ যে গোটা পৃথিবী দ্বিতীয় অন্ধকার যুগের মধ্যে ঢুকে পড়তে যাচ্ছে? বুদ্ধিমান মানুষগুলো তো বিজ্ঞানের পথেই আছে। নয় কি?'

'থাকলেও খুব বেশি নেই,' পকেট থেকে পাইপ বের করল উইনস্টিড।

তাতে ধীরেসুস্থে তামাক পুরল। 'এলড্রেজ মাস দুই আগে ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছে। নাম দিয়েছে এল.আর.। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বিস্তৃতি ঘটেছে দলটার। শুধু আমেরিকায় এ দলের সদস্য সংখ্যা দু' কোটি। এলড্রেজ দম্ভ করে বলছে আগামী কংগ্রেস নির্বাচনে সে-ই জয়ী হবে। আর এতে অতিশয়োক্তিত নেই। ইতোমধ্যে রকেট গবেষণা নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিল তৈরির জোর লবিং চলছে সিনেটে, আর এ ধরনের আইন ইতোমধ্যে পাশ হয়ে গেছে পোল্যান্ড, পর্তুগাল এবং রোমানিয়ায়। হ্যাঁ, জন, আমরা বিজ্ঞানের হয়রানির দিকে বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি।' সে এখন দ্রুত পাইপ টানছে।

'কিন্তু হাওয়ার্ড আমি যদি সফল হই তখন কি হবে?'

'কিন্তু তুমি বেঁচে ফিরতে পারবে কিনা সেটাই তো কথা।'

'তাতে কি এসে যায়? আমার ভুলগুলো থেকে—আমার পরবর্তী গবেষক শিক্ষা নেবে। শুধরে নেবে ভুল-ত্রুটি। এটাই তো বৈজ্ঞানিক নিয়ম।'

'জনতা বৈজ্ঞানিক নিয়মের ধার ধারে না, জানতেও চায় না। যাকগে, কি স্থির করলে? বাদ দেবে?'

লাফ মেরে সিধে হল হারম্যান, গায়ের ধাক্কায় চেয়ারটা মেঝেতে ছিটকে পড়ে ঠ্যাং ভাঙল। 'তুমি জান তুমি কি প্রশ্ন করেছ? জান যে আমার সারাজীবনের স্বপ্ন থেকে দূরে সরে যেতে বলছ? তোমার কি ধারণা আমি সব ছেড়ে ছুঁড়ে তোমার প্রিয় জনতার বদান্যতার আশায় বসে থাকব? তোমার কি মনে হয় ওরা সারাজীবনেও বদলাতে পারবে?

'আমার জবাব হলো এটাই; আমার অধিকার আছে জ্ঞানার্জন করা। বিজ্ঞানের অধিকার আছে কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়া উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটান। কিন্তু গোটা পৃথিবী আমার কাজে হস্তক্ষেপ করছে। বলছে আমি ভুল করছি। কিন্তু আমি জানি আমি ঠিক কাজটিই করছি। যতই বাধা আসুক আমি আমার অধিকার থেকে একচুল সরে দাঁড়াব না।'

দুঃখিত ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল উইনস্টিড। 'তুমি ভুল করছ, জন। সমাজ যা গ্রহণ করতে পারে সেটা সঠিক। যা পারে না তা ভুল।'

হারম্যান রাগী ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলল উইনস্টিডের দিকে। যথেষ্ট হয়েছে। তোমার আর কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি এবং আমেরিকার

আর সবাই আমার বিরুদ্ধে চলে গেলেও কাল শিডিউল অনুযায়ী আমার রকেট আকাশে উড়বে। এখন তুমি চলে যাও।'

লাল হয়ে গেল ইন্সটিটিউট প্রধানের মুখ। আমার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি আমার স্বাক্ষী, ইয়ংম্যান। এই উন্মাদ কি বলল সবই শুনেছ তুমি,' বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

আমার দিকে ঘুরল হারম্যান। 'তারপর, তুমি কি ভাবছ ? তুমিও নিশ্চয়ই ওর দলে।'

জবাবটা তৈরিই ছিল। চট করে বললাম। 'আপনার আদেশ মেনে চলার জন্যে আপনি আমাকে বেতন দেন, বস। কাজেই আমি সবসময় আপনার দলে।'

পরদিন ১৫ জুলাই। ভোরবেলা আমি, হারম্যান এবং শেলটন রওনা হয়ে গেলাম হাডসন নদীর দিকে। ওখানে প্রমিথিউসকে রাখা হয়েছে পুলিশ প্রহরায়। সূর্যের আলোয় চকচক করছে রকেটের গা।

প্রমিথিউসকে ঘিরে রেখেছে অনেক লোক। বেশির ভাগের চেহারায় মারমুখি ভাব। আমার তো ভয়ই করতে লাগল, না জানি ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর।

কিন্তু হারম্যান জনতাকে পাত্তাই দিল না। সে নাক কুঁচকে বসে রইল গাড়িতে। প্রমিথিউস-এ ওঠার পরে আমাদেরকে নির্দেশ দিল ইন্সপেকশন করার জন্যে। আমি আউটার ওয়াল এবং এয়ার লকগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম কোথাও লিক বা ফুটো আছে কিনা। শেলটন স্ক্রিন এবং ফুয়েল ট্যাঙ্ক চেক করল। শেষে হারম্যান গায়ে চড়াল গোবদা স্পেসস্যুট। জানাল সে রেডি।

নড়ে উঠল জনতা। কাঠের একটা প্ল্যাটফর্মে উঠে এল লম্বা, রোগা এক লোক। উজ্জ্বল চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। এ ওটিস এলড্রেজ। তাকে দেখে উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল। একটা হাত তুলল এলড্রেজ জনতাকে চুপ করার জন্যে। তারপর ঘুরল হারম্যানের দিকে। হারম্যান তাকে দেখে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। হারম্যানের দিকে লম্বা, হাড্ডিসার একটা আঙুল তুলে এলড্রেজ বলল :

'জন হারম্যান, শয়তানের পুত্র, তুমি এখানে এসেছ শয়তানী উদ্দেশ্য নিয়ে। তুমি এমন এক জায়গায় যেতে চাইছ যেখানে মানুষের যাওয়া

নিষেধ। তুমি স্বর্গের নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ নিতে চাইছ। তবে সাবধান— পাপের ফলের স্বাদ তোমাকে নিতে না হয়।'

এলড্রেজকে সমর্থন জানিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। এলড্রেজ বলে চলল, 'ঈশ্বর তোমার ওপর রেগে আছে, জন হারম্যান। তোমার এই ধৃষ্ঠতা তিনি সহ্য করবেন না। তোমার আজকেই মরণ হবে, জন হারম্যান।' শেষ কথাটা নবী বা দরবেশের বজ্র নির্ঘেষের মতো শোনাল।

তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে অন্যদিকে ঘুর দাঁড়াল হারম্যান। পরিষ্কার জোর গলায় পুলিশ সার্জেন্টকে বলল, 'এদেরকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন, অফিসার। রকেটের বড্ড কাছে এরা। রকেট চালু হবার পরে বিস্ফোরণের ধাক্কায় ক্ষতি হতে পারে।'

কিন্তু পুলিশ সার্জেন্ট পাত্তাই দিল না হারম্যানকে। হারম্যান আর কিছু বলল না। নীরবে ঢুকে পড়ল জাহাজে। তাকে রকেটে ঢুকতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠল জনতা। ওটিস এলড্রেজ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পাপীকে তার পাপের কাজ করতে দাও। "প্রতিশোধ আমি লইব" বলেছেন প্রভু।'

রকেট ছাড়ার মুহূর্তে শেলটন কনুই দিয়ে গুঁতো মারল আমাকে। 'এখান থেকে সরো। রকেট ব্লাস্টের ধোঁয়া বিষাক্ত।' ফিসফিস করে কথাগুলো বলেই দৌড় দিল সে।

হঠাৎ আমার পেছনে প্রচণ্ড একটা গর্জন শুনতে পেলাম। তীব্র উত্তপ্ত বাতাসের ঢেউ ধাক্কা মারল আমাকে। কানের পাশে ভীতিকর ভঙ্গিতে হিস্‌স্‌ করে উঠল কি যেন। ভয়ানক ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়লাম আমি। কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে চিত হয়ে পড়ে রইলাম মাটিতে, কানে ঝনঝন শব্দ, মাথা বনবন ঘুরছে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে ভয়ংকর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রমিথিউস-এর সমস্ত ফুয়েল সাপ্লাই এক সাথে বিস্ফোরিত হয়েছে। একটু আগে রকেটটি যেখানে ছিল সেখানে মস্ত একটা গর্ত হাঁ করে আছে। মাটিতে ছিটিয়ে আছে ধ্বংসস্তূপ। মানুষের তীব্র আর্তনাদ, আহাজারি কানে শোনা যায় না। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত লাশ।

হঠাৎ পায়ের কাছে গুঙিয়ে উঠল কে যেন। তাকাতেই দেখি শেলটন। মাথার পেছনটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

'ঘটনাটা আমিই ঘটিয়েছি,' কর্কশ এবং উল্লাসিত শোনাল তার কণ্ঠ। তবে খুব আস্তে বলছে শেলটন। কথা বলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। 'কাজটা আমিই করেছি। আমি লিকুইড-অক্সিজেন কম্পার্টমেন্ট খুলে রেখেছিলাম। আগুনের ফুলকির ছোঁয়া লাগা মাত্র—ভিড়িম!' হাঁপাতে লাগল শেলটন। নড়তে চেষ্টা করল। পারল না। 'ধ্বংসাবশেষের শক্ত কিছু একটা আঘাত করেছে আমাকে। তবে গ্রাহ্য করিনি। মারা গেলেও জানব যে—'

খকখক কেশে উঠল শেলটন। তারপর মারা গেল। তবে চেহারায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তৃপ্তি ফুটে রইল।

এতক্ষণে মনে পড়ল হারম্যানের কথা। ম্যানহাটান এবং জার্সি সিটি থেকে অ্যামবুলেন্স চলে এসেছে। পাঁচশ গজ দূরে কাঠের একটা চাপড়ার ধারে দেখলাম একটা অ্যামবুলেন্সকে। ওখানে, গাছের মগডালে ঝুলে আছে প্রমিথিউসের ফরোয়ার্ড কমপার্টমেন্টের ভাঙা একটা অংশ। আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটলাম ওদিকে। কিন্তু তার আগেই হারম্যানকে কমপার্টমেন্ট থেকে বের করে আনা হল। নিয়ে গেল অ্যামবুলেন্সে।

এরপর আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করলাম না। ছিন্নভিন্ন মানুষের ভিড় তখন নিহত-আর আহতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই হয়তো আমাদের কথা মনে পড়বে ওদের। তখন প্রতিশোধ নেয়ার বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে। ভিড়ের সাথে মিশে গেলাম আমি। সুযোগ বুঝে কেটে পড়লাম।

পরবর্তী একটা হপ্তা খুবই খারাপ কাটল আমার সময়। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে লুকিয়ে রইলাম প্রাণের ভয়ে। হারম্যানকে ভর্তি করা হয়েছে জার্সি সিটি হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় ওর তেমন ক্ষতি হয়নি। শুধু শরীরের কয়েক জায়গা কেটে ছিড়ে গেছে। তবে গোটা পৃথিবী এক ভয়ানক আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

নিউইয়র্কসহ বাকি সবাই স্রেফ উন্মাদ হয়ে উঠল। প্রতিটি পত্রিকায় বড় বড় হেডিং-এ লাল অক্ষরে ছাপা হল "২৮ জন নিহত, ৭৩ জন আহত—পাপের মূল্য," সম্পাদকীয়তে হারম্যানকে গ্রেফতার করার কথা বলা হল। বলা হল তার বিরুদ্ধে যেন প্রথম ডিগ্রী খুনের অভিযোগ আনা হয়।

ওটিস এলড্রেজের অনুসারী সবাই হারম্যানের মৃত্যুদণ্ড দাবি করল। দুর্ঘটনায় এলড্রেজ দু'টি পা-ই সাংঘাতিক জখম হয়েছে। সে কারণে

হারম্যানের প্রতি প্রতিহিংসাটা বেশি। ভয়ানক দাঙ্গার ভয়ে জার্সি সিটির মেয়র কারসন নগরীতে পুলিশ প্রহরা জোরদার করলেন। সেই সাথে ট্রেনটনে ফোন করে ছোট মিলিশিয়া পাঠাতে বললেন। ১৬ জুলাই জার্সি কোর্টে পুলিশের সাথে জনতার প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। টিয়ার গ্যাস মেরেও ছত্রভঙ্গ করা গেল না তাদেরকে। বাধ্য হয়ে চারদিক মার্শাল ল জারী করা হল নগরীতে। স্টেট মিলিশিয়া ঢুকল শহরে। তখন এলড্রেজ মেয়রের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে বাধ্য হল। মেয়র ঘোষণা করলেন, জন হারম্যানকে তার অপরাধের প্রাপ্য শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে, তবে সেটা করা হবে বৈধভাবে। বিচার চলবে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং নিউজার্সি এ জন্যে প্রয়োজনীয় যা কিছু করার দরকার করবে।

হপ্তাখানেকের মধ্যে মোটামুটি শান্ত হয়ে এল পরিস্থিতি। এরপর চলে গেল আর দু'হপ্তা। কাগজগুলো হারম্যানকে নিয়ে কিছু লিখল না বললেই চলে। তবে নতুন জিটম্যান অ্যান্টি রকেটারি বিল কংগ্রেসে পাশ হওয়া উপলক্ষে হারম্যানের নাম ওখানে এল রেফারেন্স হিসেবে।

হারম্যান এখন পড়ে আছে হাসপাতালে। কোনো বৈধ অ্যাকশন এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি তার বিরুদ্ধে। তবে হাসপাতালে প্রটেকশনের কথা বলে একরকম বন্দি করে রাখা হল হারম্যানকে। সিদ্ধান্ত নিলাম এবার আমাকেই অ্যাকশনে নামতে হবে।

জার্সি সিটির উপকণ্ঠে টেম্পল হাসপাতাল। হাসপাতালের রোগীদের লিস্ট ঘেঁটে দেখলাম ১৫ই নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে হারম্যানকে। এক অন্ধকার রাতে হানা দিলাম আমি টেম্পল হাসপাতালে। বেসমেন্টের জানালা গলে চলে এলাম হারম্যানের কেবিনে।

'কে ওখানে?' পায়ের শব্দ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল হারম্যান।

'শ্‌শ্‌। চুপ করুন। আমি ক্লিফ ম্যাককেনি।'

'তুমি! তুমি এখানে কি করছ?'

'আপনাকে এই নরকপুরী থেকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি। এখানে সারা জীবন বসে পচে মরার মানে হয় না। চলুন আমার সঙ্গে।'

কথা বলতে বলতে হারম্যানকে পোশাক এগিয়ে দিচ্ছিলাম আমি।

কাপড় পরা শেষ হতে চুপিসারে বেরিয়ে এলাম করিডরে। নিরাপদেই চলে এলাম আমার বাড়ির কাছে।

'সেদিন কি ঘটেছিল ?' গাড়িতে বসেই জিজ্ঞেস করল হারম্যান।

'রকেট বিস্ফোরিত হবার পরপর কি ঘটেছিল কিছুই মনে নেই আমার। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে।'

'ওরা কিছুই বলেনি আপনাকে ?'

'না।' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল হারম্যান। 'প্রশ্ন করে করে গলা ব্যথা হয়ে গেছে আমার।'

বিস্ফোরণের পরে কি ঘটেছিল বিস্তারিত বললাম হারম্যানকে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় মানুষ মারা গেছে শুনে খুবই মর্মাহত হল সে। শেলটনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে লাল হয়ে উঠল মুখ।

'খবরের কাগজগুলো আপনাকে খুনী বলে গালাগাল দিলেও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি,' বললাম আমি। 'কারণ ওখানে আরো অনেক স্বাক্ষী ছিল যারা বলেছে আপনি রকেট ছাড়ার আগে জনতাকে সরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছে পুলিশ সার্জেন্ট আপনার কথা পাত্তা দেয়নি। যার কারণে সমস্ত অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছেন। বিস্ফোরণে পুলিশ সার্জেন্ট নিজেও মারা গেছে।

'তবে এলড্রেজ এখন ক্ষেপে আছে আপনার ওপর। কাজেই কিছুদিন আপনার গা ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার।' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হারম্যান। 'শুনেছি বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে গেছে এলড্রেজ ?'

'হ্যাঁ। তবে না বাঁচলেই ভালো ছিল। দুটো পা-ই হারিয়ে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেছে সে। কিন্তু মুখখানা তার এখনো সমানেই চলছে।'

হারম্যানকে নিয়ে আমি মিনেসোটায় আমার চাচার খামার বাড়িতে চলে এলাম। নির্জন জায়গা। কেউ কার খবর রাখে না। ওখানে দেখতে দেখতে এক হপ্তা কেটে গেল। হারম্যানের হাসপাতাল থেকে পালান নিয়ে কয়েকদিন বেশ হৈ চৈ হল। তারপর আস্তে আস্তে থিতু হয়ে এল ব্যাপারটা। মনে হল হারম্যান পালিয়ে গেছে বলে কর্তৃপক্ষ যেন স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলেছে।

মাস ছয় পরের কথা। হারম্যান আবার মহাশূন্য অভিযাত্রায় নামার

পরিকল্পনা করেছে। জেদী মানুষ সে। কোনো প্রতিকূলতা তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সে যা করবে বলে একবার সিদ্ধান্ত নেয় তা করে ছাড়ে।

'প্রথমবারে আমার ভুল হয়েছিল।' এক শীতের সকালে হারম্যান বলল আমাকে, 'গবেষণার বিষয়টি ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা ঠিক হয়নি। তবে এবার সম্পূর্ণ গোপনে চালাব কাজটা।'

আমি হারম্যানের কথায় উৎসাহ বোধ করলাম না। শুকন হেসে বললাম, 'আপনি জানেন না রকেট নিয়ে সব রকম গবেষণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে? এমন কি থিওরিটিক্যাল রিসার্চের শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড?'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'অবশ্যই না, বস। আমি তথ্য জানাচ্ছি শুধু। তাছাড়া সমস্যা আরো আছে। আমাদের দু'জনের পক্ষে রকেট শিপ বানান সম্ভব নয়।'

'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছি, ক্লিফ। কিভাবে টাকার জোগাড় হবে তাও ভেবে রেখেছি। তোমাকে এজন্যে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করতে হবে।

'প্রথমে শিকাগো যাবে। সেখানে দেখা করবে রবার্টস অ্যান্ড স্টানটন ফার্মের সাথে। আমি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছি সব ওই ফার্ম থেকে নিয়ে আসবে। তারপর তিনজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এরা হল হ্যারী জেঙ্কিনস, জো ওব্রায়েন এবং নিল স্টানণ্টন। যত দ্রুত সম্ভব এদেরকে নিয়ে ফিরে আসবে।'

দু'দিন পরে শিকাগোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম আমি। হারম্যান যেভাবে বলে দিয়েছিল সেভাবে কাজ করলাম। কোনো অসুবিধে হল না। উত্তরাধিকার সূত্রে এক মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল হারম্যান। অর্ধেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল প্রথম জাহাজটা তৈরি করতে। বাকি অর্ধেক ফার্ম থেকে তুলে আনলাম। ওই তিনজনকেও নিয়ে এলাম। এরা রকেট নির্মাণে বিশেষজ্ঞ। এরপর শুরু হল নতুন প্রমিথিউস নির্মাণের পালা। সে এক দীর্ঘ সময়ের স্বপ্ন। সংক্ষেপে এটুকুই বলি—রকেট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম নানা শহর থেকে কিনেছি আমরা। অত্যন্ত গোপনে কাজটা করতে হয়েছে আমাদেরকে। সবচে' সমস্যায় পড়েছি দশ টন ফুয়েল জোগাড় করতে। এতেই বেশি সময় লেগেছে। টাকা পয়সার ঘাটতি হয়েছে। তাও বহু কষ্টে

জোগাড় করেছি। টানা পাঁচ বছর একটানা পরিশ্রম করার পরে তৈরি হল নতুন প্রমিথিউস।

এই পাঁচ বছরে রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক অঙ্গনে ঘটে গেল অনেক কিছুই। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮—এই সময়টাকে অভিহিত করা হল "নয়া ভিক্টোরিয়ান যুগ" বলে।

মহাশূন্য অভিযান এবং গবেষণার ওপর যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে উঠে যেতে শুরু করল। ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে এলড্রেজ কংগ্রেসে এল। ৯৩ তম কংগ্রেসে বিখ্যাত স্টোনলি-কার্টার বিল পাস হল। প্রতিষ্ঠিত হল ফেডারেল সায়েন্টিফিক নির্বাচন ইনভেস্টিগেটরি ব্যুরো বা F. S. R. I. B , এই সংস্থাকে ক্ষমতা দেওয়া হল সারা দেশে সব ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৈধতা বিচারের। ইচ্ছে করলেই সংস্থাটি যে কোনো গবেষণা বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা পেল। এদিকে এলড্রেজ যথারীতি গলাবাজি করে চলেছে। একবার সে বলল বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একে এখন থামান দরকার। শুধু ঈশ্বর আর বিশ্বাসের ওপর ভরসা রেখেই আমরা বিশ্বজনীন এবং চিরস্থায়ী সমৃদ্ধি আনতে পারি।

তবে এটাই ছিল এলড্রেজের শেষ গলাবাজি। ভাঙা ঠ্যাং আর জোড়া লাগেনি তার। ১৯৭৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মারা গেল সে।

তবে এলড্রেজের মৃত্যু রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির জীবনে কোনো প্রভাব ফেলল না। তবে F. S. R. I. B তার কাজ করে যাচ্ছিল। যদিও বিজ্ঞানের গলা টিপে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না এই সংস্থাটির পক্ষে। ১৯৭৮ সালে F. S. R. I. B-র ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস করা হল। বলা হল এখন থেকে সংস্থাটি শুধু সেসব গবেষণার ব্যাপারে নাক গলাতে পারবে যেসব গবেষণায় তাকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয়া হবে।

১৯৭৮ সালের বসন্তে নতুন প্রমিথিউস-এর কাজ শেষ হয়ে গেল। তবে পরিমাণ মতো ফুয়েল জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। কিন্তু হারম্যানের গোঁ সে এই ফুয়েল নিয়েই মহাকাশ যাত্রা করবে। তাকে বাধা দিয়েও লাভ হল না।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। হারম্যান তার নতুন প্রমিথিউস নিয়ে মহাশূন্য

অভিযান করার ৩৩ ঘণ্টা পরে খবর পেলাম ওয়াশিংটনে, পোটোম্যাক নদীর বালুতে মুখ থুবড়ে পড়েছে একটি রকেটশিপ। ফুয়েল ফুরিয়ে গিয়েছিল ওটার। পুলিশ এসে রকেট-শিপ এবং তার একমাত্র ক্লান্ত, প্রায় বিধ্বস্ত যাত্রীকে উদ্ধার করল। রকেট-শিপটির নাম নিউ প্রমিথিউস। যাত্রীর নাম জন হারম্যান।

পরে শুনেছি পুলিশ যখন প্রমিথিউসের মধ্যে চিৎ হয়ে থাকা হারম্যানের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছিল, তখন নাকি হারম্যান চেঁচাচ্ছিল, 'যাও, বোকার দল। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাও। তবে আমি ঠিকই চাঁদ থেকে ঘুরে এসেছি। চাঁদটাকে তো আর ফাঁসিতে লটকাতে পারবে না। যাও F. S.R.I. B-কে খবর দাও। ওরা হয়তো আমার অভিযাত্রাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবে।' বলে অজ্ঞান হয়ে যায় হারম্যান।

অজ্ঞান হারম্যানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সরকারি কর্মকর্তারা গেলেন প্রমিথিউসকে দেখতে। লগ পড়লেন, ড্রইং-এ চোখ বুলালেন, চাঁদে তোলা হারম্যানের ছবিগুলো দেখলেন, তারপর নীরবে চলে গেলেন। জনতা পোটোম্যাক নদীর তীরে ভিড় জমাল। ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা—একজন মানুষ চাঁদে গিয়েছিল।

এরপর অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। হারম্যান নিজেও আশা করেনি এমন কিছু ঘটবে। গোটা পৃথিবীর মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠল হারম্যানের চাঁদে যাবার কথা শুনে। সবাই তাকে অভিনন্দিত করতে লাগল। আমি একদিন হাসপাতালে গেলাম হারম্যানকে দেখতে। দেখি খবরের কাগজ, টেলিগ্রাম আর চিঠির স্তূপের মধ্যে প্রায় ডুবে আছে হারম্যান। আমাকে দেখে হাসল সে। বলল, 'এ হল ট্রেন্ড বা ঝোঁক, ক্লিফ। ঘড়ির পেন্ডুলাম আবার আমাদের দিকে দুলতে শুরু করেছে।'

অনুবাদ : অপু রায়হান

দ্য গ্রেটেস্ট এসেট

বিশাল এক পার্কের মতো লাগছে পৃথিবীটাকে। বড় মায়াবী এ দৃশ্য।

লাউ টানসোনিয়া তার চোখের নিচে বিস্তৃত আকারে দেখতে পাচ্ছে পৃথিবীটাকে। লুনার শাটল থেকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার লম্বা নাকটা রোগাটে চেহারাটাকে এমনভাবে দু'ভাগ করেছে, গাল দুটোতে সব সময় লেগেই থাকে বিষণ্ণতা। সেই চেহারায় এখন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে মনের অবস্থা।

এর আগে কখনো এতদিন বাইরে থাকেনি সে—প্রায় মাসখানেক হবে—এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানটা যখন পরিষ্কার অনুভব করল, তখনো তেমন ভাবান্তর হল না তার।

তবে প্রতিক্রিয়াটা হল পরে। চোখের সামনে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে পৃথিবী। বিষন্নতা কেটে যেতে লাগল তার।

পৃথিবী এখনো অনেক দূরে। সূর্যের আলোতে ঝিকমিক করা গ্রহটির মোচাকার বৃত্তের আকৃতি নিতে যদিও অনেক দেরি, তবু একটা আদিম সৌন্দর্য ফুটে আছে পৃথিবীর। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে যখনই পৃথিবীর এখানে ওখানে বাদামি এবং সবুজ ছোপ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ৩০ কোটি বছর আগেও আবির্ভাব ঘটে নিষ্প্রাণ ভূভাগে, সবুজে সবুজে ছেয়ে যায় নীরস উপত্যকাগুলো।

ক্রমেই পৃথিবীর কাছে চলে আসছে লাউ। শিপটা যতই নিচের দিকে নামছে, স্বাভাবিক মাধুর্য ফুটে উঠছে পৃথিবীর।

বুনোভাবটা এখন আর চোখে পড়ছে না কোথাও। লাউ অবশ্যি পৃথিবীর আদিম পরিবেশের সাথে মোটেও পরিচিত নয়। এই পরিবেশটা সম্পর্কে সে জেনেছে বই পড়ে, কিংবা পুরান ছবি দেখে।

গাছপালা শোভিত বনগুলো সুবিন্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। প্রতিটি গাছের অবস্থান এবং প্রজাতির নাম চিহ্নিত করা হয়েছে সযত্নে। শস্যভরা ফসলের মাঠগুলো চক্রাকারে পর পর সাজান। আগাছা উপড়ে সার দেয়া হয়েছে জমিতে। অল্প যে কটি গৃহপালিত পশু এখনো টিকে আছে, নম্বর দিয়ে সনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো। লাউয়ের মনে হল, ঘাসের ডগাগুলো যেন বিশেষভাবে চিহ্নিত।

পশু পাখির সংখ্যা এতই কম যে, এক পলক দেখলেই অন্য রকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। এমনকি পোকামাকড়ের সংখ্যাও অনেক কম। বড় জাতের কোনো প্রাণী নেই বললেই চলে।

বেড়াল জাতীয় প্রাণীগুলোর ভেতর গুটি কয়েক টিকে আছে কোনোরকমে। কেউ যদি ইঁদুর জাতীয় প্রাণী হ্যামস্টার পোষে, সেটা তার জন্যে হবে দেশপ্রেমিকের কাজ।

ওহ, এখানে একটা জিনিস শুধরান দরকার! পৃথিবীতে কেবল মাত্র জীবন্ত বা নিম্নমানে অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা কমে এসেছে। অন্য একটি প্রাণীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে অন্য সব প্রাণী। প্রাণিজগতের চার ভাগের তিন ভাগ এখন এই প্রাণীর দখলে। এবং বিপুল সংখ্যাধিক্য এগিয়ে থাকা এই প্রাণীটি হচ্ছে—হোমোসেপিয়েন্স, অর্থাৎ মানুষ। এবং পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান ব্যুরোর সকল কর্মকাণ্ডকে কলা দেখিয়ে প্রতিবছর একটু একটু করে বাড়ছে মানুষের সংখ্যা।

লাউ ভাবছে ব্যাপারটা নিয়ে, সব সময় ভেবে থাকে যেমনটি। কিন্তু ভেবে কোনো কূল পাচ্ছে না সে। এত মানুষের শেষ পরিণতি কি? এমনিতে ওপর থেকে মানুষের কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ এ পর্যন্ত একটা মানুষের চোখে পড়েনি তার।

অনেক আগে, এক সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে শহরগুলো ছিল এখন আর নেই সেগুলো। শস্যের খেতগুলোতে পুরান যে বড় রাস্তাগুলো এখনো রয়ে গেছে, সেগুলোই শুধু দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। আর কোথাও রাস্তাঘাটের কোনো অস্তিত্ব নেই। ওপরে শস্যের খেত, মাটির নিচে মানুষ—এই হচ্ছে এখনকার অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষ তার ভূগর্ভস্থ বাড়িঘর থেকে ওপরে আসে না। কোটি কোটি মানুষ, তাদের কলকারখানা, শক্তি যোগানর উৎস—সবই এখন মাটির নিচে।

এ মুহূর্তে প্রায় ভুলে বসে আছে লাউ, কয়েক মাস ধরে যোগাযোগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এখন সে পৃথিবীতে দেখা করতে যাচ্ছে অ্যাড্রাসটাসের সাথে।

ইনো অ্যাড্রাসটাস বাস্তুসংস্থানে ব্যুরোর মহাসচিব। পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ পদ এটা। বর্তমানে এই মহাসচিব সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর।

বসে বসে কথা বলছে জেন মারলি। ঘুমকাতুরে উদাস একটা ভাব তার চেহারায়। আলুথালু বেশ দেখে মনে হচ্ছে, যদি মানুষের খাবার-দাবার বড় বেশি লাগাম ছাড়া হয়ে যেত, তাহলে এতদিনে হোঁৎকা সাইজ হয়ে যেত তার।

জেন মারলি বলল, 'আমার টাকার দিকটা যদি ধরা হয় তাহলে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ পদ, এবং কেউ বোধ হয় জানে না এটা। এ নিয়ে লিখতে চাই আমি।'

তার কথায় কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাড্রাসটাস। গোলগাল গাট্টা-গোট্টা ধরনের শরীর তার। মাথার পাতলা চুলগুলো এক সময় ছিল হালকা বাদামি, এখন রঙটা হয়েছে ছোপ ছোপ বাদামি-ধূসর। হালকা নীল চোখের মণি কালো টিস্যু দিয়ে ঘেরা। চোখের নিচে কুঁচকে আছে চামড়া। এই চোখ দুটোর জন্যেই একটা প্রজন্মের প্রশাসক হিসেবে বিচক্ষণতা ফুটে আছে চেহারায়। আঞ্চলিক বাস্তুসংস্থান পরিষদগুলো মিলে টেরেস্ট্রিয়াল ব্যুরো গঠনের পর থেকে বাস্তুসংস্থানের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে আসছে অ্যাড্রাসটাস। যারা তাকে চেনে, তারা জানে অ্যাড্রাসটাসকে ছাড়া বাস্তুসংস্থান নিয়ে চিন্তা করা অসম্ভব ব্যাপার।

অ্যাড্রাসটাস বলল, 'সত্যি বলতে কি, আমি নিজের মতো করে খুব কমই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যে নির্দেশ পত্রগুলোতে আমি সাইন করেছি, সেগুলো আসলে আমার নিজের সিদ্ধান্ত নয়। আমি সাইন করেছি মানসিক অস্বস্তি এড়ান জন্যে। আমি সাইন করলাম না, কিন্তু কম্পিউটারগুলো করে দিল, সেটা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হত। আপনি তো জানেন, কম্পিউটারগুলোই শুধু করতে পারে কাজটা।

'প্রতিদিন অবিশ্বাস্য-রকমের হিসেব-কিতেবে ভরা ডাটা চলে আসছে

ব্যুরো অফিসে। এই ডাটা পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে পৃথিবীর সব জায়গায়। ডাটাগুলো শুধু মানুষের জন্ম, মৃত্যু, স্থান বদল, কলকারখানার উৎপাদন এবং বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার নিয়ে নয়, তাবৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের দৃশ্যমান পরিবর্তনও থাকছে ডাটাগুলোতে। তার মানে বাতাস, পানি এবং মাটির কোনো তথ্য আর বাদ থাকছে না। সংগৃহীত তথ্য বিভিন্নভাবে ভাগ হয়ে জমা হচ্ছে কম্পিউটারের মেমোরীতে। এবং কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর আসে এই মেমোরী থেকে।'

মারলি আড়চোখে এক পলক তাকাল ধূর্ত ভঙ্গিতে। বলল, 'সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে তাহলে ?'

অ্যাড্রাসটাস মৃদু হেসে বলল, 'এমন কোনো প্রশ্ন নেই, যার উত্তর জানা নেই আমাদের।'

'এবং এরই ফলশ্রুতিতে,' বলল মারলি। 'আজকের এই বাস্তুসংস্থান সমতা।'

'ঠিক বলেছ, তবে এই বাস্তসংস্থান সমস্যার বিশেষ একটি দিক রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বরাবর জনসংখ্যার ভারসাম্যতা এসেছে বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে। যখনই কোনো ভারসাম্যহীনতা এসেছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—এসব দুর্ঘটনার মাধ্যমে লোকজন মরে গিয়ে ভারসাম্য এসেছে জনসংখ্যায়। আর আমরা এই জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করেছি কোনো রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই। বসতি স্থানান্তর এবং বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে জনসংখ্যা।'

মারলি বলল, 'এজন্যেই আপনি এক সময় বলেছিলেন—মানুষের সবচে' বড় সম্পদ হচ্ছে বাস্তসংস্থানের ভারসাম্যতা।'

'ওরাও বলে—আমি বলেছি একথা।'

'আপনার পেছনের দেয়ালেই তো লেখা আছে কথাটা।'

'এখানে তো লেখা মাত্র প্রথম কয়েকটা শব্দ,' শুকনো গলায় বলল অ্যাড্রাসটাস।

পেছনের দেয়ালে লম্বা এক শিমার-প্লাস্টের ওপর জ্বলজ্বল করছে শব্দগুলো। জীবন্ত হয়ে ফুটে আছে। মানুষের সবচে বড় সম্পদ...

'ব্যক্তব্যটা শেষ করতে হয়নি আপনাকে।'

'এছাড়া আর কি আপনাকে বলতে পারি, বলুন ?'

'আমি কি খানিকক্ষণ এখান থেকে দেখতে পারি আপনার কাজ ?'

'তাহলে আপনাকে দেখতে হবে উন্নতমানের এক কেরানির কাজ।'

'আমি তা মনে করি না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকা অবস্থায় আর কারো সাথে আপনার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ?'

'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আজ। টানসোনিয়া নামে এক যুবক আসবে দেখা করতে। চাঁদ থেকে আসছে সে। আমাদের মুন-ম্যানদের একজন। আপনি বসতে পারেন এখানে।'

'মুন-ম্যান ? তার মানে—'

'হ্যাঁ, আমাদের লুনার ল্যাবরেটরিগুলোর একটি থেকে আসছে সে। ভাগ্যিস, চাঁদটা ছিল। ওদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব যদি পৃথিবীতে হত, তাহলে বারোটা বেজে যেত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার।'

'আপনি কি পারমাণবিক পরীক্ষা এবং তেজস্ক্রিয় দূষণের কথা বলছেন ?'

'আমি অনেক কিছুর কথাই বলছি।'

লাউ টানসোনিয়ার চেহারায় মিশ্র একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। একদিকে যেমন চাপা উত্তেজনা, আরেকদিকে তেমনি উদগ্রীব গোপন প্রতীক্ষার চিহ্ন।

'আপনাকে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য, মিস্টার সেক্রেটারি,' রুদ্ধনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল লাউ। পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণ টান সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে।

'কাজটা শীঘ্রি করতে পারলাম না বলে দুঃখিত,' সহজভাবেই বলল অ্যাড্রাসটাস। 'আপনার কাজের ব্যাপারে চমৎকার রিপোর্ট রয়েছে আমার কাছে। এখানে যে আরেক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছেন উনি জেন মারলি, একজন বিজ্ঞান লেখক। আমাদের সঙ্গে অবশ্যি কাজ নেই তাঁর।'

লেখকের দিকে এক নজর তাকিয়ে নড করল লাউ, তারপর অ্যাড্রাসটাসের দিকে ফিরে সাগ্রহে বলল, 'মিস্টার সেক্রেটারি—'

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন,' বলল অ্যাড্রাসটাস।

লাউ বসল ঠিকই, তবে সময় নিল। পৃথিবীর বাতাসে অভ্যস্ত হতে

পারছে না সে। সময় লাগছে পরিবেশগত জড়তা কাটাতে। লাউ বলল, 'মিস্টার সেক্রেটারি, আমি আপনার কাছে ব্যক্তিগত একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। আমার প্রজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা—'

'আমি জানি।'

'আপনি পড়েছেন, স্যার ?'

'না, আমি পড়িনি, তবে কম্পিউটারগুলো পড়েছে। বাতিল হয়ে গেছে আপনার আবেদন।

'হ্যাঁ, কিন্তু আবেদন করছি আমি সরাসরি আপনার কাছে।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল অ্যাড্রাসটাস। অক্ষমতা প্রকাশের ভঙ্গিতে বলল, 'এটা আমার জন্যে কঠিন একটা ব্যাপার। কম্পিউটারের ওপর মাতব্বরি করার সাহস আমি পাব কোত্থেকে।'

'কিন্তু সাহস আপনাকে করতেই হবে,' ব্যাকুল কণ্ঠে বলল লাউ। 'আমার ক্ষেত্রটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং;।'

'হ্যাঁ, জানি আমি।'

'এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং,' বলে চলল লাউ। 'চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিচারিকা, বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হওয়া উচিত নয়। মোটেও না।'

'আপনার এই চিন্তাটা বড় খাপছাড়া। আপনি মেডিকেল ডিগ্রী নিয়ে মেডিকেল জেনেটিক্স-এ আশাব্যঞ্জক কাজ করে যাচ্ছেন। আমি জেনেছি, আপনি ডায়বেটিসের ওপর দু'বছর ধরে গবেষণা করে এমন এক সম্ভাবনার দ্বারে পৌচেছেন, ডায়বেটিস সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি আর এ কাজ চালিয়ে যেতে চাই না। অন্য কেউ করুক কাজটা। ডায়াবেটিসকে ভালো করা মানে মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দেয়া। তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর একটা বাড়তি চাপ আসবে। এই সাফল্য অর্জনে কোনো আগ্রহ নেই আমার।'

'আপনার কাছে কি মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই ?'

'কোনো কালেই নয়। পৃথিবী জুড়ে গিজ গিজ করছে মানুষ।'

'আমি জানি, কিছু মানুষের চিন্তাভাবনাই এমন।'

'আপনিও তাদের একজন, মিস্টার সেক্রেটারি। আপনার লেখাগুলো

তো এসব কথাই বলে। এবং এটা চিন্তাশীল যে কোনো মানুষের কাছে পরিষ্কার—বিশেষ করে আপনার কাছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হচ্ছেটা কি। বাড়তি লোক মানেই অস্বস্তি, এবং এই অস্বস্তি দূর করতে চাইলে ব্যক্তিগত পছন্দকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। একটা মাঠে যথেষ্ট লোক জড় হয়েছে, তারা শুধু তখুনি একসঙ্গে বসতে পারবে, যখন সবাই একসঙ্গে বসার চেষ্টা করবে। এ সময় হুড়োহুড়ি লেগে যাবে তাদের মধ্যে। যারা বসার তারা ঠিকই বসে যাবে, আর বাড়তি লোকেরা চলে যাবে মাঠের বাইরে। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ঠিক তেমনি একটা ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্ধের মতো ধেয়ে চলা জনতার ঢল কোন দিকে যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে, কিছুই জানে না কেউ।'

'এরকম গালভরা বুলি ছাড়ার জন্যে কতবার মহড়া দিয়েছেন, মিস্টার টানসোনিয়া ?'

লজ্জায় খানিকটা লাল হল লাউ। বলল, 'এবং জীব জগতের অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ আছে, এক এক করে এবং গোটা জাতি ধরে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে ক্রমাগত। এর মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু আমাদের খাবার যোগান গাছগুলো। এভাবে বাস্তুসংস্থান প্রতিবছর সহজতর হয়ে আসছে।'

'বাস্তুসংস্থান তার পরিবেশগত ভারসাম্য ঠিকই রক্ষা করে আসছে।'

'কিন্তু এই ভারসাম্যের রঙ এবং বৈচিত্র তো হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি আমরা জানি না, এই ভারসাম্য আদৌ কতটা ভালো। আমরা এই ভারসাম্যটা মেনে নিয়েছি শুধু মাত্র আমাদের ভারসাম্যটা আছে বলে।'

'আপনি তাহলে কি করতে চান ?'

'যে কম্পিউটার আমার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে জিজ্ঞেস করুণ এ ব্যাপারে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আমি এমন এক প্রোগ্রাম শুরু করতে চাই, যা হবে পোকামাকড় থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর জন্যে। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীরা নিশ্চিত হওয়ার আগেই তাদের মাঝে নুতন করে বৈচিত্র্য আনতে চাই ?'

'কি জন্যে চান ?'

'কৃত্রিমভাবে সাজাতে চাই বাস্তুসংস্থান। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের নিয়ে এমন একটা ভারসাম্য আনতে চাই, যা পৃথিবীতে নেই।'

'কাজটা আপনি করবেন কিভাবে ?'

'জানি না। যদি কাজটা করার সঠিক উপায় জানা থাকত, তাহলে তো গবেষণার কোনো দরকার হত না। কিন্তু আমি জানি, আমাদের সফল হতে হবে। আমাদের আরো জানতে হবে কোন জিনিসটির মাধ্যমে সফল করে তোলা যাবে ইকোলজিকে। ইকোলজির অবস্থা এ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তাতে গোটা ব্যাপারটাই প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতিই দিন দিন বাড়িয়ে তোলে সংখ্যা, আবার কোনো বিপর্যয়ের মাধ্যমে সমান করে দেয়। এর বাইরে কিছু করার চেষ্টা আমরা চালাব না কেন ?'

'তার মানে অন্ধের মতো কিছু একটা করতে চান ? এলোপাতাড়ি চেষ্টা ?'

'অন্য কোনো উপায়ে কিছু করার মতো যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি তো নেই আমাদের। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রয়েছে নিজস্ব মৌলিক চালিকা শক্তির মতো ব্যাপক পরিবর্তনের ক্ষমতা। চিকিৎসা বিদ্যায় এ জিনিসটি ব্যবহার করে আমি কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে চাই।'

অ্যাড্রাসটাস ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনি কিভাবে সেই ইকোলজি সাজাতে চাইছেন, যা সত্যিই একটা কাজের কাজ হবে ? বর্তমানে যে ইকোলজি রয়েছে, তার সাথে আপনার ইকোলজির টক্কর লেগে কি ভারসাম্যহীন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হবে না ? শেষে হয়তো এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হবে, যার সাথে তাল মেলাতে পারব না আমরা।'

'আমি বলছি না যে, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীতে চালাব,' বলল লাউ। 'অবশ্যই তা হবে না।'

'তাহলে কি চাঁদে হবে ?'

'না, চাঁদেও না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে ছোট ছোট গ্রহাণুতে। কম্পিউটার যখন আমার প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন এই বুদ্ধিটা চলে আসে মাথায়। হয়তোবা এ থেকে ভিন্ন একটা ফল পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রহাণু বেছে নিয়ে চালাতে হবে এই পরীক্ষা।'

'কিন্তু এর ভালো দিকটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারছেন না আপনি।'

'না, নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না অবশ্যই। কিন্তু কিছু না কিছু ভালো তো হবেই। এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।'

অ্যাড্রাসটাসের পেছনে, দেয়ালের ওই লেখাটা দেখিয়ে লাউ বলল, 'যেমন—আপনি বলেছেন, মানুষের সবচে' বড় সম্পদ হচ্ছে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য। এ ব্যাপারে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেল এ উছিলায়, যা আগে কখনো হয়নি।'

'কতগুলো গ্রহাণু আপনার দরকার ?'

লাউ খানিকটা ইতস্তত করে বলল, ' এই ধরুন—দশ ? শুরু তো করি— নাকি ?'

'পাঁচটা নিন,' বলল অ্যাড্রাসটাস, রিপোর্টটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে খস খস করে লিখে বাতিল করে দিল কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত।

মারলি এবার বলল, 'এরপরেও কি বলবেন, আপনি একজন উন্নত মানের কেরানি ? যে কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে পাঁচ-পাঁচটা গ্রহাণু নিয়ে আসতে পারে, সে কি কেরানি ?'

'এতে কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে। তবে আমি নিশ্চিত, পাওয়া যাবে অনুমোদন।'

'তাহলে আপনি মনে করছেন, এই যুবকের পরমর্শটা সত্যিই কাজের ?'

'না, আমি সেটা মনে করছি না। কারণ তার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটা এতই জটিল যে, এটা নিশ্চিতভাবে যুবককে তার লক্ষ থেকে দূরে ঠেলে দেবে।'

'আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ?'

'কম্পিউটার তো তাই বলে। এ জন্যেই তো তার প্রজেক্ট বাতিল হয়েছে।'

'তাহলে আপনি কেন কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন না ?'

'কারণ আমি এবং সরকার এখানে ইকোলজির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংরক্ষণ করছি।'

মারলি সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, 'কই, আমি তো কিছু পেলাম না।'

'কারণ আমার অনেক আগে বলা অসমাপ্ত বাক্যটাকে ভুলভাবে শেষ করেছেন আপনি। শুধু আপনি নন, সবাই। আমি বলেছিলাম দুটি বাক্য, আর সবাই দেখতে পাচ্ছে একটি।'

'কেন, আপনি বলেননি—মানুষের সবচে' বড় সম্পদ ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তসংস্থান।'

'অবশ্যই না। আমি বলেছি, মানুষের সবচে' বড় প্রয়োজন হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ বস্তুসংস্থান।'

'কিন্তু আপনার পেছনে তো লেখা—মানুষের সবচে' বড় সম্পদ—'

'এটা ছিল আমার দ্বিতীয় বাক্য। ওরা ভুলে গেছে, কিন্তু আমি ভুলিনি। মানুষের সবচে' বড় সম্পদ হচ্ছে তার পরিবর্তনশীল মন। আমি কিন্তু ইকোলজির স্বার্থে কম্পিউটারের ওপর মাতব্বরি করিনি, কারণ ইকোলজির দরকার শুধু আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে। আমি কম্পিউটারের ওপর মাতব্বরি করলাম অত্যন্ত দামি একটা মনকে বাঁচাতে, একটা বিচলিত মনকে কাজের মাঝে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমার এই সিদ্ধান্ত। মানুষের জন্যে মানুষ হয়ে থাকতেই এর প্রয়োজন রয়েছে আমাদের—যা কিনা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

মারলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ধারণা, মিস্টার সেক্রেটারি, এই ইন্টারভিউয়ের জন্যেই আমাকে এখানে ডেকেছিলেন আপনি। আপনি চান, এই তথ্যটা আমি সবার কাছে প্রচার করে দিই, তাই না?'

'বলতে পারেন,' বলল অ্যাড্রাসটাস। 'আমার সেই কথাটা শুদ্ধভাবে সবাইকে জানিয়ে দেয়ার জন্যেই এই সুযোগটা নিয়েছি আমি।'

অনুবাদ: শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট প্যাসেশন

গম্ভীর মুখে নিজের ছোট্ট, অপরিসর ল্যাবরেটরিতে বসে আছে ওয়াল্টার সিলস। বেশিরভাগ সময় মুখ গোমড়া করেই থাকে সে। কারণ জীবন তার কাছে নিরানন্দ এবং কঠিন। খুব কষ্টে সৃষ্টে দিন চলছে ওয়াল্টার সিলসের। মাঝে মাঝে আকরিক বিশ্লেষণ-করে আর ক'টা পয়সাই বা মেলে ? অথচ অন্যেরা, যারা বাইরের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজ করছে, তারা সিলসের কয়েকগুণ বেশি অর্থ উপার্জন করে।

জানালা দিয়ে হাডসন নদীর দিকে তাকাল ওয়াল্টার সিলস। পড়ন্ত সূর্যের লাল আবিরে টকটকে নদীর পানি। সিলস ভাবছে তার এবারের গবেষণা ফলপ্রসূ হবে কিনা। যদি হয় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে সে। আর না হলে ? থাক, সে কথা না বলাই ভালো।

ভেজান দরজাটা ক্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ কঁ শব্দে খুলে গেল। উঁকি দিল ওর সদা হাস্যময় সহকারী ইউজেনি টেলর। ওকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করল সিলস। ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ইউজেনি।

'হ্যাল্লো, ওল্ড সোক,' হাসি হাসি মুখে বলল সে। 'চলছে কেমন ?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সিলস। 'তোমার মতো জীবনটাকে সহজ ভাবে দেখতে পারলে বেশ ভালো হত, জেনি। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি কিছুই ভালো চলছে না। আমার টাকার দরকার। আর যত টাকা আমি চাই ততই কম পাই।'

'আমার পকেটও ফাঁকা,' বলল ইউজেনি, 'তাতে কি হয়েছে ? পকেটে পয়সা নেই বলে কি আমি মুখ গোমরা করে থাকি! আপনার পঞ্চাশ চলছে। মাথায় দ্রুত টাক পড়ে যাবার দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে আপনার ভাববার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আমার। আমি ত্রিশে পা দিয়েছি। খামোকা দুশ্চিন্তা করে এই বয়সে আমার সুন্দর বাদামী চুলগুলো হারাতে চাই

না। সে যাক। নতুন আইডিয়ার কি খবর বলুন তো?'

'দেখতে চাও? বেশ চল দেখাচ্ছি।'

সিলসের পেছন পেছন একটা ছোট টেবিলের ধারে চলে এল টেলর। টেবিলের ওপর সারি সারি ছোট টিউব। এর একটার মধ্যে আধ ইঞ্চির মতো চকচকে ধাতব কি একটি পদার্থ রাখা। 'এটাকে সোডিয়াম-মার্কারী মিকশ্চার বা সোডিয়াম অ্যামালগামও বলতে পার,' জিনিসটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল সিলস।

"অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন" লেখা একটা বোতল তুলে নিল সে শেলফ থেকে। খানিকটা ঢালল টিউবে। সাথে সাথে সোডিয়াম অ্যামালগামের চেহারা বদলাতে শুরু করল, রূপান্তর ঘটল স্বপ্নের মতো একটা পদার্থে।

'ওটা,' ওদিকে চোখ রেখে বলল সিলস, 'অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম, অ্যামোনিয়াম র‍্যাডিকাল (NH_4) এখানে ধাতব হিসেবে কাজ করছে, মিশছে পারদের সঙ্গে।'

মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর ঢালল লিকুইড।

'অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম খুব বেশি টেকসই নয়,' জানাল সে টেলরকে। 'কাজেই দ্রুত কাজ করতে হবে।' সে ফেকাসে হলুদ রঙের, সুগন্ধযুক্ত একটা লিকুইডের ফ্লাস্ক হাতে নিল, তারপর ওটা ঢালল টিউবে। কিছুক্ষণ টিউবটা ঝাঁকানর পরে অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পড়ে রইল ছোট্ট ধাতব এক টুকরো লিকুইড।

হাঁ করে টেস্ট-টিউবের দিকে তাকিয়ে রইল টেলর। 'কি হল?'

'এই লিকুইড হল হাইড্রাক্সিন থেকে প্রাপ্ত বস্তু। এ জিনিসই আমার আবিষ্কার। এর নাম দিয়েছি অ্যামোনালিড। এটার ফর্মুলা নিয়ে এখন কাজ করিনি তবে তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হল এটা অ্যামালগাম থেকে আমোনিয়াম গলিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে। টিউবের তলার ওই ড্রপগুলো খাঁটি পারদ। অ্যামোনিয়াম এখন দ্রবীভূত।'

টেলর চুপ করে রইল। সিলস উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছে, 'এর মানে বুঝতে পারছ না? খাঁটি অ্যামোনিয়াম বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গেছি আমি। আমার আগে এ কাজ আর কেউ করে নি! কাজটার সফল সমাপ্তি মানে খ্যাতি, সাফল্য, নোবেল প্রাইজ আরো কত কি!'

'ওয়াও!' এতক্ষণে বুলি ফুটল টেলরের মুখে। 'দেখি তো জিনিসটা।' টিউবের দিকে হাত বাড়াল সে। তাকে বাধা দিল সিলস।

'কাজটা এখন শেষ হয়নি, জেনি। এটার ফ্রি মেটালিক পর্যায় আমাকে যেতে হবে। যখনই অ্যামোনালিডকে অদৃশ্য করে ফেলতে যাই, ভেঙে পড়ে অ্যামোনিয়াম...তবে এ সমস্যার সমাধান আমি করবই!'

হপ্তা দুয়েক পরের ঘটনা। ঘটনাস্থল ওয়াল্টার সিলসের গবেষণাগার। রসায়নবিদ বন্ধুর কাছ থেকে জরুরি ফোন পেয়ে হন্তদন্ত ছুটে এসেছে টেলর। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই জানতে চাইল, 'সমস্যার সমাধান হয়েছে?'

'হয়েছে। যা ভেবেছি তারচে' অনেক বেশি পেয়ে গেছে।' বলল সিলস। 'আসলে শুরুতে ভুল পদ্ধতিতে কাজ করেছি। দ্রাবকটাকে গরম করে নিতাম আমি। ফলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়াম সব সময় ভেঙে যেত। এবার ফ্রিজিং পদ্ধতিতে ওটাকে আলাদা করে নিয়েছি। লবণ জারণ করার মতো ঘটনাটা ঘটেছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে ওটা বরফে পরিণত হয়েছে। ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেই ফ্রিজ হয়েছে অ্যামোনালিড।'

ছোট একটি বীকারে (রাসায়নিক কাজে ব্যবহৃত কাঁচের পাত্র) দিকে আঙুল তুলে দেখান সে নাটকীয় ভঙ্গিতে। একটা কাঁচের কেসের মধ্যে বীকারটা। বীকারের মধ্যে ম্লান, হলদে রঙের, সূঁচের মতো ক্রিস্টাল। ক্রিস্টালের ডগায় হলুদ রঙের পাতলা একটা আস্তরণ।

'কেস কেন?' জিজ্ঞেস করল টেলর।

'অ্যামোনিয়াম ঠিক রাখতে আর্গন (বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস) ভরতে হয়েছে আমাকে। গ্যাসটা খুবই কাজের।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকাল টেলর, খুশি মনে পিঠ চাপড়ে দিল।

'দাঁড়াও, জেনি। আরো আছে।'

টেলরকে ঘরের আরেক প্রান্তে নিয়ে গেল সিলস। কাঁপা আঙুলে আরেকটি এয়ার টাইট কেস দেখাল। ওতে এক হলুদ রঙের ধাতু তীব্র আলোক ছটা নিয়ে ঝলসাচ্ছে।

'বন্ধু, ওটা হল অ্যামোনিয়াম অক্সাইড ($NH4O_2$) ওটা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয়। ওটাকে দিয়ে সহজে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা যায়। তবে জিনিসটাকে

সোনার মতো দেখাচ্ছে, তাই না ? এটার সম্ভাব্যতা দেখতে পাচ্ছ তুমি ?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি ?' বিস্ফোরিত হল টেলর। 'আরে এ জিনিসে সারা দেশ ভরে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনি এ দিয়ে অ্যামোনিয়াম গহনা, অ্যামোনিয়াম প্লেটের টেবল-ওয়্যার সহ আরো কত শত জিনিস যে বানাতে পারবেন। তা ছাড়া এ দিয়ে শিল্প কারখানায় আর কত কাজে যে লাগতে পারে তা কে জানে ? আপনি বড়লোক হয়ে গেছেন, ওয়াল্ট, বড়লোক!'

'আমরা বড়লোক হয়ে গেছি,' তাকে শুধরে দিল সিলস। টেলিফোনের দিকে পা বাড়াল। 'সংবাদপত্রগুলোকে এ যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্পর্কে জানিয়ে দেব।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আরো ক'টা দিন গোপন রাখলে ভালো হত, ওয়াল্ট, ।' কপালে ভাঁজ পড়েছে টেলরের।

'আরে, আমি ওদেরকে স্রেফ সাধারণ-একটা আইডিয়ার কথা জানাব। তাছাড়া আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। কারণ প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটা এ মুহূর্তে ওয়াশিংটনে।'

সিলস ভেবেছিল কোনো ঝামেলা হবে না। কিন্তু বড় ধরনের ঝামেলা হয়ে গেল। পরবর্তী দুটো দিন ওদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল।

অ্যাকমে ক্রোমিয়াম অ্যান্ড সিলভার প্লেটিং কর্পোরেশনের অত্যন্ত বদমেজাজী মালিক শিল্পপতি জে. থ্রগমর্টন ব্যাঙ্কহেড সকালে নাস্তার টেবিলে বসে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছিল আর খবরের কাগজে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক শিল্পপতির খবর পড়ে তার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছিল। রেগে গেলে তাঁর মুখ লাল হয়ে ওঠে, বেড়ে যায় প্রেসার। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পপতির চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে গিয়ে নয়, তার প্রেসার মাথায় উঠে গেল আরেকটি খবর পড়ে। খবরটির শিরোনাম এরকম : "পণ্ডিত রসায়নিবিদের সোনার বিকল্প আবিষ্কার।" ব্রেড গিলে মাত্র ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিয়েছে থ্রগমর্টন, খবরটা দেখে কফিটা তার হাতেই রয়ে গেল, মুখে তোলা হল না। সে দ্রুত পড়ে ফেলল খবরটা : "এই নতুন ধাতুটি," লেখা হয়েছে, "সম্পর্কে এর আবিষ্কর্তা বলছেন এটি ক্রোমিয়াম, নিকেল বা সিলভারের চেয়েও উন্নত এবং এই ধাতু দিয়ে তৈরি গহনার মূল্যও পড়বে অনেক কম।'

এ পর্যন্ত পড়েই থেমে গেল জে. গ্রগমর্টন। কল্পনায় দেখতে পেল নুতন ধাতুর কাছে মার খেয়েছে তার ক্রোমিয়াম এবং সিলভার, ধ্বংস হয়ে গেছে তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য। সাথে সাথে প্রেসার উঠে গেল গ্রগমর্টনের। হাত কাঁপতে শুরু করল। কাঁপা হাতে ধরা কফির কাপ থেকে গরম কফি চলকে পড়ল উরুতে। 'আউ!' করে উঠল গ্রগমর্টন। একই সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিল কফির কাপ। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল ওটা। তার স্ত্রী ভয়ানক আতঙ্কে উঠল। 'কি হয়েছে, জোসেফ? কি হয়েছে?' বলতে বলতে এগিয়ে এল সে।

'কিছু হয়নি,' খেঁকিয়ে উঠল গ্রগমর্টন। 'এখান থেকে যাও তুমি।'

বলে নিজেই উঠে দাঁড়াল, ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর তার স্ত্রী ভাঙা কফির কাপের দিকে নজর না দিয়ে পত্রিকায় চোখ বুলাতে লাগল। হন্যে হয়ে খুঁজছে সেই খবর যা তার বদরাগী স্বামীকে ভয়ানক রাগিয়ে দিয়েছে।

ফিফটিনথ স্ট্রিট-এ "বব'স ট্যাভার্ন"-এ প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান পিটার কিউ হর্নসওগল বরাবরের মতো উজির-নাজির মারছিল। কংগ্রেসে থাকাকালীন সে কি কি মহাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারই বানান গপপো। কয়েকজন আগ্রহ নিয়ে শুনছে তার গল্প। বার-টেণ্ডারের হাতে খবরের কাগজ। তবে পড়ছে না সে। হাঁ করে গল্প শুনছে। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ কাগজের বিশেষ একটা খবরের দিকে নজর আটকে গেল হর্নসওগলের। এ খবরটাই উত্তেজিত করে তুলে দিল শিল্পপতি জে. গ্রগমর্টনকে। পিটারও খবরটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে তার শ্রোতাদের দিকে ফিরে বলল, 'বন্ধুগণ, সিটি হল-এ খুব জরুরি একটা কাজ আছে আমার। এক্ষুণি যেতে হবে সেখানে।' সে বার-কিপারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার কাছে ২৫ সেন্ট হবে, ভায়া? আমার মানিব্যাগটা আবার মেয়রের অফিসে ফেলে এসেছি ভুলে। কাল টাকাটা দিয়ে দেব।'

শত হলেও প্রাক্তন কংগ্রেস ম্যান! মানিব্যাগ ভুল করে কোথাও ফেলে রেখে আসতেই পারে। বারম্যান পঁচিশ সেন্ট দিল পিটারকে। টাকাটা চট করে পকেটে পুরে বার থেকে বেরিয়ে এল পিটার কিউ হর্নসওগল।

ফার্স্ট এভিন্যুর ঘিঞ্জি কোনো এলাকার ছোট, স্বল্পালোকিত একটি ঘর।

মাইকেল ম্যাগুয়ের, পুলিশের খাতায় যার পরিচিতি মাইক দ্য স্লাগ নামে? সে তার রিভলভার পরিষ্কার করতে করতে একটি গানের সুর ভাঁজছিল। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল মাইকেল।

'স্ল্যাপি নাকি?'

'হ, বস।' ভেতরে ঢুকল বেঁটেখাঁটো, হাড়গিলে চেহারার রোগা-পাতলা এক লোক। 'আপনের লাইগ্যা খবরের কাগজ আনছি। পুলিশ অহনো ভাবতাছে হেইদিনকার কামডা ব্রাগোনিই ঘটাইছে।'

'তাই নাকি? বেশ বেশ।' নিজের রিভলভারের ওপর ঝুঁকে পড়ল মাইকেল। 'আর কিছু?'

'না। এক মহিলা আত্মহত্যা করছে। এই নেন। পড়েন।'

মাইকেলকে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল স্ল্যাপি। মাইক বিরস বদনে কাগজের পাতা ওলটাতে লাগল।

একটি খবরের হেডলাইনে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ছোট্ট খবর। আগ্রহ নিয়ে পড়ল মাইক। পড়া শেষ করে ফেলে দিল কাগজ। সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করল। তারপর দরজা খুলে ডাকল, 'অ্যাই, স্ল্যাপি। শুনে যাও। তোমার জন্যে একটা কাজ আছে।'

বেশ খুশি খুশি লাগছে ওয়াল্টার সিলসকে। ল্যাবরেটরিতে দ্রুত পায়ে হাঁটছে। নিজেকে রাজার মতো লাগছে। ইউজেনি টেলর বসে আছে। দেখছে ওকে। তাকে তেমন উৎফুল্ল মনে হচ্ছে না।

'বিখ্যাত হতে কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল টেলর সিলসকে।

'মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পারলে যেমন লাগবে তেমন লাগছে। মিলিয়ন ডলারেই অ্যামোনিয়াম মেটাল-এর রহস্য বিক্রি করে দেব স্থির করেছি। ঈগল স্টিল-এর স্টাপলস-এর সঙ্গে কথা হবে আজ। ভালো দাম দেবে বলেছে।'

বেজে উঠল ডোর বেল। বেলের শব্দে লাফিয়ে উঠল সিলস, দৌড়ে গিয়ে খুলল দরজা।

'এটা কি ওয়াল্টার সিলস-এর বাড়ি?' ঘোঁত ঘোঁত করে জানতে চাইল লম্বা, চওড়া এক লোক। অবজ্ঞার দৃষ্টি চোখে।

'জ্বী। আমিই সিলস। আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'হ্যাঁ। আমার নাম জে. থ্রগমর্টন বাঙ্কহেড। আমি অ্যাকমে ক্রোমিয়াম অ্যান্ড সিলভার প্লেটিং কর্পোরেশনের মালিক। আপনার সাথে কথা আছে।'

'ভেতরে আসুন! ভেতরে আসুন! ইনি ইউজেনি টেলর। আমার সহকারী। ওর সামনেই যা বলার বলতে পারেন।'

'বেশ,' বিশাল শরীর ধপ করে একটা চেয়ারে বসল থ্রগমর্টন। 'আমার আগমনের কারণ বোধহয় অনুমান করতে পারছেন।'

'আমার নতুন অ্যামোনিয়াম মেটালের খবরটা শুনেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি দেখতে এসেছি ব্যাপারটা সত্যি কিনা। সত্যি হলে আপনার আবিষ্কার আমি কিনে নিতে চাই।'

'সত্যি না মিথ্যা নিজেই যাচাই করে দেখুন, স্যার,' সিলস বিজনেস ম্যাগনেটকে নিয়ে আর্গন ভর্তি কন্টেনারের সামনে নিয়ে গেল। ওতে খাঁটি অ্যামোনিয়াম ধাতুর কয়েক গ্রাম পড়ে আছে।

'ওই যে ধাতুটা। ডান দিকে তাকান। ওটা অক্সাইড। এমন অক্সাইড যা নিজের বৈশিষ্টকে ছাড়িয়ে গিয়ে অনেক বেশি ধাতব হয়ে উঠেছে। এই অক্সাইডকেই কাগজঅলারা নাম দিয়েছে বিকল্প সোনা।'

বিতৃষ্ণা নিয়ে অক্সাইড দেখল থ্রগমর্টন ব্যাঙ্কহেড। বলল, 'ওটা বাইরে আনুন। ভালো করে দেখি।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল সিলস। 'তা সম্ভব নয়, মিস্টার বাঙ্কহেড। ওগুলো প্রথম অ্যামোনিয়ামের স্যাম্পল। ওগুলো মিউজিয়াম পিস। সংরক্ষণের জন্যে। চাইলে আপনার জন্যে কিছু বানিয়ে দিতে পারি।'

'এ থেকে টাকা পেতে চাইলে কাজটা তো করতেই হবে,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল বাঙ্কহেড। 'আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আপনার প্যাটেন্ট আমি এক হাজার ডলারে কিনে নিতে রাজি।'

'এক হাজার ডলার!' এক সঙ্গে বলে উঠল সিলস এবং টেলর।

'যথেষ্ট ভালো দাম বলা হয়েছে, ভদ্র মহোদয়গণ।'

'ওর দাম মিলিয়ন ডলারেরও বেশি,' রাগে গরগর করে উঠল টেলর। 'এটা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। একটা সোনার খনি।'

এক মিলিয়ন। আপনারা আসলে স্বপ্ন দেখছেন, ভদ্র মহোদয়গণ। সত্যি

বলতে কি আমার কোম্পানি অ্যামোনিয়ামের ওপর কয়েক বছর ধরে গবেষণা করে আসছে। সমস্যাটার সমাধান প্রায় করে এনেছি আমরা। তার আগেই দুর্ভাগ্যবশত এ জিনিস আপনারা আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই আপনাদের পেটেন্ট আমি কিনে নিতে চাই। আপনারা বিক্রি করতে না চাইলে আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ধাতুটা বাজারজাত করব।'

'করেই দেখুন। স্রেফ মামলা ঠুকে দেব,' হুমকি দিল টেলর।

'দীর্ঘদিন মামলার চালানর মতো ক্ষমতা পকেটে আছে তো?' খ্যাকখ্যাক হাসল বাঙ্কহেড। 'আমার আছে। তবে আমি একেবারে অবিবেচক নই। দামটা আরো এক হাজার বাড়িয়ে দিতে পারি।'

'আমাদের দামের কথা তো শুনেছেনই,' পাথর গলায় বলল টেলর, 'এর বেশি কিছু আমাদের বলার নেই।'

'ঠিক আছে, ভদ্রমহোদয়গণ,' দরজার দিকে পা বাড়াল বাঙ্কহেড। 'বিষয়টি নিয়ে আবার ভেবে দেখতে বলছি। আপনারা আমার কথাই শেষে মেনে নেবেন এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

দরজা খুলল বাঙ্কহেড। মুখোমুখি হয়ে গেল প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য পিটার কিউ হর্নসওগলের। সে দরজার কি-হোলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফট করে দরজা খুলে যেতে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। বাঙ্কহেড তার দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকাল, তারপর গটগট করে চলে গেল। সাথে সাথে ভেতরে ঢুকে পড়ল হর্নসওগল। বন্ধ করে দিল দরজা। তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সিলস এবং টেলর।

বাঙ্কহেডের গমন পথের দিকে আঙুল তুলে দেখাল হর্নসওগল। 'ওই লোকটা, ডিয়ার স্যার, প্রচণ্ড ধনী একজন মানুষ। তবে এদেশের অর্থনীতিরও বারোটা বাজাচ্ছে লোকটা। ওই লোকের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন আপনারা।' বুকে হাত বেঁধে মিষ্টি করে হাসল সে ওদের দিকে তাকিয়ে।

'আপনি কে?' বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল টেলর।

'আমি?' ওদের চেয়েও বেশি অবাক হয়েছে হর্নসওগল। 'কেন, আমি ইয়ে পিটার কুইনটাস হর্নসওগল। আমাকে আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন। আমি গত বছরও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এ ছিলাম।'

'আপনার নাম কখনো শুনিনি। কি চান?'

'খবরের কাগজে আপনাদের আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে ছুটে এসেছি সাহায্যের জন্যে।'

'কিসের সাহায্য ?'

'আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাই, স্যার। আপনারা তো আর বাইরের জগতটাকে ভালো চেনেন না। নতুন আবিষ্কার আপনাদের অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। বাঙ্কহেডের মতো বহু ধুরন্ধর মানুষ ওঁৎ পেতে আছে আপনাদের আবিষ্কার হাতিয়ে নেয়ার জন্যে। আমি বাইরের পৃথিবীটাকে ভালো চিনি। এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আছে প্রচুর। আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব। যেমন—'

'কোনো প্রয়োজন নেই,' ততক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল সিলস, উঠে দাঁড়াল। 'বেরিয়ে যান! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ? পুলিশ ডাকার আগে এখান থেকে কেটে পড়ুন।'

'প্রফেসর সিলস, দয়া করে উত্তেজিত হবেন না।' সিলসের রাগী চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য। দরজার দিকে পা বাড়াল। টেলর খুলে দিল দরজা। হর্নসওগল চৌকাঠের বাইরে পা রাখা মাত্র দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল টেলর।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সিলস। 'এখন কি করব, জেনি ? লোকটা মাত্র দু'হাজার ডলার নিয়ে সাধল। অথচ এক হপ্তা আগেও আমি কত স্বপ্ন দেখেছি—'

'ভুলে যান। ব্যাটা ব্লাফ দিচ্ছে। শুনুন, আমি স্টাপলসকে খবর দিচ্ছি। আমাদের প্রত্যাশিত দামেই পেটেন্ট বিক্রি করে দিতে পারব বলে আশা করি। আর বাঙ্কহেড যদি কোনো ঝামেলা করে তো—যাক, সেটা স্টাপলসের মাথা ব্যথা।' সিলসের কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'আমাদের ঝামেলা কিন্তু মিটে গেছে।'

ভুল। টেলর জানে না তাদের ঝামেলা মাত্র শুরু হয়েছে।

ওয়াল্টার সিলস-এর বাড়ির রাস্তার ও পাশে রোগা-পাতলা, বেঁটে একটা লোক বাড়িটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ হলো মাইক দ্য স্লাগের সাগরেদ স্ল্যাপি। বাড়িতে ঢোকার রাস্তা খুঁজছে সে। কি ভাবে ঢোকা যায় তার প্ল্যান করছে।

ও বাড়িতে ঢোকার চিন্তা করছে আরো দু'জন—বাঙ্কহেড এবং হর্নসওগল। সিলস-এর আবিষ্কারের ফর্মুলা চুরি করার বদ মতলব তাদেরও। তবে বাঙ্কহেড ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে তার এক সোর্সের সাথে কথা বলেছে। এখন শুধু ঘটনা ঘটার অপেক্ষা।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠল ওয়াল্টার সিলস। নিচে কিসের যেন শব্দ হল না? কনুই দিয়ে গুঁতো মারল সে টেলরকে।

'জেনি! জেনি! ওঠ!'

'অ্যাঁ,' গুঁতো খেয়ে জেগে গেল ইউজেনি টেলর। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। 'কি হয়েছে?কেন রাত দুপুরে খোঁচাখুচি—'

'চুপ কর। কান পেতে শোনো। কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

'কি শুনব? খামোকা কেন যে বিরক্ত করেন!'

সিলস ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল। চুপ হয়ে গেল অপরজন। নিচে, ল্যাবরেটরি থেকে খচমচ শব্দ আসছে।

টেললের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, ঘুম মুহূর্তে উধাও। 'চোর!' ফিসফিস করে বলল সে।

চুপি সারে বিছানা থেকে নেমে পড়ল দু'জনে, বাথরোব পেঁচিয়ে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে পা টিপেটিপে এগোল দরজার দিকে। টেলরের একটি রিভলভার ছিল। ওটা নিয়ে আগে আগে সে চলল। নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

মাত্র অর্ধেক সিঁড়ি বেয়েছে, হঠাৎ কে যেন বিকট আর্তনাদ করে উঠল নিচে। পরক্ষণে ধুপধাপ, দুড়ুম দাড়ুম শব্দ। কয়েক সেকেন্ড এরকম চলল। তারপর কাঁচ ভাঙার শব্দ শোনা গেল।

'আমার অ্যামোনিয়াম।' আঁতকে উঠল সিলস। টেলর বাধা দেয়ার আগেই তীর বেগে ছুটল সে।

ঝড়ের বেগে ল্যাবে ঢুকে পড়ল সিলস। পেছন পেছন তার সহকারী। আলো জ্বালল। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ঝলসে গেল ঘরের দুই আগন্তুকের। তারা মেঝেতে শুয়ে কুস্তি লড়ছিল। আলো জ্বলে উঠতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পরস্পরের কাছ থেকে।

টেলর তাদের দিকে বন্দুক তাক করে বলল, 'কাজটা মোটেই ভালো হচ্ছে না।'

একজন সিধে হল মেঝে থেকে। বীকার আর ফ্লাক্সের ভাঙা কাঁচের গুঁড়ো গড়িয়ে পড়ল গা থেকে। লোকটা কব্জি কেটে গেছে। হাত চেপে ধরে আছে। এ পিটার কিউ হর্নসওগল।

রিভলভারের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'কোনো সন্দেহ নেই পুরো ঘটনাই রহস্যময়। তবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিতে পারি আমি। দেখতেই পাচ্ছেন, এমন দুর্যোগ সয়েও আপনাদের কাছে আবার এসেছি আমার প্রস্তাবটা নিয়ে।'

'জানতাম আপনাদের ওপর কার কার বদনজর আছে। তাই আপনাদের বাড়ির ওপর আজ রাতে সতর্ক নজর রাখার সিদ্ধান্তে নিই আমি। কিন্তু সতর্ক হয়ে উঠে এই কাপুরুষ ব্যাটাকে দেখে।' নাক ভোঁতা, নোংরা চেহারার লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে। হতভম্ব হয়ে বসে আছে সে এখন মেঝেতে। 'জানালা দিয়ে চোরের মতো ভেতরে ঢুকছিল ব্যাটা।'

'আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রিমিনালটাকে অনুসরণ করতে থাকি। উদ্দেশ্য আপনাদের মহামূল্যবান আবিষ্কার রক্ষা করা। তারপর ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বুঝতেই পারছেন আপনাদের ব্যাপারে আমি কত সিরিয়াস?'

বিদ্রুপের হাসি ঠোঁটে শুকিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের গল্প শুনছিল টেলর। বলল, 'বেশ গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারেন তাই না, মিস্টার কিউ?'

মেঝেতে শুয়ে থাকা চোরটা এবার জোর গলায় বলে উঠল, 'সত্যি ওস্তাদ। এই ভোটকুটা খামোকা আমার ওপর হামলা চালাইছে। আমার কোনো দোষ নাই, ওস্তাদ। আমি খালি হুকুম তামিল করতেছিলাম। আমারে এক লোক ভাড়া করছে। কারো ওপর হামলা করার নিয়ত আমার নেই... ওস্তাদ... এই লোক খালি খালি...'

'চোপ, মিথ্যাবাদী!' গর্জে উঠল হর্নসওগল। 'চোরের মা'র বড় গলা!'

'আপনারা দু'জনেই চুপ করুন,' ভীতিকর ভঙ্গিতে হাতের অস্ত্রটা নাচাল টেলর। 'আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। তাদেরকে আপনাদের গল্প শোনান গে। ভালো কথা, প্রফেসর, সব ঠিক আছে তো?'

'মনে হয়।' গবেষণাগারের ওপর চোখ বোলান শেষ সিলসের।

'খালি কাঁচের ভাস ভেঙেছে ওরা। এ ছাড়া সব ঠিক আছে।'

'বেশ।' বলল টেলর। তারপর কি যেন দেখে ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলল।

হলওয়ে থেকে ভেতরে ঢুকছে রিভলভার হাতে এক লোক। মাথার হ্যাট চোখের ওপর ফেলা। সে টেলরের দিকে অস্ত্রটা তাক করে খেঁকিয়ে উঠল, 'ফেলে দাও ওটা!'

যন্ত্রচালিতের মতো অস্ত্রটা হাত থেকে পড়ে গেল টেলরের। আগন্তুক ঘরের চার মূর্তির দিকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'বেশ! আরো দু'জন আমার ওপর বাটপারি করতে চেয়েছে অ্যাঁ? আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি মজা।'

সিলস এবং টেলর হাঁ করে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে, হর্নসওগলের দাঁত কপাটি লেগে গেছে। চোরটা ভীত ভঙ্গিতে পিছু হঠতে হঠতে বলল, 'খাইছে। এইডা দেহি মাইক দ্য স্লাগ।'

'হ্যাঁ,' ধমকের সুরে বলল মাইক। 'আমিই মাইক দা স্লাগ। অনেকেই আমাকে চেনে। এবং তারা জানে রিভলভারের ট্রিগার টেপার জন্যে আমার হাতের আঙুল সব সময় নিশপিশ করতে থাকে। এই যে টাকু প্রফেসর, এদিকে আসুন। কি সব নকল সোনা-টোনা বানিয়েছেন। আমি পাঁচ গোনার আগেই ওটা দিয়ে দিন।'

ঘরের কোণার দিকে আস্তে আস্তে এগোল সিলস। মাইক তাকে যাবার রাস্তা করে দিতে পেছনে সরতেই ধাক্কা খেল একটা শেলফের সঙ্গে। সোডিয়াম সালফেট সল্যুশনের ছোট একটা কাঁচের বোতল নিচে পড়ে ভেঙে চুর চুর হয়ে গেল।

আঁতকে উঠল সিলস। 'মাইগড। সাবধান! এটা নাইট্রোগ্লিসারিন।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র লাফ দিল মাইক। আর এ সুযোগটা কাজে লাগাল টেলর। ফ্লাইং কিক মেরে বসল মাইককে। একই সময়ে সিলস এগোল টেলরের অস্ত্র দিয়ে বাকি দু'জনকে কভার করতে। তবে তার দরকার ছিল না। মাইক দ্য স্লাগকে দেখে ইতোমধ্যে দু'জনেই খোলা জানালা দিয়ে কেটে পড়েছে।

ওদিকে টেলর এবং মাইক দ্য স্লাগ পরস্পরকে কুস্তির প্যাঁচে আটকে জড়াজড়ি করে চলেছে ল্যাবের মেঝেতে। আর পিস্তল হাতে সিলস লাফাচ্ছে। তাগ করার চেষ্টা করছে। সুযোগ পেলেই গ্যাংস্টারটার কপাল ফুটো করে দেবে।

কিন্তু সে সুযোগ এল না। মাইক হঠাৎ টেলরের থুতনিতে দড়াম করে এক ঘুষি মেরে মুক্ত করে নিল নিজেকে। তারপর দৌড় দিল। ভয়ংকর চিৎকার করে সিলস তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু লাগল না গুলি। অক্ষত শরীরে পালিয়ে গেল মাইক। সিলস গুণ্ডাসর্দারের পিছু নেয়া সমীচীন মনে করল না। নজর দিল ঘুষি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সহকারীর দিকে।

ঠাণ্ডা পানির ছিটা মেরে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল টেলরের। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে বসল টেলর। চারপাশের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'ওয়াও! একটা রাত গেল বটে!'

গুঙিয়ে উঠল সিলস। 'এখন কি করব, জেনি? এখন দেখছি আমাদের প্রাণ নিয়ে টানটানি। স্বপ্নেও ভাবিনি চোরের হামলা হবে আমার বাড়িতে। আসলে খবরের কাগজে আবিষ্কার সম্পর্কে কথা বলাই উচিত হয়নি।'

'যা হয়েছে হয়েছে। অথচ এ নিয়ে কান্নাকাটি করে লাভ নেই। এখন আমাদের দরকার চমৎকার একটা ঘুম। চোরগুলো আজ রাতে আর আসবে না। কাল আপনি ব্যাংকে গিয়ে কাগজপত্রগুলো ভোল্টে রেখে আসবেন। স্ট্যাপলস বিকেল তিনটার সময় আসবে। তখন ওর সঙ্গে কথা বলব। তারপর আর কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

চেহারা করুণ করে বলল সিলস, 'অ্যামোনিয়াম বড় ঝামেলার বিষয়। এটা নিয়ে গবেষণা করাই উচিত হয়নি আমার। এরচে' আকরিক নিয়ে গবেষণা অনেক ভালো ছিল।'

ব্যাংকে এসেছে ওয়াল্টার সিলস। রাস্তার পাশেই ব্যাংক। রিভলভিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে, দু'জন লোক ওর রাস্তা আটকে দাঁড়াল। একজন শক্ত কি একটা ঠেসে ধরল বুকে, পাঁজরে লাগল খুব। "আঁক" করে উঠল সিলস। বরফ ঠাণ্ডা একটা কণ্ঠ ফিসফিস করে কানের পাশে, 'আস্তে, টাকু। কাল রাতে আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন চিৎকার করলে তা এখন কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দেব।'

ভয়ে কেঁপে উঠল সিলস। স্থির হয়ে গেল। মাইক দ্য স্লাগের কণ্ঠ চিনতে পেরেছে।

'ফর্মূলাটা কই ?' জিজ্ঞেস করল মাইক। 'জলদি বের করুন।'

'জ্যাকেটের পকেটে', কাঁপা গলায় বলল সিলস।

মাইকের সঙ্গী হাত ঢুকিয়ে দিল সিলসের জ্যাকেটে। বের করে আনল এক তাড়া ফুল স্কেপ কাগজ।

'এইডা, মাইক ?'

মাথা ঝাঁকাল গুণ্ডা সর্দার। 'হ্যাঁ। সে জিনিসের খোঁজে এসেছি তা পেয়ে গেছি। ঠিক আছে টাকু। আপনি এখন যেতে পারেন।'

সিলসকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিল দুই গুণ্ডা। তারপর ঝটপট তাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে। ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সিলস। কয়েকটি সদয় হাত এগিয়ে এল তাকে উঠতে সাহায্য করতে।

'ঠিক আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সিলস। 'আমি একাই উঠতে পারব।'

সিদে হল প্রফেসর। টলতে টলতে ব্যাঙ্কে ঢুকল সিলস। এবারের মতো জানে বেঁচে গেছে বলে সৃষ্টিকর্তার কাছে শোকর আদায় করল। তবে ওর আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কারণ টেলর আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল ওকে।

'যাক যা হবার হয়ে গেছে', এরকম একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল সিলস। খুলল মাথার টুপি। টাকের সাথে বাঁধা স্যুইট ব্যান্ডের নিচ থেকে কতগুলো কাগজ বের করল। পাঁচ মিনিট লাগল কাগজগুলো ভল্টে জমা দিতে। ইস্পাতের দরজাটা বন্ধ হতে নিশ্চিন্ত বোধ করল সে।

বাড়ি ফেরার পথে গুণ্ডাদের কথা ভাবছিল সিলস। মনে মনে বলল, 'ওরা ওই ফর্মূলা অনুসারে কাজ করতে গেলেই সেরেছে। ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের শিকার হবে গুণ্ডাগুলো।'

বাড়ি এসে দেখে গেটের সামনে জনা তিনেক পুলিশ অলস ভঙ্গিতে পায়চারী করছে।

'পুলিশ প্রহরা,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল টেলর। 'গত রাতের মতো আর ঝামেলা পোহাতে হবে না।'

সিলস রাস্তার ঘটনাটা জানাল তার সহকারীকে। মুখ অন্ধকার করে গল্পটা শুনল টেলর। তারপর বলল, 'তবে ওরা আর কিছুই করতে পারবে না। স্ট্যাপলস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চলে আসছে। এতক্ষণ পুলিশ তো থাকছেই। তারপর,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'সমস্ত দায়দায়িত্ব স্টাপলসের।'

'শোনো জেনি,' বলল রসায়নবিদ, 'অ্যামোনিয়াম নিয়ে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। এখন ওটার গিলটি করার ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আর এটাই সবচে জরুরি বিষয়। স্ট্যাপলস এল আর ওদিকে দেখলাম জিনিসটা থেকে কিছুই পাইনি আমরা। তখন খুবই বাজে হবে ব্যাপারটা।'

'হুমম,' থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলল টেলর, 'ঠিকই বলেছেন। তবে স্ট্যাপলস আসার আগে কিছু একটা গিলটি করে ফেলি আমরা। যেমন ধরুন চামচ বা এরকম কিছু একটা।'

দুপুরের খাওয়া সেরে কাজে লেগে গেল ওরা। বেশ কিছু জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে। একটি আয়তাকার টবের মধ্যে অ্যামোনালিনের সল্যুশন রয়েছে। ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পুরান একটা চামচ আর অ্যানোড হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম। তিনটি ব্যাটারি বিদ্যুৎ প্রবাহের কাজ চালাবে।

উৎসাহের সাথে ব্যাখ্যা করছে সিলস, 'সাধারণ তামার গিলটির মতো একই নিয়মে এটা কাজ করবে। অ্যামোনিয়াম আইওন বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে ক্যাথডের প্রতি আকর্ষিত হবে, আর ক্যাথোড হল চামচ। সাধারণ ক্ষেত্রে এটা ভেঙে যেত। কিন্তু অ্যামোনালিনে দ্রবীভূত হবার সময় এটার ক্ষেত্রে তা ঘটবে না। অ্যামোনালিন খুবই সামান্য আয়নাইজড করা হয়েছে আর অক্সিজেন নির্গত হচ্ছে অ্যানোডের প্রতি।'

'তবে এটা হল থিওরী, প্র্যাকটিস কি বলে সেটা এখন দেখার বিষয়।'

চাবি ঘোরাল সিলস, শ্বাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল টেলর। কিন্তু একমুহূর্ত কিছুই ঘটল না। হতাশ দেখাল টেলরকে। এমন সময় তার কনুই খামচে ধরল সিলস। 'দ্যাখো।' হিসিয়ে উঠল সে, 'অ্যানোডের দিকে তাকাও।'

স্পঞ্জের মতো অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম থেকে বাবল গ্যাস বেরুতে

শুরু করেছে। চামচটার দিকে তাকাল ওরা। ওটার রং বদলাচ্ছে। রূপোলি রংটা ধীরে ধীরে তার উজ্জ্বল্য হারাচ্ছে। আস্তে আস্তে হলুদ একটা আস্তরণ ফুটে উঠছে চামচের গায়ে। মিনিট পনেরো প্রবাহিত হল বিদ্যুৎ, তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সার্কিট খুলে ফেলল সিলস।

'দারুণভাবে গিলটি করেছে,' বলল সে।

'বেশ। জিনিসটা বের করে আনুন। দেখি একবার।'

'কি?' অবাক হল সিলস। 'বের করে আনব? ওটা খাঁটি অ্যামোনিয়াম। বাইরে আনলে বাতাসের সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প শুকিয়ে যাবে। তা করা যাবে না।'

সে টেবিলে মোটাসোটা একটা যন্ত্র রাখল। 'এটা,' বলল সিলস। 'একটা কমপ্রেসড-এয়ার কন্টেনার। আমি এটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ড্রায়ার্সের মধ্যে চালিয়ে দেব। তখন শুকনো অক্সিজেন বাবল-এ পরিণত হবে ও দ্রবীভূত হয়ে যাবে।'

সে কন্টেনারের নাক চামচের নিচে, সল্যুশনে ঢুকিয়ে দিল। চালু হয়ে গেল মেশিন। বইতে লাগল বাতাস। যাদুর মতো কাজ হল। বিদ্যুৎ গতিতে হলদে গিলটি আরো চকচকে এবং ঝলমলে হয়ে উঠল।

ঢিব ঢিব বুকে দৃশ্যটা দেখছে ওরা, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। বাতাসের প্রবাহ বন্ধ করে দিল সিলস। আশ্চর্য চামটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। মুখে রা নেই।

টেলর ফিসফিস করে বলল, 'ওটা বের করুন। বের করে আনুন! মাই গড!—এ্যাতো সুন্দর!'

সিলস পা বাড়াল চামচের দিকে, ফরসেপ দিয়ে ধরল ওটাকে, তরল পদার্থ থেকে বের করে আনল।

তারপর যা ঘটল তার বর্ণনা দেয়া মুশকিল। পরে পত্রিকার সাথে সাক্ষ্যাৎকারেও টেলর বা সিলস কেউই আসলে কি ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

যা ঘটল তা হল—চামচটাকে মুক্ত বাতাসে নিয়ে আসা মাত্র বিকট একটা গন্ধে দূষিত হয়ে উঠল ঘর। এমন বিশ্রী পচা এবং বীভৎস সেই গন্ধ যার কাছে নরকের ভয়ঙ্করতম দুর্গন্ধ কিছু না।

গন্ধের ধাক্কায় শ্বাস বন্ধ হয়ে এলে প্রফেসরের। আঁতকে উঠে চামচটা ফেলে দিল সে। দুজনেই বেধম কাশতে শুরু করল, চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে থাকল। সেই সাথে একটানা চলছে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো।

তীরবেগে চামচটার দিকে ছুটে গেল টেলর। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ওদিকে প্রতি সেকেন্ডে দুঃস্বপ্নের মতো গন্ধটা বেড়েই চলেছে। এই মুহূর্তে করনীয় একটাই ছিল। সেই কাজটাই করল সিলস। চামচটাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। টোয়েল্বথ এ্যাভিনিউর মাঝখানে, এক পুলিশের গায়ে পড়ল চামচটা। গ্রাহ্য করল না প্রফেসর।

'তোমার জামা খুলে ফেল,' কাশতে কাশতে সহকারীকে বলল সিলস।

'পুড়িয়ে ফেল। তারপর শক্তিশালী কিছু একটা স্প্রে করে দাও ল্যাবে। সালফার পোড়াও। কিংবা লিকুইড ব্রোমাইন নিয়ে এস। যা খুশি কর। জলদি!'

ওরা পাগলের মতো জামা কাপড় খুলছে, এমন সময় টের পেল খোলা দরজা দিয়ে কেউ ঢুকে পড়েছে ভেতরে। এ স্ট্যাপলস। ইস্পাত রাজা বলা হয় তাকে। দরজা খোলা পেয়ে বেশ ভারিক্কি ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকল সে।

কিন্তু ঘরে পা দেয়া মাত্র তার গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্যের কথা বেমালুম ভুলে গেল স্ট্যাপলস। বিকট গন্ধটার প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দিশেহারা বোধ করল সে। পরের মুহূর্তে পড়ি মরি করে দৌড়াল রাস্তায়। টোয়েল্ভথ এ্যাভিন্যুর পথচারীরা অবাক হয়ে দেখল সুবেশী, ছয় ফুট লম্বা, দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে রাস্তা দিয়ে। সেই সাথে পাগলের মতো নিজের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলছে।

ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত চামচটার ভীতিকর কার্যকলাপ এখনো শেষ হয় নি। যে পুলিশটার গায়ে আছড়ে পড়েছে চামচ সে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। সাথে তার দুই সঙ্গীও। আর আশপাশের বাড়ি ঘরে বিকট গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ার কারণে লোকজন পাগলের মতো চেঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘর ছেড়ে। দমকল বাহিনী ম্যাসাকারের খবর পেয়ে ছুটে এল। তবে গাড়ি ফেলে রেখে তারাও ভোঁ দৌড়। এক স্কোয়াড্রন পুলিশ এসেছিল। তারাও ছুটে পালাল বীভৎস গন্ধের কারণে।

সিলস এবং টেলর ওদিকে শুধু ট্রাউজার পরে দৌড়াতে দৌড়াতে হাডসন নদীতে চলে এসেছে। এক লাফে পানিতে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মুখ হাঁ করে তাজা বাতাস নিতে লাগল।

টেলর সিলসের কানে কানে বলল, 'এ রকম বীভৎস গন্ধ হবার কারণ কি? আপনি বলেছিলেন জিনিসটা টেকসই। আর টেকসই জিনিসের গন্ধ থাকার কথা নয়। ওই বাষ্পের কারণে এমন হয়েছে, না?'

'কস্তুরীর গন্ধ শুঁকেছ কখনো?' গুঙিয়ে উঠল সিলস।

'একটি অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, কোনো ওজন না হারিয়ে ওটা গন্ধ ছড়িয়ে যায়। আমরা মনে হয় ওরকম কিছু একটার বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছি।'

চুপচাপ পানিতে বসে রইল দু'জনে। ভয়ে আছে অ্যামোনিয়াম ভেপারটা আবার বাতাসের ধাক্কায় কখন চলে আসে এদিকে। নিচু গলায় বলল টেলর, 'চামচ রহস্য যখন ওরা বের করে ফেলবে, জানবে কারা বানিয়েছে এ জিনিস তখন আমরা ধরা খেয়ে যাব। জেল ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল সিলসের। 'ওই হারামজাদা জিনিসটাকে কেন যে আবিষ্কার করতে গেলাম। ঝামেলা ছাড়া আর কিছু জুটল না ওটা থেকে।' ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল সে।

তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে টেলর বলল, 'কাঁদবেন না প্লিজ। আমার বিশ্বাস এ আবিষ্কার আপনাকে বিখ্যাত করে তুলবে। দেশের যেকোনো ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে লুফে নেবে। ভালো দামও পাবেন। তাছাড়া নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারেন।'

'তা পারি,' হাসি ফুটল সিলসের মুখে। 'তবে ওই বিকট গন্ধটা দূর করার একটা উপায় বের করতে হবে। আশা করি পেয়ে যাব।'

'আমারও তাই আশা,' বলল টেলর। 'চলুন যাওয়া যাক। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চামচটাকে সরিয়ে ফেলেছে ওরা।'

অনুবাদ: অনীশ দাস অপু

হোয়াট ইজ দিস থিং কলড লাভ ?

'ওরা আসলে দু'টি প্রজাতি,' বলল ক্যাপ্টেন গার্ম। উঁকি দিয়ে দেখছে প্রাণী দুটিকে। ওদেরকে নিচের গ্রহ থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

বোটাক্স বলল, 'দুটি প্রজাতি নয়। দুই শরীরের এক প্রজাতি।'

'বোকার মতো কথা বল না। ওদের দু'জনের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। আচ্ছা, ওরা কথা বলতে পারে ?'

'জ্বী, ক্যাপ্টেন গাম,' বলল বেটাক্স। 'আমার রিপোর্টে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে।' এই প্রাণীগুলো গলা এবং মুখ দিয়ে এক ধরনের শব্দ-তরঙ্গ তৈরি করে। অনেকটা খকখক কাশির মতো। 'আমিও পারি,' গর্বিত শোনাল তার কণ্ঠ। 'তবে কাজটা বেশ কঠিন।'

'কিন্তু তুমি ওদেরকে একটি মাত্র প্রজাতি বলছ কেন ? বাম দিকেরটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং শূঁড়টাও লম্বা মনে হচ্ছে। ওটা মাঝে মাঝে ফুলেও উঠছে। অন্যটার শূঁড় ফুলছে না। ওরা কি বেঁচে আছে ?'

'বেঁচে আছে। তবে আপাততঃ অচেতন। পরীক্ষা করার জন্যে ওদের অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে, ক্যাপ্টেন।'

'কিন্তু পরীক্ষা করে কি লাভ হবে কিছু ? এমনিতেই আমরা শিডিউল থেকে পিছিয়ে পড়েছি। অনেক জরুরি কাজ পড়ে আছে আমাদের—'

তাঁকে বাধা দিল বোটাক্স, 'কিন্তু আমার মনে হয় তাদেরকে পরীক্ষা করার চেয়ে জরুরি কাজ আমাদের কিছু নেই, ক্যাপ্টেন। আমরা বিরাট কোনো ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি। এই প্রাণীগুলো গ্যালাক্সির লাইফ-ফর্মে সবচে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'বুঝলাম না।'

'ক্যাপ্টেন, এ গ্রহটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া

হয়েছে। খুব কঠিন একটা কাজ। কারণ গ্রহটি এক কথায় অসাধারণ। এতই অসাধারণ যে এটাকে বুঝে উঠতে পারিনি আমি। যেমন, এ গ্রহের বেশিরভাগ প্রাণী দুই ভাগে বিভক্ত। তাদেরকে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। ওদের শুধু প্রথম শরীর এবং দ্বিতীয় শরীর এরকম কোনো নাম দিতে পারি আমরা। ওদের ভাষা ব্যবহার করে বলা যায়, ছোট প্রাণী বা শরীরটি হল নারী, বড়টি পুরুষ। কাজেই প্রাণীগুলো নিজেদের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন। আর দুটি শরীর পরস্পরের সহযোগী হিসেবে কাজ করে।'

ঝুঁকে প্রাণী দুটিকে লক্ষ্য করছিলেন ক্যাপ্টেন, এবার সিধে হল। 'সহযোগী ? কিভাবে ?'

'এটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। তবে অনুমান করতে পারি। আর এদেরকে পরীক্ষা করে যা বুঝতে পেরেছি তা হল এরা অসম্ভব বুদ্ধিমান। সুযোগ পেলে গোটা গ্যালাক্সির ওপর নেতৃত্ব স্থাপনে সক্ষম।'

'ব্যাপারটা প্রমাণ করে দেখাও,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'দেখাতে না পারলে এ বিষয় নিয়ে তোমাকে আর কাজ করার অনুমতি দেব না আমি।'

'প্রমাণ করে দেখাব আমি, ক্যাপ্টেন,' বোটাক্সের মুখের রঙ হলদে-সবুজ হয়ে উঠল। 'এই গ্রহের প্রাণীরা আরেক অর্থে অসাধারণ। এরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। ওরা যে কাজ এখনো করেনি, ভবিষ্যতে সেটার স্বরূপ কি হবে, আগে ভাগেই জানতে পারে। তবে ওদেরকে নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন।'

'ঠিক আছে। প্রাণীগুলোর জ্ঞান ফিরিয়ে আনো। আর যা করার তাড়াতাড়ি করবে,' হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন।

মার্জ স্কিডমোর নিজের পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। সন্ধ্যার সময় প্রায় স্টেশনটা খালি ছিল মনে আছে তার। শুধু একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশে। আরেকজন প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে। ট্রেন আসার অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

এমন সময় বিদ্যুৎ ঝলকটা দেখা গেল। মনে হল অদ্ভুত একটা প্রাণী এগিয়ে আসছে ওর দিকে। সরু, লম্বা। লালা পড়ছে মুখ বেয়ে। তারপর—

'ওহ্ গড,' শিউরে উঠল মার্জ। 'ওটা এখনো এখানে। আর সেই লোকটাও।'

বমি বমি ভাব হল মার্জের। তবে ভীত নয় সে। ভয় পাচ্ছে না বলে বরং গর্ব হচ্ছে তার। তার পাশের লোকটা তার মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ? পরনে ছেঁড়া ফড়োরা।

'ওরা আপনাকেও ধরেছে ?' জিজ্ঞেস করল মার্জ। 'আর কে ?'

চার্লি গ্রিমউল্ড হাত দিয়ে মাথার হ্যাট তুলে পাতলা চুল আঁচড়াতে যাচ্ছিল, চমকে উঠল মার্জের কথা শুনে।

মার্জের বয়স ত্রিশের কোঠায়। চুল সুন্দর, পোশাকও মানিয়ে গেছে ফিগারের সঙ্গে। তবে সুন্দরী মার্জ তার চিত্তকে চঞ্চল করতে পারল না।

সে বলল, 'জানি না, লেডি। আমি স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা আলোর ঝলক দেখলাম তারপর দেখি আমি এখানে। তবে শুনিনি কিছু। ওরা মনে হয় মঙ্গল বা শুক্র থেকে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল মার্জ। 'আমারও তাই ধারণা। ফ্লাইং সসার বা এরকম কিছু ? ভয় লাগছে ?'

'নাহ্। ভয় লাগছে না। ভয় পাইনি বলে বরং অবাক লাগছে।'

'আমিও ভয় পাইনি। ওহ্ গড, ওই যে একটা আসছে এদিকে। ওটা যদি আমাকে স্পর্শ করে তাহলে সত্যি চিৎকার দেব আমি। দেখুন ওর তিনটে হাত শরীরের পাশে কেমন ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে, চামড়া বীভৎস রকম কোঁচকানো আর পেছল। দেখলেই বমি আসে।'

অদ্ভুত চেহারা নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এল বোটাক্স। বলল, 'প্রাণীরা, আমরা আপনাদের আঘাত করব না। আমাদেরকে সহযোগিতা করুন।'

'আরে, এ দেখছি আমাদের ভাষায় কথা বলে!' বলল চার্লি। 'সহযোগিতা বলতে কি বোঝাতে চাইছ ?'

'আপনাদের দু'জনকে। পরস্পরের সঙ্গে।' বলল বোটাক্স।

'আচ্ছা ?' মার্জের দিকে তাকাল চার্লি। 'এর মানে কি বুঝতে পারছেন, লেডি ?'

'বুঝতে পারছি না,' ইতস্তত ভঙ্গিতে জবাব দিল মার্জ।

'আমি বলতে চাইছি আপনারা মিলিত হবেন,' বলল বোটাক্স।

'কি!' চেহারা লাল হয়ে গেল মার্জের। 'আমি একজন বিবাহিতা নারী। অচেনা লোকের সঙ্গে আমি মিলিত হতে পারি না। আমার স্বামী এড যদি এখানে থাকত তা হলে মজা টের পেতে।' সে ঘুরল চার্লির দিকে। 'আর এই

যে ভদ্রলোক। আপনি যদি মনে করে থাকেন—'

'লেডি, লেডি,' অসহায় শোনাল চার্লির কথা। 'আমি এসবের কিছুই জানি না। আমিও বিবাহিত। আমার তিনটা বাচ্চা। শুনুন—'

ক্যাপ্টেন গার্ম বললেন, 'এসব কি ঘটছে, ইনভেস্টিগেটর বোটাক্স? ওদের চেঁচামেচি বড় কানে বাঁধছে।'

বিব্রত বোধ করল বোটাক্স, চেহারা বেগুনি রঙ ধারণ করল।

'ওদের মাঝে একটু মন কষাকষি হয়েছে। তবে এরকম প্রথমে হয়েই থাকে। তারপর ঠিক হয়ে যায়। তখন চামড়াগুলো সরাতে হয়।'

'ওদের চামড়া ছিলতে হবে?'

'না। গায়ের চামড়া নয়। গায়ে যে কৃত্রিম চামড়া পরেছে সেগুলো। ওগুলো সরালে ব্যথা পাবে না। বিশেষ করে ওই ছোট প্রাণীটার চামড়া সরান দরকার আগে।'

'ঠিক আছে। তবে তাই কর। সরাও চামড়া। তবে এতে আমি তেমন আনন্দ পাচ্ছি না, বোটাক্স।'

'তবে আমার চামড়া সরানর কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। বরং ওদের কর্মকাণ্ড গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করি। এই তো এই সায়েন্স-ফিকশন বইতে লেখা আছে—মেয়েটির সাথে কিছুক্ষণ দুষ্টামি করে তার স্লিম শরীর থেকে পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হল। এক সেকেন্ডের জন্যে পুরুষটি তার গালে মেয়েটির আধ-খোলা বক্ষের উষ্ণ স্পর্শ পেল এইই, লেখা আছে বইতে। জোর করে জামা ছিঁড়ে ফেলা আসলে উত্তেজিত করে তোলার একটি ধাপ মাত্র।'

'বক্ষ?' বলল ক্যাপ্টেন, 'এটা আবার কি জিনিস?'

'বইয়ের প্রচ্ছদে এর ছবি আছে। ছোট প্রাণীটার শরীরের ওপরের অংশের ফুলে থাকা মাংসপিণ্ডের নাম বক্ষ।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে, বড়টাকে বল ছোটটার চামড়া ছাড়িয়ে নিতে। কি বিশ্রী ব্যাপার!'

বোটাক্স ফিরল চার্লির দিকে, 'স্যার,' বলল সে। 'আপনি কি মেয়েটার স্লিম শরীর থেকে পোশাকটি ছিঁড়ে আনতে পারবেন? তাহলে আপনাকে আমরা মুক্ত করে দেব।'

এ কথা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মার্জের। ঝট করে চার্লির দিকে ফিরল সে। আগুন জ্বলছে চোখে। 'খবরদার। অমন কাজও করতে যাবেন না। আমাকে ছোঁবেন না আপনি, সেক্স ম্যানিয়াক।'

'আমি?' মিনমিন করে বলল চার্লি। 'আমি আপনার কাপড় ছিঁড়তে যাব কেন? আপনার কি ধারণা আমি মেয়েদের কাপড় ছিঁড়ে বেড়াই?' সে বোটাক্সের দিকে ঘুরল। 'শুনুন, আমার স্ত্রী এবং তিনটি সন্তান আছে। সে যদি টের পেয়ে যায় আমি কোনো মেয়ের কাপড় ছিঁড়েছি তা হলে আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। মেয়েদের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারি না আমার স্ত্রীর ভয়ে। কাপড় ছেঁড়া দূরে থাক।'

'ও কি বিরক্ত হচ্ছে?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'দৃশ্যত তাই,' জবাব দিল বোটাক্স। 'পরস্পরের সহযোগিতায় আগে এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটতেই পারে। তবে ব্যাপারটিকে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বলে কাজটা আমার নিজেকেই হয়তো করতে হবে। মহাশূন্য বিষয়ক গল্পে এরকম অনেক ঘটনার কথা লেখা আছে। সেখানে বাইরের পৃথিবীর প্রাণীরা কাপড় ছেঁড়াছেড়ির কাজ করে। এই যে দেখুন লেখা আছে—ভিনগ্রহের প্রাণীটি চলে এল মেয়েটির কাছে। কাঁপতে কাঁপতে দানবের হাতে ধরা দিতে হল মেয়েটিকে। দানব তার থাবা দিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলল মেয়েটির সমস্ত পোশাক। দেখলেন তো, মেয়েটির পোশাক ছিঁড়ে ফেলার সময় উত্তেজনায় সে কিরকম কাঁপছিল।'

'তাহলে যাও, বোটাক্স। ছোট প্রাণীটার কাপড় ছিঁড়ে ফেল। তবে কোনো চিৎকার চেঁচামেচি যেন শুনতে না হয়। ওদের চিৎকার কানে বড় লাগে।'

বোটাক্স বিনীতি গলায় মার্জকে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন—' সে চ্যাপটা চামচের মতো আঙুল বাড়িয়ে দিল মার্জের ঘাড়ের দিকে। কাপড় খুলবে।

আঁতকে উঠল মার্জ, 'আমাকে ছুঁয়োনা! ছুঁয়োনা! তোমার কুৎসিত লালা লেগে যাবে। জান, এটা পঁচিশ ডলার দিয়ে কিনেছি? দূরে থাক, দানব।' এঁকে বেঁকে নিজেকে বোটাক্সের থাবা থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখতে চাইছে সে। 'লালা পরা, ছারপোকা চোখের দানব। ঠিক আছে, ছাড়বেই না যখন। আমার কাপড় আমিই খুলছি। আমাকে ধরবে না, ফর গডস শেক।'

সে হন্তদন্ত হয়ে জিপার খুঁলছে, গরম চোখে তাকাল চার্লির দিকে। 'আমার দিকে একদম তাকাবেন না।'

চার্লি চোখ বুজে ফেলল।

পোশাকটা গা থেকে গলিয়ে আনল মার্জ। 'হয়েছে? এবার সন্তুষ্ট?'

অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে আঙুল মটকাল ক্যাপ্টেন গ্রাম। 'এর নাম বক্ষ? অন্য প্রাণীটা কেন আরেক দিকে তাকিয়ে আছে?'

'বিরক্তি। স্রেফ বিরক্তি।' বলল বোটাক্স। 'তাছাড়া বক্ষজোড়া এখন আড়ালে। ওই চামড়াটাও সরাতে হবে। সরিয়ে ফেললে উত্তেজিত হয়ে উঠবে বক্ষ।'

'বক্ষ দিয়ে কি কাজ হয়?'

'আমার ধারণা।' সামান্য ইতস্তত করে বলল বোটাক্স, 'ওগুলো দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ান হয়।'

'বাচ্চারা ওগুলো খেয়ে ফেলে?' হতাশ হল ক্যাপ্টেন।

'ঠিক তা নয়। বক্ষ থেকে তরল একটা পদার্থ নির্গত হয়। বাচ্চারা ওটাই খায়।'

'জ্যান্ত শরীর থেকে তরল পদার্থ? ছ্যা ছ্যা ছ্যা!' ক্যাপ্টেন তার সবগুলো হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

বোটাক্স মার্জকে বলল, 'ম্যাডাম, আপনার বাকি কাপড়গুলো সরিয়ে নেবেন?'

কটমট করে তিন হাতঅলা বোটাক্সের দিকে তাকাল মার্জ।

'কক্ষনো না।'

'তাহলে আমাকে সরিয়ে নিতে দিন।'

'আমাকে ছোঁবে না। খবরদার বলছি আমাকে স্পর্শ করবে না। আমি নিজেই খুলছি।' বিড় বিড় করল মার্জ। গরম চোখে তাকিয়ে আছে চার্লির দিকে।

'কিছুই ঘটছে না,' ভয়ানক অসন্তোষ নিয়ে বলল ক্যাপ্টেন।

'এদেরকে অপরিণত প্রজাতি মনে হচ্ছে।'

বোটাক্স বলল, 'কিন্তু আমি তো দুটি পরিণত প্রজাতিই নিয়ে এসেছি।

সমস্যাটা কি ?'

'ছোট প্রাণীটির বক্ষ এত ছোট কেন ? মনে হচ্ছে অপরিণত।'

বোটাক্স ঘুরল মার্জের দিকে। 'ম্যাডাম, আপনার বক্ষ কি অপরিণত ?'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল মার্জের চোখ। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'সত্যি! আমি তো জিনা লোলো ব্রিজিডা বা অনীতা একবার্গ নই যে অমন বড় বক্ষ হবে আমার। তবে আমার ধারণা আমার বক্ষ ঠিকই আছে।' চার্লির দিকে ফিরে বলল, 'জানেন একবার মিস ব্রুকলিন প্রতিযোগিতায় আমি রানার আপ হয়েছিলাম ? তখন আমার বক্ষ নিয়ে কেউ কথা বলেনি। শুধু কোমরটা যদি আরেকটু সরু হত—'

চার্লি চোখ মেলে তাকাল, 'না, না। আপনার বক্ষ ঠিকই আছে।' সে বোটাক্সকে বলল, 'ম্যাডামের বক্ষে কোনো সমস্যা নেই। আমি এ সব ব্যাপারে যদিও এক্সপার্ট নই, তবু বলতে পারি বক্ষ জোড়া ঠিকই আছে।'

স্বস্তি বোধ করল বোটাক্স। ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরল সে। 'বক্ষ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ক্যাপ্টেন। স্টিমুলাস কাজ করছে। এবার চূড়ান্ত পদক্ষেপ।'

'কি সেটা ?'

'এবার যেটা ঘটবে তার নাম চুম্বন। এটার উদাহরণ দেয় আছে বইতে। এই যে লেখা—সে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল। তার মুখ স্পর্শ করল মেয়েটির ঠোঁটে।'

'হয়তো একটা প্রাণী আরেকটাকে এভাবে খেয়ে ফেলে,' বলল ক্যাপ্টেন।

'মোটেই তা নয়,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল বোটাক্স। 'এর নাম জ্বলন্ত চুমু।'

'জ্বলন্ত মানে কি ? আগুন জ্বলে ?'

'ঠিক তা নয়। আমার মনে হয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটিকে বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে, বাচ্চা জন্ম নেয়ার পদ্ধতি তত সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। বড় প্রাণীটি এখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এখন বাচ্চা জন্ম দেয়ার জন্যে তাকে ছোট প্রাণীটির মুখে মুখ রাখতে হবে। নইলে বাচ্চার জন্ম হবে না। এরই নাম সহযোগিতা। এর কথাই আমি বলেছি।'

বোটাক্স বলল, 'স্যার, আপনি কি মহিলাটিকে চুমু খেতে পারবেন?'

চার্লি বলল, 'শুনুন। আমার এখান থেকে নড়াচড়া করা নিষেধ।'

'আপনাকে আমরা কিন্তু ছেড়ে দেব।'

'তবে ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারেন।'

মার্জ খেঁকিয়ে উঠল, 'ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করব না আমি। স্রেফ দূরে সরে থাকুন।'

'আমি তো তাই চাই, লেডি। কিন্তু ওরা তো আমাকে থাকতে দিচ্ছে না। আমি কি করব? দেখুন, আমি ওদেরকে রাগিয়ে দিতে চাই না। রাগিয়ে দিলে দু'জনেরই সমস্যা। চুমু না খাই, অন্তত ঠোঁটে ঠোঁট তো রাখতে পারি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মার্জ। চার্লির যুক্তি ফেলে দেয়ার মতো নয়। শেষে বলল, 'ঠিক আছে। তবে কোনো চালাকি নয়। আজেবাজে লোকজনের সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আমি অভ্যস্ত নই, জানেন বোধ হয়।'

'জানি, লেডি। তবে এতে আমার কোনো দোষ নেই আপনিও জানেন।'

রাগে ঘোঁতঘোঁত করল মার্জ। 'হারামজাদা দানব কতগুলো। নিজেদেরকে দেবতা ভেবে বসে আছে। লালা পড়া দেবতা!'

চার্লি এগিয়ে গেল মার্জের দিকে। তারপর ইতস্তত ভঙ্গিতে মার্জের খোলা কাঁধে হাত রাখল। ঝুঁকল।

আড়ষ্ট হয়ে উঠল মার্জ। শক্ত হয়ে গেল। দু'জনের ঠোঁটে ঠোঁট মিলল।

অস্থির ভঙ্গিতে নড়ে উঠল ক্যাপ্টেন। 'কই, আমি তো তাপমাত্রার কোনো বৃদ্ধি দেখছি না।'

'আমিও না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল বোটাক্স। 'তবে বইতে যা লেখা আছে সেভাবেই তো ওদেরকে করার নির্দেশ দিয়েছি আমি। আমার মনে হয় বড় প্রাণীর অঙ্গটা আরো প্রসারিত হওয়া উচিত—আহ, ঠিক ওভাবে। ওই দেখুন। কাজ হচ্ছে।'

নিজের অজান্তে চার্লি মার্জের নরম, নগ্ন বুকে হাত বোলাল। এক মুহূর্তের জন্যে মার্জ ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিল, তারপর হঠাৎ মোচড় খেল চার্লির বাহু বন্ধনে। কিন্তু চার্লি ওকে শক্ত ভাবে জড়িয়ে ধরে আছে।

'ছাড়,' চার্লি চেপে আছে মার্জের ঠোঁট, ভোঁতা শোনাল কণ্ঠ। হঠাৎ

কামড়ে দিল মার্জ। চার্লি "আঁক" করে ওঠে ছেড়ে দিল ওকে। চেপে ধরল নিচের ঠোঁট। আঙুলে রক্ত!

'এটা কি হল, লেডি?' বোকা বোকা গলায় জিজ্ঞেস করল চার্লি।

মার্জ বলল, 'আমাদের শুধু ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াবার কথা ছিল। কিন্তু আপনি কি শুরু করে দিয়েছেন? নিজেকে প্লেবয় ভাবেন নাকি? এখানে কিসের মধ্যে আছি আমি? প্লেবয় আর লালা পড়া দেবতাদের মাঝে?'

ক্যাপ্টেন গার্ম খুব রেগে গেছে। তার চেহারা নীল এবং হলুদ হয়ে উঠল।

'শেষ? নাকি আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে?'

'আমার মনে হয় ঘটনাটা এখুনি ঘটবে। গোটা ব্রহ্মাণ্ডে মুকুলিত হবার সময় তা মুকুলিত হবেই। এতে অপেক্ষার কিছু নেই।'

'তাই নাকি? কিন্তু তোমার কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে কোনো কিছুই আর মুকুলিত হবে না। এটার এখন সমাপ্তি টানা দরকার।'

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন।'

কিন্তু সময় বয়ে চলল। কিছুই ঘটল না। ক্যাপ্টেনের রাগ আরো বাড়তে লাগল। মুখ এখন কমলা হয়ে গেছে। আর বোটাক্সের চেহারা থেকে রং মুছতে শুরু করেছে।

অবশেষে ইতস্তত করে জানতে চাইল বোটাক্স, 'মাফ করবেন, ম্যাডাম। আপনি কখন মুকুলিত হবেন?'

'আমি কি হব?'

'বাচ্চা নেবেন?'

'আমার বাচ্চা আছে।'

'মানে এখন বাচ্চা নেয়ার কথা বলছি।'

'এখন বাচ্চা নেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

'কি? কি?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'কি বলছে সে?'

'মনে হচ্ছে,' দুর্বল গলায় বলল বোটাক্স। 'তার এ মুহূর্তে বাচ্চা নেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই।'

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ক্যাপ্টেন। সারা মুখ টকটকে লাল। 'আমার কি মনে হচ্ছে জান, ইনভেস্টিগেটর? মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ, বিকৃত মনের।

এই প্রাণীগুলোর মধ্যে কিছুই ঘটছে না। ওদের মধ্যে কোনো সহযোগিতাও নেই, কোনো বাচ্চাও জন্ম নিচ্ছে না। ওরা দু'জনে আলাদা দুই প্রজাতির। আর ওদেরকে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এতক্ষণ একটা খেলা খেলেছ।'

'কিন্তু, ক্যাপ্টেন—' বলল বোটাক্স।

'আমাকে আর ক্যাপ্টেন বলে ডেক না,' বলল গার্ম। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছ। তোমার কারণে আমার পেট উল্টে যেতে চেয়েছে, বমি এসেছে। খামোকা নষ্ট করেছ আমার সময়। নিজেকে বিখ্যাত করে তোলার আমার এসব হাবিজাবি কাণ্ড করেছ। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ওই প্রাণীগুলোকে এখন ছেড়ে দাও। ওদের চামড়া ফেরত দাও। যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে এস। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে যাত্রা শুরু করব। আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্যে তোমার বেতন কাটা হবে।'

'কিন্তু, ক্যাপ্টেন—'

'ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলেছি। যেখান থেকে যে সময়ে নিয়ে এসেছ ওদেরকে, ফিরিয়ে দিয়ে এস সেখানে। এই গ্রহটিকে স্পর্শ করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি চাই না কেউ এই গ্রহের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাক।' কটমট করে তাকাল সে বোটাক্সের দিকে। 'তুমি একটা বোকা, ইনভেস্টিগেটর। আর পুরোপুরি একটা মানসিক রোগী।'

তর্ক করার সাহস হল না বোটাক্সের। কাঁপতে কাঁপতে এগোল সে "প্রাণীগুলো"র দিকে। আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

ওরা দু'জন আবার সেই স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক চোখে তাকাচ্ছে চারপাশে। সাঁঝ ঘনাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে এল ট্রেনের শব্দ।

মার্জ ইতস্তত গলায় জানতে চাইল, 'মিস্টার, ব্যাপারটি কি সত্যি ঘটেছে?'

মাথা ঝাঁকাল চার্লি। 'হ্যাঁ। সব মনে পড়ছে আমার।'

মার্জ বলল, 'কিন্তু এ ঘটনার কথা কাউকে বলতে পারব না আমরা।'

'অবশ্যই না। বললে বলবে পাগল। কি বোঝাতে চাইছি বুঝতে পারছেন?'

'জ্বী,' মার্জ পা বাড়াল।

চার্লি বলল, 'শুনুন। আপনি বিব্রত বোধ করছিলেন বলে আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে। জানি আমি।' মার্জ প্ল্যাটফর্মের কাঠের মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল। ট্রেনের শব্দ জোরাল হয়ে উঠছে।

'মানে আমি বলতে চাইছি, লেডি। আপনি দেখতে খুব সুন্দর। তবে কথাটা বলতে অস্বস্তি লাগছিল আমার।'

হঠাৎ হাসল মার্জ। 'ঠিক আছে।'

'আমার সাথে এক কাপ কফি খাবেন? আমার স্ত্রী এখন বাড়িতে নেই।'

'তাই? এডও সাপ্তাহিক ছুটিতে শহরের বাইরে গেছে। ফিরতে হবে একা বাসায়। আমার ছেলেটা তার নানীর বাড়ি,' জানাল মার্জ।

'তা হলে চলুন। আরো ভালোভাবে পরিচিত হই আমরা।'

'আপত্তি নেই আমার,' হাসল মার্জ।'

স্টেশনে ঢুকল ট্রেন। তবে ওরা ট্রেনে উঠল না। সরু সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাস্তায়।

চার্লি মার্জকে ককটেল বানিয়ে খাওয়াল। রাত হয়ে গেছে বলে ওর বাসায় থেকে ভিজি স্ক্রিনে যেতে বলল মার্জকে। আপত্তি করল না মার্জ।

এদিকে তার স্পেস শিপে বসে হতাশ বোটাক্স শেষ চেষ্টা করছে তার কেসটার সত্যতা প্রমাণে। ক্যাপ্টেন গার্ম ব্যস্ত জাহাজ ছাড়ার কাজে। বোটাক্স টাইট-বিম শেষবারের মতো তাকাল তার প্রজাতিদের দেখতে। ফোকাস করল চার্লি এবং মার্জের ওপর। তার সরু শুঁড়টা শক্ত হয়ে উঠল দৃশ্যটা দেখে। রঙধনুর সবগুলো রঙ জ্বলতে লাগল তার গায়ে। 'ক্যাপ্টেন গার্ম। ক্যাপ্টেন! দেখুন ওরা কি করছে!'

ঠিক সেই মুহূর্তে স্পেসশিপ উড়াল দিল মহাশূন্যে।

অনুবাদ: আনন্দ সিদ্ধার্থ

ফাউন্ডিং ফাদার

একের পর এক এই বিপর্যয়ের শুরু আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে— তারপর বিপ্লব ঘটে যায় পাঁচবার। HC-12549d চার্টে এই পাঁচটি বিপ্লবের কথাই উল্লেখ আছে। আরো যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর কোনো হদিস নেই। কে আর এত হিসেব রাখে?

যদি এই মানুষ কজন কখনো তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারত, বীরোচিত লড়াইয়ের সম্মান পেত তারা। গ্যালাকটিক কোরের সদস্য হিসেবে মহাকাব্য রচনা হত তাদের নিয়ে। পাঁচটি বছর ধরে বৈরী এক পৃথিবীতে বিরূপ পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে আসছে তারা। এবং এ মুহূর্তে মরতে বসেছে সবাই হেরে গেছে মরণপণ যুদ্ধে। তিনজনের একেবারেই সংখ্যা নেই, চার নম্বরের হলদেটে চোখের মণি দুটো খোলা আছে এখনো, এবং পঞ্চমজন এখনো খাড়া আছে পায়ের ওপর।

কিন্তু তাদের বীরত্ব বলতে কিছু আর বাকি নেই এখন। পাঁচ জনই চরম হতাশা আর ভীষণ বিরক্তির সাথে কোনোরকমে ধাতব বুদ্‌বুদ্-টার ভেতর টিকিয়ে রাখছিল তাদের জীবন। কারণ এই বুদ্‌বুদ্ ছাড়া অন্য কোথাও বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ নেই।

এই যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি কারো হাঁপ ধরে যেত, মুখে আনত না সে কথা। ভিনগ্রহের বৈরী পরিবেশ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে একটি বছর টুঁ শব্দটি করেনি তারা। দু'বছর পেরিয়ে যাওয়ার মতো "পৃথিবী" শব্দটি জাগিয়ে বসল সবার মাথায়। পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে এক ধরনের ব্যাকুলতা পেয়ে বসল তাদের।

তবে একটা শব্দ সব সময় গেঁথে রইল তাদের মনে। তাদের অব্যক্ত

ভাবনাগুলো হাতড়ালে পাওয়া যাবে সেই শব্দ। এবং এই শব্দটি হচ্ছে—অ্যামোনিয়া।

এই শব্দটি তাদের মাথায় প্রথম আসে এখানে অবতরণের পর। স্পেসশিপের বিগড়ে যাওয়া কলকব্জা নিয়ে মহাশূন্যের বৈরী পরিবেশের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে অবতরণ করে তারা।

হ্যাঁ, বিপত্তি আসতেই পারে। আসুক। তা সংখ্যায় কয়েকটা হোক না, অসুবিধে নেই। কিন্তু একবারে শুধু একটা। একসঙ্গে একগাদা দুর্ঘটনা এসে জুটলে তো মহাবিপদ। হঠাৎ এক ঝলক তারকা-আলো এসে পুড়িয়ে দিয়ে গেল হাইপার সার্কিটস—ত্রুটিটা সারিয়ে নেয়া গেলেও, সময় লাগবে এতে। একটা উল্কা পিণ্ড এসে ধাম করে লাগল ফীডার ভাল্‌বগুলোতে, তছনছ হয়ে গেল সুবিন্যস্ত ভাবটা। হ্যাঁ, এগুলোকে সারিবদ্ধ করা যাবে আবার, তবে সময় লাগবে। এদিকে স্পেসশিপের গতিশক্তির হিসেবে গড়বড় হয়ে যাওয়ার বেঁধে গেল আরেক বিপত্তি। প্রচণ্ড গতির টানে ছিঁড়ে গেল জাম্প-অ্যান্টেনা। সেই সঙ্গে ভোঁতা হয়ে গেল মহাশূন্যযানের সব কটি মানুষের অনুভূতি। এই অ্যান্টেনাও মেরামত সম্ভব, ভাঙা মন চাঙা হতে পারে, কিন্তু এখানেও সেই সময়ের প্রশ্ন।

এরকম অগণিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনার মধ্যে কদাচিৎ একটা ঘটে থাকে, কিন্তু এদের বেলায় একসঙ্গে তিন-তিনটে বিপর্যয় এসে হাজির। আর বিপর্যয় তিনটি ঘটল সুকৌশলে স্পেসশিপটাকে অবতরণ করানোর সময়। এখানে সবচে বড় সমস্যাটা হচ্ছে সময়। একদম সময় নেই হাতে।

সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে মহাকাশযান "ক্রুজার জন" যাও বা অবতরণ করল, আর কখনো ওঠে আসতে পারেনি উপরে, ক্রুজার জন-এর এই অবতরণ প্রায় অলৌকিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। এরমধ্যে কেটে গেল পাঁচ জনের পাঁচটি বছর। তাদের একমাত্র উদ্ধার পাওয়ার পথ—ভুল করে অন্য কোনো শিপ যদি এখানে এসে নিরাপদে অবতরণ করতে পারে, তবেই। কিন্তু পাঁচ জনের কেউ এধরনের ঘটনা আশা করেনি কখনো। নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে ঘটে গেলে তাদের এই ক'টি বছর। ব্যস, এই হচ্ছে পাঁচজনের ঘটনা।

তাদের সামনে এখন মূল চাবি হিসেবে যে শব্দটি কাজ করছে, তা হচ্ছে—"অ্যামোনিয়া"। মোচাকার এই ভূভাগে নানা রকম দুর্ভোগ পোহানর

চেয়ে মৃত্যুকেই যখন তারা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছে, এবং মৃত্যুও দ্রুত এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, এমন সময় চাউ যেভাবেই হোক, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য টুকে নিতে পারল।

'অ্যামোনিয়া,' চিৎকার করে উঠল চাউ। অন্যেরা শুনল ঠিকই, কিন্তু মন দেয়ার মতো সময় নেই তাদের। সবাই তখন দ্রুত এগিয়ে আসা মৃত্যু ঠেকাতে লড়ে যাচ্ছে প্রাণপণ।

এখানে নামার পর বেলে মাটিতে ছোপ ছোপ নীলচে উদ্ভিদের সন্ধান পাঁয়তারা। নলখগড়ার মতো এক ধরনের ঘাস। গাছের মতো দেখতে, তবে পাতা নেই। ছালবাকল নীল। জন্তুজানোয়ারের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। খণ্ড খণ্ড সবুজাভ। মেঘে ছাওয়া আকাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দটা যখন ছড়িয়ে পড়ল, অদ্ভুত এক শিহরণ জাগল সবার মনে।

'অ্যামোনিয়া ?' ভারী কণ্ঠ পিটারসনের।

চাউ বলল, 'হ্যাঁ, চার পার্সেন্টের মতো আছে।'

'অসম্ভব,' বলল পিটারসন।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটি অসম্ভব নয়। বই পত্র ব্যাপারটিকে অসম্ভব বলে না। গ্যালাকটিক কোরের এই পাঁচ সদস্য মিলে আবিষ্কার করেছে, নির্দিষ্ট কিছু উপাদান নিয়ে গঠিত এই গ্রহটি। এবং নির্দিষ্ট এক তাপমাত্রায় পুরো গ্রহটিই ছিল এক সুবিশাল মহাসাগর। এবংগ্রহটির বায়ুমণ্ডল ছিল দু'রকমের কোনো একটি। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলিয়ে, কিংবা নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড মিলিয়ে। আগের বায়ুমণ্ডলে যে পরিবেশ ছিল, তাতে জীবনের বিকাশ ঘটেছে। পরের বায়ুমণ্ডলে পরিবেশটা ছিল আদিম।

এর আগে কখনো এখানকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এবং তাপমাত্রা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়নি। এবারই শুধু বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করা হল। এবং তাত্ত্বিক যে বিবরণ, তার বাইরে, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া বাড়তি উপাদান পাওয়া গেল অ্যামোনিয়া।

শিপটাকে শেষ পর্যন্ত তারা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড বাবল-এ রূপান্তর করল। মাটির ওপর শিপটাকে যেমন তারা তুলে আনতে পারল না, তেমনি হাইপার স্পেসে যোগাযোগের কাজটিও হয়ে উঠল না আর। আন্ডারগ্রাউন্ড শিপের

ভেতর পৃথিবী উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে তারা বসবাস করতে লাগল সেখানে। সীমাবদ্ধতার ভেতর গ্রহের পানি এবং বাতাসটাকে নিজেদের ব্যবহার উপযোগী করে নিল। এ ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াকে এড়িয়ে গেল খুব সাবধানে।

স্পেসস্যুট ভালো থাকা অবস্থায় পাঁচজন মিলে তৈরি করল অনুসন্ধান দল। এভাবে কেটে যেতে লাগল তাদের সময়। গ্রহটিতে ক্ষতিকর কিছু নেই। প্রাণীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে উদ্ভিদ আছে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে নীল গাছ। অ্যামোনিয়া যুক্ত ক্লোরোফিলের প্রভাব। অ্যামোনিয়াযুক্ত প্রোটিনের প্রভাব।

শিপের ভেতর ল্যাবরেটরি গড়ে তুলল তারা। এখানকার উদ্ভিদের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে গবেষণা চালাল, শেষে পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলো দিয়ে তৈরি করে ফেলল বড় বড় ভলিউম। অ্যামোনিয়া মুক্ত পরিবেশ তৈরি করে সেখানে পৃথিবীর গাছ জন্মানোর চেষ্টা চালাল তারা। কিন্তু লাভ হল না। তারা ভূ-তত্ত্ববিদ সেজে গ্রহটিকে ভূ-ত্বক নিয়ে গবেষণা করল। জ্যোতির্বিদ সেজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল গ্রহটির সূর্যের বর্ণছটা।

ব্যারেরি প্রায়ই বলে, 'একদিন আমাদের মতো আরো কোনো দল এসে পৌঁছুবে এই গ্রহে। ওদের জন্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার রেখে যাব আমরা। সব কিছু মিলিয়ে এটা অদ্বিতীয় এক গ্রহ। গোটা ছায়াপথে এমন আর কোনো গ্রহ নেই, যেখানকার পরিবেশের পৃথিবীর পরিবেশের মিল রয়েছে অনেকখানি। শুধু অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিটাই ব্যতিক্রম।'

'তা যা বলেছেন,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সানড্রোপাউলস। 'কি ভাগ্য আমাদের।'

গোটা পরিস্থিতির থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে কাজ করছে সানড্রোপাউলস। সে বলল, 'এটা হচ্ছে একটা স্থানান্তরণ পদ্ধতি। জিওকেমিক্যাল অক্সিডেশনের ফলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অ্যামোনিয়া এবং সৃষ্টি হয় নাইট্রোজেন। গাছগুলো তখন এই নাইট্রোজেনকে কাজে লাগিয়ে আবার অ্যামোনিয়া তৈরি করে। এখন যদি গাছের মাধ্যমে অ্যামোনিয়া তৈরির পরিমাণটা শতকরা দুই ভাগে নামিয়ে আনা যায়, তাহলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণটা কমে আসবে

এতে যদিও গাছগুলো শুকিয়ে যাবে, কিন্তু অ্যামোনিয়া কমিয়ে আনার পদ্ধতিটা চালিয়ে যেতে হবে।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন,' বলল ভ্লাসোভ। 'যদি আমরা যথেষ্ট পরিমাণ গাছকে মেরে ফেলতে পারি, তাহলে এখান থেকে মুছে ফেলতে পারব অ্যামোনিয়া।'

'যদি আমাদের এয়ার ব্লেড এবং গাইড-অ্যাঙ্গেল ব্লাস্টার থাকত, এবং বছর খানেক কাজ করার সময় পেতাম,' বলল সানড্রোপাউলস। 'তাহলে আমরা করতে পারতাম কাজটা। কিন্তু আমাদের তো তা নেই। তবে এর চে' অন্য একটা ভালো পথ আছে। যদি আমরা এখানে আমাদের নিজস্ব গাছগুলো জন্মানর চেষ্টা করি, তাহলে সালোক-সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন তৈরি হবে এবং অ্যামোনিয়া অক্সিডেশনের মাধ্যমে অক্সিজেনের যৌগের সাথে মিশে যাবে। এভাবে কমে আসবে অ্যামোনিয়া। এমনকি কোথাও যদি সল্প পরিসরেও আমাদের নিজস্ব গাছ জন্মানর সম্ভব হয়, তাহলে এই এলাকায় কমে আসবে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ। তারপর এই গাছগুলো যত ছড়াবে, ততই দূর হবে অ্যামোনিয়া। একই সঙ্গে স্থানীয় অ্যামোনিয়া উৎপাদক গাছগুলোর বংশবৃদ্ধিও যাবে কমে। এভাবে চলতে থাকবে অ্যামোনিয়া হ্রাসের প্রক্রিয়া।'

পাঁচজন মিলে মালি বনে রইল গাছ জন্মানর পুরো মওসুম জুড়ে। মোট কথা, গ্যালাকটিক কোরের এই সদস্যদের জন্য গাছ জন্মানর কাজটা রীতিমত একটা রুটিনে পরিণত হল। পৃথিবীর মতো গ্রহে প্রাণ বাঁচে মূলত পানি এবং প্রোটিনের ওপর নির্ভর করে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে প্রচুর। কিন্তু এখানে যে খাবার রয়েছে, সেগুলো তেমন পুষ্টিকর নয় এবং খেতেও সুস্বাদু নয়। অবশ্যি চাষ করতে গিয়ে পৃথিবীর কিছু গাছ দারুণ ফল দিল। স্থানীয় কিছু গাছগাছরাকে হটিয়ে দিয়ে মাটিতে জাঁকিয়ে শেকড় গাড়তে লাগল পৃথিবীর কিছু গাছ।

এভাবে কয়েক ডজন গ্রহ নতুন পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর গাছগুলো বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝে টিকে থাকার শক্তি অর্জন করে। এমনকি চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে অটল থাকতে পারে। শীঘ্রি বিভিন্ন প্রজাতির গাছে ছেয়ে গেল বিভিন্ন জায়গা।

এমনিতে অ্যামোনিয়া পৃথিবীর যে কোনো গাছকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু "ক্রুজার জন"-এ সংরক্ষিত পৃথিবীর বীজগুলো একটু অন্যরকম। ভিনগ্রহের বিরূপ পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করার মতো শক্তি রয়েছে এই বীজগুলোর। এই বীজ থেকে জন্মান গাছগুলো নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানর জন্যে কোমর কষে যে লড়তে পারবে তা নয়, তবে লড়ে যেতে পারবে। কিন্তু কিছু গাছ নিস্তেজ এবং রুগ্ন দশা নিয়ে বেড়ে উঠল। বৈরী পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় মরে গেল সেগুলো।

পরে দেখা গেল, ভিনগ্রহের এই মাটিতে নীল গাছগুলোর চেয়ে স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াগুলোর দাপট বেশি। তখন তারা গাছের বীজ রোপণের বদলে মাটিতে পৃথিবী-জাত কিছু ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবল, যাতে এই ব্যাকটেরিয়া ভিনগ্রহের ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কাবু করে ফেলে।

ভাসভ মাথা নেড়ে বলল, 'আদৌ কোনো লাভ হবে না এতে। যদি আমাদের ব্যাকটিরিয়া বেঁচে যায়, তাহলে সেগুলো এখানকার অ্যামোনিয়ার সাথে খাপ খাইয়েই বাঁচবে।'

সানড্রোপাউলস বলল, 'ব্যাকটেরিয়া কোনো উপকারে আসবে না আমাদের। আমরা গাছ চাই—গাছ। গাছগুলো চালু রাখবে অক্সিজেন তৈরির পদ্ধতি।'

'এক্ষেত্রে আমরা কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি,' বলল পিটারসন। 'পানিকে আমরা ইলোকট্রোলাইজ করতে পারি।'

'কিন্তু আমাদের এই পদ্ধতি টিকবে কত দিন ? এখানকার মাটি অ্যামোনিয়া মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বছরের পর বছর ধরে চালাতে হবে এই পদ্ধতি। সম্ভব এটা ?'

ব্যারেরি বলল, 'তাহলে মাটি নিয়েই কিছু করা যাক। এখানকার মাটি ভর্তি শুধু অ্যামোনিয়াম লবণ। আমরা তাপ দিয়ে লবণটাকে সরিয়ে দিলে অ্যামোনিয়া মুক্ত হয়ে যাবে মাটি।'

'কিন্তু আবহাওয়ার কি হবে ?' চাউয়ের প্রশ্ন।

'মাটিতে অ্যামোনিয়া না থাকলে আবহাওয়া কোনো ব্যাপার নয়। ঠিকই জন্মাতে পারবে আমাদের গাছগুলো।'

জাহাজঘাটের কুলিদের মতো পরিশ্রম করতে লাগল সবাই। কিছু

দৃশ্যত এ কষ্টের কোনো শেষ দেখতে পেল না কেউ। যদিও একমনে তারা কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ আশাবাদী নয় যে, কাজ আদৌ সফল হবে শেষমেষ। এভাবে কাজের ভেতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে লাগল দিনগুলো।

পরের মওসুমে অ্যামোনিয়া-মুক্ত মাটিতে আবার যখন তারা গাছ বুনল, আগের মতোই দুর্বল হয়ে জন্মাল সেগুলো। কিছু গাছের চারা সুন্দর করে ঢেকে দিয়ে ভেতরের অ্যামোনিয়া মুক্ত বাতাস ঢোকাল তারা। এতে কাজ হল একটু, তবে তা যথেষ্ট নয়। মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ানর জন্যে রাসায়নিক উপাদান কম মেশাল না। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না তাতে।

নিস্তেজ চারাগুলো অল্প পরিমাণ যে অক্সিজেন ছাড়তে লাগল, অ্যামোনিয়ার বিষাক্ত ভুবনে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারল না সেটা। তবে সানড্রোপাউলস উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'আরো একবার ধাক্কা দিতে পেরেছি আমরা। আরো একবার নাড়া দিতে পেরেছি। সমস্যাটা দোল খাচ্ছে এখন, তবে এখনো দূর করতে পারিনি।'

কিন্তু প্রতিটা ধকলের একটা সীমা আছে। কাজ করতে করতে তাদের যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা বিকল হয়ে এল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এমনিতেই বুজে আসছিল পাঁচজনের ভবিষ্যৎ, এরমধ্যে মরণ ছোবল হানল অ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়া। এত তাড়াতাড়ি যে অমোঘ পরিণতি নেমে আসবে, কেউ ধারণা করেনি। পটাপট মারা গেল তিনজন।

চাউ নিঃশব্দে ফিসফিস করে বলল, 'বোকার মতো কি করুণ মৃত্যু হল আমাদের।'

পাঁচজনের ভেতর একমাত্র খাড়া পিটারসন ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকাল তার মুমূর্ষু সঙ্গীর দিকে। একমাত্র জীবিত সঙ্গী তার। দুঃখ ভরা কণ্ঠে বলল, 'মারা যেও না। আমাকে এভাবে একা ফেলে চলে যেও না তুমি।'

চাউ একটুখানি হাসার চেষ্টা করে বলল, 'বাঁচা মরা নিয়ে এখন আর কোনো চিন্তা নেই আমার। তবে তুমি আমাদের ফলো করতে পার, বন্ধু। যুদ্ধ করে আর কি হবে, বল? আমাদের যুদ্ধ করার সব যন্ত্র তো গেছে। এখন আর জয়লাভের কোনো উপায় নেই।'

এর পরেও, এই চরম হতাশায় ভেতরের বৈরী প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ

করতে প্রস্তুত পিটারসন। ঘণ্টা খানেক পর চাউ যখন মারা গেল, তখন চার-চারটে লাশের গতি করার ভার পড়ল পিটারসনের ঘাড়ে।

ভাঙা মন নিয়ে লাশগুলোর দিকে তাকাল পিটারসেন। খণ্ড খণ্ড অনেক স্মৃতি এসে ভিড় করছে তার মনে। অনেক বছর আগে, সেই করে পৃথিবী থেকে যাত্রা করেছিল তারা...

লাশগুলোকে এখন কবর দিতে হবে পিটারসনের। এখানকার পাতাহীন নীল গাছগুলো ডালপালা ভেঙে ক্রুশ তৈরি করল সে। প্রতিটা সঙ্গীর স্পেস হেলমেট একটা করে ক্রুশের মাথায় রাখল। ক্রুশের নিচে অক্সিজেন শূন্য সিলিন্ডার পড়ে রইল তাদের পরাজয়ের প্রতীক হয়ে।

বোকার মতো একটা আবেগ কাজ করছে পিটারসনের ভেতর। তবে সে এই কাজটা করছে নিজের জন্যে, বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। এক অর্থে নিজেকেও সম্মান জানাচ্ছে সে।

ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বসে খানিকক্ষণ নিজের কর্মপন্থা নিয়ে ভাবল পিটারসন। এখনো সে বেঁচে আছে দিব্যি। হাতের কাছে যা আছে, তাই দিয়ে লড়ে যেতে হবে প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে। বন্ধুদের কবরের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেক পরিশ্রমে তৈরি অ্যামোনিয়া-মুক্ত মাটিতে বন্ধুদের কবর দিল পিটারসন। কারো গায়ে কোনো কাপড় দিল না। বৈরি মাটিতে সবাইকে নগ্নভাবে কবর দিল সে। এই নগ্ন শরীর খেয়ে খেয়ে ক্রমশ উর্বর হয়ে উঠবে মাটি।

প্রতিটা ক্রুশ একে একে পুঁতে দেয়া হল একেকজনের কবরে। হেলমেট এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার পড়ে রইল ক্রুশের সাথে। শেষে বিষণ্ন চোখ দুটি নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড শিপের দিকে ফিরে চলল পিটারসন, এখন থেকে সেখানে একাকী বাস করতে হবে তাকে।

শেষ মেষ মরণ রোগ পিটারসনকেও আক্রমণ করল। স্পেসস্যুট নিয়ে বহু কষ্টে বাইরে বেরিয়ে এল পিটারসন। সে জানে, শেষ সময় এসে গেছে তার।

নিজেদের গড়া বাগানের জমিতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল পিটারসন। সবুজে সবুজে ছেয়ে গেছে জমি। আগের চেয়ে অনেক সতেজ দেখাচ্ছে পৃথিবীর গাছগুলোকে। প্রাণশক্তি যেন বেড়ে গেছে গাছগুলোর।

এখন শুধু একটা কাজই বাকি পিটারসন। শেষ মুহূর্তে সেই কাজটাই করে দিল সে। গাছগুলোর গোড়ার দিকে নিড়িয়ে দিল সুন্দর করে। মাটির সাথে মিলে যাওয়া শবের গলিত মাংস থেকে প্রাণরস চুষে নেবে গাছগুলো। অর্জন করবে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়ার শক্তি। এভাবে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অ্যামোনিয়া।

আবার যদি কখনো পৃথিবী থেকে এখানে মানুষ আসে (তা ১০ লাখ বছর পরে হোক না কেন ?), নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ পৃথিবীর পরিবেশ খুঁজে পাবে এই ভিনগ্রহে।

কবরের ক্রুশগুলো ততদিনে মিশে যাবে মাটিতে, ধাতব জিনিসগুলোতে মরচে পড়ে ক্ষয় ধরে যাবে। আর মাটির নিচে এই হাড়গুলো হয়তো বা ফসিল হয়ে যাবে। এই ফসিল দেখে আগন্তুকরা বুঝবে, আসলে কি ঘটেছিল এখানে। পাঁচজনের গবেষণালব্ধ যে কাগজগুলো সীল করা আছে, সেগুলোও পেয়ে যাবে আগন্তুকরা।

কিন্তু এসব আসলে কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু এই পাঁচজনের স্মৃতিচিহ্ন বলে কিছুই না পাওয়া যায়, এই গোটা গ্রহটাই হবে তাদের চিরকালের স্মৃতিসৌধ।

এবং এই গৌরবময় বিজয়ের স্বাদ নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল পিটারসন।

অনুবাদ: অনন্ত আহমেদ